amarboi.org

রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন

আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই

অনুবাদ: মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

amarboi.org

amarboi.org

পূর্ব-কথা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর পবিত্র জীবনচরিত পর্যালোচনা করলে এর দু'টি বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি প্রতিভাত হয়ে উঠে। প্রথমত ,তার জীবনধারার অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক আদর্শ ।

-যার ছোঁয়ায় মানব জাতির সমাজ ও সভ্যতায় এসেছে বৈপ্লবিক রূপান্তর । দ্বিতীয়ত, সে আদর্শের সুষ্ঠু রূপায়নের জন্যে তার নির্দেশিত বৈপ্লবিক কর্মনীতি - যার সফল অনুস্মৃতির মাধ্যমে একটি অসভ্য ও উচ্ছৃঙ্খল জনগোষ্ঠী পেয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিরোপা।

দুঃখের বিষয় যে, আজকের মুসলিম মানস থেকে বিশ্বনবীর পবিত্র জীবনচরিতের এই মৌল বৈশিষ্ট্য দু'টি প্রায় লোপ পেতে বসেছে। আজকের মুসলমানরা বিশ্বনবীর জীবন আদর্শকে দেখছে খণ্ডিত রূপে ,নেহাত একজন সাধারণ ধর্মপ্রচারকের জীবন হিসেবে । এর ফলে তার জীবনচরিতের সমগ্র রূপটি তাদের চোখে ধরা পড়ছে না ; তার জীবন আদর্শের বৈপ্লবিক তাৎপর্য ও তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। বস্তুত ,আজকের মুসলিম মানসের এই ব্যর্থতা ও দীনতার ফলেই আমরা বিশ্বনবীর পবিত্র জীবনচরিত থেকে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন বৈপ্লবিক রুপান্তর ঘটানোর তাগিদ অনুভব করছি না ।

'রসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন' আমাদের এই কুণ্ঠাহীন উপলব্ধিরই স্বাভাবিক ফসল। বিশ্বনবীর বিশাল ও ব্যাপক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়াদি এ পুস্তকের উপজীব্য নয়। এর বিষয়বস্তু প্রধানত তার বৈপ্লবিক আদর্শ ও কর্মনীতি । এই বিশেষ দু'টি দিকের উপরই এতে আলোকপাত করা হয়েছে সবিস্তারে । এতে জীবনের চরিতের অন্যান্য উপাদান এসেছে শুধু প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে।

পুস্তকটির মূল কাঠামো তৈরি করেছেন ভারতের বিশিষ্ট লেখক আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই। তার সাথে আমরা সংযোজন করেছি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে স্বভাবতই পুস্তকটির কলেবর হয়েছে মূলের তুলনায় অনেক সমপ্রসারিত ।এর বর্তমান সংস্করণেও সন্নিবিষ্ট হয়েছে অনেক মূল্যবান তথ্য।পুস্তকটির বিষয়টির প্রেক্ষিতে এর বাংলা নামকরণ করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মরহুম কবি ফররুখ আহমদ ।এর প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করে দিয়েও তিনি আমায় চির ঋণপাশে আবদ্ধ করে গেছেন।

বর্তমান সংস্করণে পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পরিপাট্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কম্পিউটার কম্পোজের ফলে এ মুদ্রণই শুধু ঝকঝকে হয়নি, আগের তুলনায় এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ পৃষ্ঠার মত।এছাড়াও পরিশিষ্ট পর্যায়ে 'ইসলাম প্রচারে মহিলা সাহাবীদের ভূমিকা' শিরোনামে একটি নতুন অধ্যায়ও সংযোজিত হয়েছে এ সংস্করণে। এর ফলে পুস্তকটির সৌকার্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পুস্তকটির এ সংস্করণও পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে বিপুল ভাবে।

amarboi.org

amarboi.org

ইসলামী আন্দোলন ও তার অনন্য বৈশিষ্ট্য

ইসলাম তথা হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর পয়গাম দুনিয়ার এক বিরাট সংস্কারমূলক আন্দোলন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে খোদা-প্রেরিত নবীগণ এই একই আন্দোলনের পয়গাম নিয়ে এসেছেন। এ কেবল একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলনই নয়, বরং এটি মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত এক অভূতপূর্ব সংস্কার আন্দোলন। এটি একাধারে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক ইত্যাদি সকল বৈশিষ্টের অধিকারি একটি ব্যাপক ও সর্বাত্মক আন্দোলন।মানব জীবনের কোন দিকই এ আন্দোলনের গণ্ডী-বহির্ভূত নয়।

ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব

দুনিয়ার সংস্কারমূলক বা বিপ্লবাত্মক আন্দোলন বহুবারই দানা বেধে উঠেছে;কিন্তু ইসলামী আন্দোলন তার নিজস্ব ব্যাপকতা এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের দরুণ অন্যান্য সকল আন্দোলনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।এ আন্দোলনের সাথে কিছুটা প্রাথমিক পরিচয় ঘটলেই লোকদের মনে প্রশ্ন জাগে :কিভাবে এ আন্দোলন উত্থিত হয়েছিল ?এর প্রবর্তক কিভাবে একে পেশ করেছিলেন এবং তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?কিন্তু এ প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব পাওয়া গেলে শুধু ঐতিহাসিক কৌতূহলই নিবৃত হয়না, বরং এর ফলে আমাদের মানস পটে এমন একটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ছবি ভেসে উঠে, যা আজকের দিনেও মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে সক্ষম।এখানেই ইসলামী আন্দোলনের আসল গুরুত্ব নিহিত।

এ আন্দোলন যেমন মানুষকে তার প্রকৃত লাভ-ক্ষতির সঠিক তাৎপর্য বাতলে দেয়,তেমনি তার মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বও সবার সামনে উন্মোচন করে দেয়।ফলে প্রতিটি জটিল ও দুঃসমাধেয় সমস্যা থেকেই মানুষ চিরতরে মুক্তি লাভ করতে পারে। বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের এসব বৈশিষ্ট্য একে ঘনিষ্ট আলোকে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করবার এবং এর সর্ম্পকে উত্থাপিত দাবিগুলোর সত্যতা নিরুপণের জন্যে প্রতিটি কৌতূহলী মনকে অনুপ্রাণিত করে।

ইসলামী আন্দোলনকে জানবার ও বুঝবার জন্যেএ পর্যন্ত অনেক বই-পুস্তকই লেখা হয়েছে এবং আগামীতেও লেখা হতে থাকবে। এসব বই-পুস্তকের সাহায্যে ইসলামী আন্দোলন সর্ম্পকে বেশ পরিষ্কার একটি ধারণাও করা চলে,সন্দেহ নেই।কিন্ত প্রদীপ থেকে যেমন আলোকরশ্মি এবং ফুল থেকে খোশবুকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, তেমনি এ জন্যেই যখন ইসলামী আন্দোলনের কথা উঠে, তখন মানুষ স্বভাবতই এর আহ্বায়ক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনচরিত এবং এর প্রধান উৎস আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠে। এ ঔৎসুক্য খুবই স্বাভাবিক।

ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

একথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষের নৈতিক জীবনের সংশোধন, তার ক্ষতিকর বৃত্তিগুলোর অপনোদন এবং জীবনকে সঠিকভাবে কামিয়াব করে তুলবার উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি উপস্থাপনই হচ্ছে মানবতার প্রতি সবচেয়ে পবিত্র এবং এটাই হচ্ছে তার সবচেয়ে সেরা খেদমত।এই উদ্দেশ্যেই দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ নিজ নিজ পথে কাজ করে গেছেন।কিন্তু এ ধরণের সংস্কারমূলক কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁরা মানব জীবনের কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রকেই শুধু বেছে নিয়েছেন এবং তার আওতাধীনে থেকেই যতদূর সম্ভব কাজ করে গেছেন।কেউ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিককে নিজের কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধনের মধ্যে।কিন্তু মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সুষম পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন এমন পূর্ণাঙ্গ সংস্কারবাদী একমাত্র খোদা-প্রেরিত নবীগণকেই বলা যেতে পারে।

মানব জাতির প্রতি বিশ্বস্রষ্টার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এই যে, তার প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দাওয়াত ও জীবন-চরিত কে তিনি অতুলনীয়ভাবে সুরক্ষিত রেখেছেন।বস্তুত এই মহামানবের জীবনী এমন নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, দুনিয়ার অন্য কোন মহাপুরুষের জীবনী কিংবা কোন ঐতিহাসিক দলিলের লিপিবদ্ধকরণেই এতখানি সতর্কতা অবলম্বনের দাবি করা যেতে পারে না।পরন্ত ব্যাপকতার দিক দিয়ে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে

amarboi.org

amarboi.org

হযরত (সা)-এর কথাবার্তা, কাজ-কর্ম জীবন-ধারা, আকার-আকৃতি, উঠা-বসা চলন-বলন, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, এমনকি খাওয়া পরা, শয়ন-জাগরণ এবং হাসি-তামাসার ন্যায় সামান্য বিষয়গুলো পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। মোটকথা, আজ থেকে মাত্র কয়েক শো বছর আগেকার বিশিষ্ট লোকদের সম্পর্কেও যে খুঁটিনাটি তথ্য জানা সম্ভবপর নয়, হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে প্রায় দেড় হাজার বছর পরেও সেগুলো নির্ভুলভবে জানা যেতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ(স)-এর জীবন-চরিত পর্যালোচনা করার আগে এর আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার।তাহলো এই যে, কোন কাজটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা কেবল সেই কাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুধাবণ করা চলে। কারণ প্রায়শই দেখা যায় যে, অনুকূল পরিবেশে যে সব আন্দোলন দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে,প্রতিকূল পরিবেশে সেগুলোই আবার স্তিমিত হয়ে পড়ে।তাই সাধারণ আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,সেগুলোকে গ্রহণ করার জন্যে আগে থেকেই লোকদের ভেতর যথারীতি প্রস্তুতি চলতে থাকে।অত:পর কোন দিক থেকে হঠাৎ কেউ আন্দোলন শুরু করলেই লোকেরা স্বত:স্ফূর্তভাবে তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে থাকে এবং এর ফলে আন্দোলনও স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলে।দৃষ্টান্ত হিসাবে দুনিয়ার আজাদী আন্দোলনগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।মানুষ স্বভাবতই বিদেশী শাসকদের জুলুম-পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং মনে মনে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হতে থাকে।অত:পর কোন সাহসী ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যভাবে আজাদীর দাবি উত্থাপন করে,তাহলে বিপদ-মুসিবতের ভয়ে মুষ্টিমেয় লোক তার সহগামী হলেও দেশের সাধারণ মানুষ তার প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে পারে না।অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলোর অবস্থাও ঠিক এইরূপ। ক্রমাগত দু:খ-ক্লেশ এবং অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিদের শোষণ-পীড়নে লোকেরা স্বভাবই এরূপ আন্দোলনের জন্যে প্রস্তত হতে থাকে।এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার সংশোধন এবংমানুষের দুঃখ-দুর্গতি মোচনের নামে দেশের কোথাও যদি কোনো বিপ্লবাত্মক আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে লোকেরা স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।কিন্তু এর বিপরীত -সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে উত্থিত একটি আন্দোলনের কথা ভেবে দেখা যেতে পারে।দৃষ্টান- হিসাবে বলা যায়, কোনো উগ্র মূর্তিপূজারী জাতির সামনে কোনো ব্যক্তি যদি মূর্তিপূজাকে নেহাত একটি অনর্থক ও বাজে কাজ বলে ঘোষণা করে, তাহলে তার ওপর কী বিপদ-মুসিবত নেমে আসতে পারে, একটু ভেবে দেখা দরকার।

বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের আহ্বায়ক হযরত মুহাম্মদ(স) কী প্রতিকূল পরিবেশে তার কাজ শুরু করেছিলেন, তা স্পষ্টত সামনে না থাকলে তার কাজের গুরুত্ব এবং তার বিশালতা উপলব্ধি করা কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। এ কারণেই তার জীবনচরিত আলোচনার পূর্বে তৎকালীন আরব জাহান তথা সারা দুনিয়ার সার্বিক অবস্থার ওপর কিছুটা আলোকপাত করা দরকার।

ইসলামী আন্দোলনের প্রাক্কালে দুনিয়ার অবস্থা

ইসলাম মানুষের কাছে যে দাওয়াত পেশ করেছে, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ হচ্ছে তাওহীদ। কিন্তু এই তাওহীদের আলো থেকেই তখনকার আরব উপদ্বীপ তথা সমগ্র দুনিয়া ছিল বঞ্চিত।তৎকালীন মানুষের মনে তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণাই বর্তমান ছিল না।এ কথা সত্যি যে হযরত মুহাম্মদ (স) এর আগেও খোদার অসংখ্য নবী দুনিয়ায় এসেছেন এবং প্রতিটি মানব সমাজের কাছেই তারা তাওহীদের পয়গাম পেশ করেছেন।কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, কালক্রমে এই মহান শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে সে নিজেরই ইচ্ছা-প্রবৃত্তির দাসত্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ,দেব-দেবী, নদী-সমুদ্র, পাহপড়-পর্বত, জ্বিন-ফেরেশতা, মানুষ-পশু ইত্যাকার অনেক বস্তুকে নিজের উপাস্য বা মাবুদের মধ্যে শামিল করে নেয়।এভাবে মানুষ এ খোদার নিশ্চিত বন্দেগীর পরিবর্তে অসংখ্য মাবুদের বন্দেগীর আবর্তে জড়িয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক দিক থেকে তখন পারস্য ও রোম এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বর্তমান ছিলো । পারস্যের ধর্মমত ছিলো অগ্নিপূজা (মাজুসিয়াত) । এর প্রতিপত্তি ছিলো ইরাক থেকে ভারতের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। আর রোমের ধর্ম ছিলো খ্রিষ্টবাদ(ঈসাইয়াত)।এটি গোটা ইউরোপ ,এশিয়া ও আফ্রিকাকে পরিবেষ্টন করে ছিলো। এ দুটি বৃহৎ শক্তি ছাড়া ধর্মীয় দিক থেকে ইহুদী ও হিন্দু ধর্মের কিছুটা গুরুত্ব ছিলো। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় সভ্যতার দাবি করত।

amarboi.org

amarboi.org

অগ্নিপূজা ছাড়া পারস্যে (ইরানে) নক্ষত্রপূজারও ব্যাপক প্রচলন ছিলো। সেই সঙ্গে রাজা-বাদশা ও আমির-ওমরাগণ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রজাদের খোদা ও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলো। তাদেরকে যথারীতি সিজদা করা হত এবং তাদের খোদায়ীর প্রশস্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করা হত।মোট কথা,সারা দুনিয়া থেকেই তাওহীদের ধারণা বিদায় নিয়েছিলো।

রোম সাম্রাজ্য

গ্রীসের পতনের পর রোম সাম্রাজ্যকেই তখন দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা শক্তি বলে বিবেচনা করা হত। কিন্তু ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যই অধঃপতনের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়। রাষ্ট-সরকারের অব্যাবস্থা,শত্রুর ভয়,অভ্যন্তরীন অশান্তি ,নৈতিকতার বিলুপ্তি, বিলাসিতার আতিশয্য-এক কথায় তখন এমন কোন দুষ্কৃতি ছিলো না ,যা লোকেদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি। ধর্মীয় দিক থেকে তো কিছু লোক নক্ষত্র ও দেবতার কল্পিত মূতির পূজা-উপাসনায় লিপ্ত ছিলোই;কিন্তু যারা ঈসার ধর্মের অনুসারী বলে নিজেদের দাবি করত, তারাও তাওহীদের ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলো। তারা হযরত ঈসা(আঃ) ও মরিয়মের খোদায়ী মর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলো। পরন্ত তারা অসংখ্য ধর্মীয় ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো এবং পরস্পর লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত থাকতো। তাদের মধ্যে কবর পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। পাদ্রীদের তারা সিজদা করত। পোপ ও বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মীয় পদাধিকারীগণ বাদশাহী,এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খোদায়ী ক্ষমতা পর্যন্ত করায়ত্ত করে রেখেছিলো। হারাম ও হালালের মাপকাঠী তাদের হাতেই নিবদ্ধ ছিলো। তাদের কথাকে ‘খোদায়ী আইন’ বলে গণ্য করা হত। পাশাপাশি সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাস ব্রতকে ধার্মিকতার উচ্চাদর্শ বলে মনে করা হতো এবং সকল প্রকার আরাম আয়েশ থেকে দেহকে মুক্ত রাখাই শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে বিবেচিত হতো।

ভারতবর্ষ

ধর্মীয় দিক থেকে ভারতে তখন‘পৌরাণিক যুগ’ বিদ্যমান ছিলো। ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে এই যুগটিকে সবচেয়ে অন্ধকার যুগ বলে গণ্য করা হয়। কারণ এ যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনরায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলো এবং বৌদ্ধদেরকে প্রায় নির্মূল করে দেয়া হয়েছিলো। এ যুগে শির্কের চর্চা মাত্রাতিরিক্ত রকমে বেড়ে গিয়েছিলো। দেবতাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৩৩ কোটি পর্যন্ত পৌছেছিলো। কথিত আছে যে,বৈদিক যুগে কোন মূর্তি পূজার প্রচলন ছিলনা। কিন্তু এ যুগে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিলো। মন্দিরের পুরোহিতগণ অনৈতিকতার এক জীবন্ত প্রতীক। সরল প্রাণ লোকেদের শোষাণ ও লুণ্ঠন করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। সে যুগে বর্ণবাদ বা জাতিভেদ প্রথার বৈষম্য চরমে পৌছেছিল। এর ফলে সামাজিক শৃংখলা ও ব্যাবস্থাপনা ধ্বংস হয়েছিল। সমাজপতিদের খেয়াল-খুশি মতো আইন কানুন তৈরি করে নেয়া হয়েছিল বিচার ইনসাফকে সম্পূর্ণরুপে হত্যা করা হয়েছিল। বংশ-গোত্রের দৃষ্টিতে লোকেদের মর্যাদা নিরুপন করা হতো। সাধারণ্যে মদপানের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিলো। তবে খোদা প্রাপ্তির জন্য বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতে জীবন কাটানো কে অপরিহার্য মনে করা হতো। কুসংস্কার ও ধ্বংসাত্নক চিন্তাধারা চরমে পৌছেছিলো। ভূত প্রেত , শুভাশুভ গণন এ ভবিষ্যৎ কথনে বিশ্বাস গোটা মানব জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। যে কোন অদ্ভুত জিনিসকেই ‘খোদা’ বলে গণ্য করা হতো। যে কোন অস্বাভাবিক বস্তুর সামনে মাথা নত করাই ধর্মীয় কাজ বলে বিবেচিত হতো। দেব-দেবী ও মূর্তির সংখ্যা গণনা তো দূরের কথা , তা আন্দাজ অনুমানেরও সীমা অতিক্রম করেছিলো। পূজারিণী ও দেবদেবীদের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত লজ্জাকর অবস্থায় উপনীত হয়েছিলো। ধর্মের নামে সকল প্রকার দুষ্কর্ম ও অনৈতিকতাকে সর্মথন দেয়া হতো। এক এক জন নারী একাধিক পুরুষকে স্বামীরুপে গ্রহণ করতো। বিধবা নারীকে আইনের বলে সকল প্রকার সুখ সম্ভোগ থেকে জীবনভর বঞ্চিত করে রাখা হতো। এই ধরনের জুলুম মূলক সমাজরীতির ফলে জীবন- নারী তার মৃত স্বামীর জ্বলন- চিতায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পর্যন্ত স্বীকৃত হতো। যুদ্ধে হেরে যাবার ভয়ে বাপ,ভাই ও স্বামী তাদের কন্যা , ভগ্নি ও স্ত্রীকে স্বহস্থে হত্যা করে ফেলতো এবং এতে তারা অত্যন্ত গর্ববোধ করতো। নগ্ন নারী ও নগ্ন পুরুষের পূজা করাকে পূণ্যের কাজ বলে গণ্য করতো। পূজা পার্বণ উপলক্ষে মদ্যপান করে তারা নেশায় চুর হয়ে যেত। মোদ্দাকথা, ধর্মাচরণ, নৈতিকতা ও সামাজিকতার দিক দিয়ে খোদার এই ভূখন্ডটি শয়তানের এক নিকৃষ্ট লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিলো।

ইহুদী

আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী হিসেবে কোনো সংস্কার-সংশোধন যদি প্রত্যাশা করা যেতো, তাহলে ইহুদীদের কাছ থেকেই করা যেতে পারতো। কিন্তু তাদের অবস্থাও তখন অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিলো। তারা তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন সব গুরুতর অপরাধ করেছে যে, তাদের পক্ষে কোনো সংস্কার মূলক কাজ করাই সম্ভব ছিলো না। তাদের মানসিক অবস্থা অত্যন- শোচনীয় আকার ধারণ করেছিলো। ফলে তাদের ভেতর কোনো নবীর আগমন ঘটলে তাঁর কথা শুনতে পর্যন্ত তারা প্রস্তুত ছিলো না। এজন্যে কতো নবীকে যে তারা হত্যা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা এরুপ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত ছিলো

amarboi.org

amarboi.org

যে, খোদার সাথে তাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ; সুতরাং কোনো অপরাধের জন্যেই তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না। তারা এ-ও ধারণা করতো যে, বেহেস্তের সকল সুখ-সম্ভোগ শুধু তাদের জন্যেই নির্দ্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।নবুয়্যাত ও রিসালাতকে তারা নিজেদের মীরাসী সম্পত্তি বলে মনে করতো। তাদের আলেম সমাজ দুনিয়া-পুজা ও যুগ-বিভ্রান্তিতে চরমভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। বিত্তশালী ও শাসক সম্প্রদায়ের মনোতুষ্টির জন্যে সবসময় তারা ধর্মীয়বিধি-বিধানে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে থাকতো। খোদায়ী বিধান সমূহের মধ্যে যেগুলো অপেক্ষাকৃত সহজতর এবং তাদের মর্জি মাফিক,সে গুলোই তারা অনুসরণ করতো;পক্ষান্তরে যেগুলো কঠিন ও অপছন্দনীয় ,সেগুলো অবলীলাক্রমে বর্জন করতো।

পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন খারাবী করা তৎকালীন ইহুদীদের একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিলো। ধন-মালের লালসা তাদেরকে সীমাহীনভাবে অন্ধ করে তুলেছিলো এবং এদিক থেকে কিছুমাত্র ক্ষতি হতে পারে, এমন কোন কাজ করতেই তারা প্রস্তুত ছিলো না। এর ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের ভেতরে মুশরিকদের মত মূর্তিপূজাও প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাদু-টোনা,তাবিজ-তুমার, আমল-তদবীর ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার কুপ্রথা তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো এবং তওহীদের সঠিক ধারণাকে তা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো। এমন কি,যখন আল্লাহর শেষ নবী তওহীদের সঠিক দাওয়াত পেশ করেন। তখন এই ইহুদীরাই মুসলমানদের চেয়ে আরব মুশরিকদেরকে উত্তম বলে ঘোষণা করেন।

আরব দেশের অবস্থা

দুনিয়ার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার পর এবার খোদ আরব দেশের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করবো। কারণ, এই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-খণ্ডেই আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং এখানকার পরিস্থিতিই তাকে সর্বপ্রথম মুকাবেলা করতে হয়।

আরবের একটি বিরাট অংশ- কোরা উপত্যকা, খায়বার ও ফিদাকে তখন বেশির ভাগ বাসিন্দাই ছিল ইহুদী। খোদ মদীনায় পর্যন্ত ইহুদীদের আদিপত্য কায়েম ছিল। বাকী সারা দেশে পৌত্তলিক রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। লোকেরা মূতি,পাথর ,নক্ষত্র,ফেরেশতা, জ্বিন প্রভৃতির পূজা-উপাসনা করতো ।অবশ্য এক আল্লাহর ধারণা তখনও কিছুটা বর্তমান ছিল। তবে তা শুধু এই পর্যন্ত যে, লোকেরা তাকে খোদাদের খোদা বা 'সবচাইতে বড় খোদা' বলে মনে করত। আর এই আকিদাও এতটা দুর্বল ছিল যে কার্যত তারা নিজেদের মনগড়া ছোটখাটো খোদাগুলোর পূজা উপাসনায়ই লিপ্ত থাকতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এই সব ছোট খাটো খোদার প্রভাবই কার্যকর হয়ে থাকে। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে তারা এগুলেরই পূজা উপাসনা করতো। এদের নামেই মানত মানতো ও কুরবানী করতো এবং এদের কাছেই নিজ নিজ বাসনা পূরণের আবেদন জানাতো। তারা এও ধারণা করতো এসব ছোট খাটো খোদাকে সন্তষ্ট করলেই আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তষ্ট হবেন।

এ ভ্রান্ত লোকেরা ফেরেস্থতাদেরকে খোদার পুত্র কন্যা বলে আখ্যা দিত। জ্বীনদের কে খোদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং খোদায়ীর অন্যতম শরিকদার বলে ধারণা করতো এবং এই কারণে তারা তাদের পূজা-উপাসনা করতো, তাদের কাছে সাহায্য কামনা করতো। যে সব শক্তিকে এরা খোদায়ীর শরিকদার বলে মনে করতো, তাদের মূর্তি বানিয়ে যথারীতি পূজা-উপাসনাও করতো। মূর্তি পূজার এতোটা ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল যে, কোথাও কোন সুন্দর পাথর খন্ড দৃষ্টি গোচর হলেই তারা তার পূজা-উপাসনা শূরু করে দিত। এমনকি, একান্তই কিছু না পাওয়া গেলে মাটির একটা স্তুপ বানিয়ে তার উপর কিছুটা ছাগ-দুগ্ধ ছিটিয়ে দিত এবং তার চারদিক প্রদক্ষিণ করতো।

মোট কথা, পূজা-উপাসনার জন্য আরবরা অসংখ্য প্রকার মূর্তি নির্মান করে নিয়েছিল। এসকল মূর্তির পাশাপাশি তারা গ্রহ নক্ষত্রেরও পূজা করতো। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা বিভিন্ন নক্ষত্রের পূজা করতো। এর ভিতর সূর্য ও চন্দ্রের পূজাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা জ্বিন-পরী এবং ভূত-প্রেতেরও পূজা করতো। এদের সম্পর্কে নানা প্রকার অদ্ভূত কথা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এছাড়া মুশরিক জাতি গুলোর মধ্যে আর যে সব কুসংস্কারের প্রচলন দেখা যায়,সেসব ও এদের মধ্যে বর্তমান ছিল।

এহেন ধর্মীয় বিকৃতির সাথে সাথে পারস্পারিক লড়াই-ঝগড়া আরবদের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। মামুলি বিষয়াদি নিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যেতো এবং বংশ পরম্পরায় তার জের চলতে থাকতো। জুয়াখেলা ও মদ্যপানে তারা এতটা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল যে, তখনকার দিনে আর কোন জাতিই সম্ভবত তাদের সমকক্ষ ছিল

amarboi.org

amarboi.org

না।মদের প্রশস্তি এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট দুষ্কর্মগুলো প্রসংসায় তাদের কাব্য-সাহিত্য পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া সুদী কারবার,লুটপাট,চৌর্যবৃত্তি,নৃশংসতা রক্তপাত, ব্যভিচার, এবং এ জাতীয় অন্যান্য দুষ্কর্ম তাদেরকে প্রায় মানবরুপি পশুতে পরিণত করেছিল।আপন কন্যা সন্তানকে তারা অপয়া ভেবে জীবন্ত দাফন করতো। নির্লজ্জ আচরণে তারা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, পুরুষ ও নারীর একত্রে নগ্নাবস্থায় কাবা শরীফ তওয়াফ করাকে তারা ধর্মীয় কাজ বলে বিবেচনা করতো। মোটকথা,ধর্মীয়,নৈতিক,সামাজিক,ও রাজনৈতিক জীবনে তখনকার আরব ভূমি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল।

ইসলামী আন্দোলনের জন্যে আরব দেশের বিশেষত্ব

আরব উপদ্বীপ তথা সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই ঘোর অমানিশার অবসান ঘটিযে আল্লাহর পথভ্রষ্ট বান্দাদেরকে তারই মনোনীত পথে চালিত করার জন্যে একটি শুভ প্রভাতের যে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই শুভ প্রভাতটির সূচনার জন্যে আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ার মধ্যে আরব দেশকে কেন মনোনীত করলেন, প্রসঙ্গত এই কথাটিও আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ(স)- কে সারা দুনিয়ার জন্যে হেদায়াত ও দিক-নির্দেশনা সর্বশেষ পয়গামসহ পাঠানোর জন্যে মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তার দাওয়াত সমগ্র দুনিয়ায়ই প্রচারিত হবার প্রয়োজন ছিল। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই বিরাট কাজের জন্যে কোন এক ব্যক্তির জীবন-কালই যথেষ্ট হতে পারে না।এর জন্যে প্রয়োজন ছিল :আল্লাহর নবী তার নিজের জীবদ্দশায়ই সৎ ও পুণ্যবান লোকদের এমন একটি দল তৈরি করে যাবেন, যারা তার তিরোধানের পরও তার মিশনকে অব্যাহত রাখবেন। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে যে ধরনের বিশেষত্ব ও গুণাবরীর প্রয়োজন ছিল, তা একমাত্র আরব অধিবাসীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি উন্নত মানের এবং বিপুল পরিমানে পাওয়া যেত । উপরন্ত আরবের ভৌগোলিক অবস্থানকে দুনিয়ার জনবসতিপূর্ণ এলাকার প্রায় কেন্দ্রস্থল বলা চলে। এসব কারণে এখান থেকেই নবীজীর দাওয়াত চারদিকে প্রচার করা সবদিক থেকেই সুবিধাজনক ছিল।

এছাড়া আরবী ভাষারও একটি অতুলনীয় বিশেষত্ব ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এই ভাষায় যতটা সহজে ও হৃদয়গ্রাহী করে পেশ করা যেতো, দুনিয়ার অন্য কোন ভাষায় তা সম্ভবপর ছিল না। সর্বোপরি, আরবদের একটা বড়ো সৌভাগ্য ছিল যে, তারা কোনো বিদেশি শক্তির শাসনাধীন ছিল না। গোলামীর অভিশাপে মানুষের চিন্তা ও মানসিকতার যে নিদারুণ অধঃগতি সূচিত এবং উন্নত মানবীয় গুণাবলীরও অপমৃত্যু ঘটে,আরবরা সে সব দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাদের চারদিকে পারস্য ও রোমের ন্যায় বিরাট দুটি শক্তির রাজত্ব কায়েম ছিল; কিন্তু তাদের কেউই আরবদের কে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারেনি ।তারা ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বীর জাতি; বিপদ-আপদকে তারা কোনোদিন পরোয়া করতো না। তারা ছিল স্বভাবগত বীর্যবান;যুদ্ধ-বিগ্রহকে তারা মনে করতোএকটা খেল-তামাসা মাত্র । তারা ছিল অটল সংকল্প আর স্বচ্ছ দিলের অধিকারী। যে কথা তাদের মনে জাগতো,তা-ই তারা মুখে প্রকাশ করতো। গোলাম ও নির্বোধ জাতিসমূহের কাপুরুষতা ও কপট মনোবৃত্তির অভিশাপ থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের কাণ্ডজ্ঞান,বিবেক-বুদ্ধিও মেধা-প্রতিভা ছিল উন্নত মানের। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথাও তারা অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারতো। তাদের স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর; এক্ষেত্রে সমকালীন দুনিয়ার কোনো জাতিই তাদের সমকক্ষ ছিল না।তারা ছিল উদারপ্রাণ, স্বাবলম্বী ও আত্ম-মর্যাদা সম্পূর্ণ জাতি। করো কাছে মাথা নত করতে তারা আদৌ অভ্যস্ত ছিল না। সর্বোপরি, মরুভূমির কঠোর জীবন-যাত্রায় তারা হয়ে ওঠেছিল নিরেট বাস্তববাদী মানুষ। কোন বিশেষ পয়গাম কবুল করার পর বসে বসে তার প্রশস্তি কীর্তন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না;বরং সে পয়গামকে নিয়ে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতো এবং তার পিছনে তাদের সমগ্র শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করতো।

আরবদের সংশোধনের পথে বাধা

আরব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, তার শক্তিশালী ভাষা এবং তার বাসিন্দাদের এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবীকে এই জাতির মধ্যে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত করেন, সন্দেহ নেই।কিন্তু এই অদ্ভূত কওম কে সংশোধন করতে গিয়ে খোদ হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, তার গুরুত্বও কোনো দিক দিয়ে কম ছিল না। আগেই বলেছি, কোনো কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে সে কাজটির চারদিকের অবস্থা ও পরিবেশের কথা বিচার করা প্রয়োজন ।এই দৃষ্টিতে বিচার করলে আরব ভূমির সেই ঘনঘোর অন্ধকার যুগে এ ইসলামী আন্দোলনের সূচনা ও তার

amarboi.org

amarboi.org

সাফল্যকে ইতিহাসের এক নজিরবিহীন কীর্তি বলে অভিহিত করতে হয়। আর একারণেই আরবদের ন্যায় একটি অদ্ভূত জাতিকে দুনিয়ার নেতৃত্বের উপযোগী করে গড়ে তুলতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ(স)-কে যে সীমাহীন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে, তাকেও একটা অলৌকিক ব্যাপার ছাড়া আরা কিছুই বলা চলে না।

কাজেই আরবদের এই বৈশিষ্ট্যেগুলো যে পর্যন্ত সামনে না রাখা হবে, সে পর্যন্ত হযরত মুহামামদ(স)- এর নেতৃত্বে সম্পাদিত বিশাল সংস্কার কার্যকে কিছুতেই উপলব্ধি করা যাবে না।এই কওমটির সংশোধনের পথে যে সমস্ত জটিলতার অসুবিধা বর্তমান ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা এখানে বিবৃত করছি। আরবরা ছিল একটা নিরেট অশিক্ষিত জাতি।খোদার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিতজ্ঞান, নবুয়্যাতের স্বরূপ ও গুরুত্ব, ওহীর তাৎপর্য, আখিরাত সম্পর্কিত ধারণা, ইবাদতের অর্থ ইত্যাদি কোনো বিষয়ই তারা ওয়াকিফহাল ছিল না।পরন্ত তারা বাপ-দাদার আমল থেকেই প্রচলিত রীতিনীতি ও রসম রেওয়াজের অত্যন্ত অন্ধ অনুসারী ছিল এবং তা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ দূরে সরতেও প্রস্তুত ছিল না। অথচ ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাই ছিল তাদের এই পৈত্রিক ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্যদিকে শির্ক থেকে উদ্ভূত সকল মানসিক ব্যাধিই তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল। অহংকার ও আত্মম্ভরিতার ফলে তাদের বিবেক-বুদ্ধি হয়ে পড়েছিল প্রায় নিষ্ক্রিয়।পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়া তাদের একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। এ জন্যে শান্ত মস্তিষ্কে ও গভীরভাবে কোনো কিছু চিন্তা করা তাদের পক্ষে সহজতর ছিল না।তাদের কিছু ভাবতে হলে তা যুদ্ধ-বিগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকেই ভাবতো, এর বাইরে তাদের আর কিছু যেন ভাববারই ছিল না।সাধারণভবে দস্যুবৃত্তি,লুটতরাজ ইত্যাদি ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়।এ থেকে সহজেই আন্দাজ করা চলে যে,হযরত মুহাম্মদ(স)-এর দাওয়াত তাদের ভেতর কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তিনি যখন তাদের কে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান, তখন তাদের কাছে তা মনে হয়েছিল একটি অভিনব দুর্বোধ্য ব্যাপার। তারা বাপ-দাদার আমল থেকে যে সব রসম-রেওয়াজ পালনে অভ্যস্ত, যে সব চিন্তা-খেয়াল তারা মনের মধ্যে পোষণ করেছিল -এ দাওয়াত ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দাওয়াতের মূল কথা ছিল : লড়াই-ঝগড়া বন্ধ করো, শান্তিতে বসবাস করো,দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজ থেকে বিরত থাকো, বদভ্যাস ও ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা পরিহার করো, সর্বোপরি জীবিকার জন্যে হারাম পন্থা ত্যাগ করো। স্পষ্টতই বোঝা যায়,এ ধরণের একটি সর্বাত্মক বিপ্লবী পয়গামকে কবুল করা তাদের পক্ষে কত কঠিন ব্যাপার ছিল।

মোটকথা, তৎকালীন দুনিয়া অবস্থা, আরব দেশের বিশেষ পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট জাতির স্বভাব-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব -এর কোন জিনিসই ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে অনুকূল ছিল না।কিন্তু যখন এর ফলাফল প্রকাশ পেলো,তখনই স্পষ্ট বোঝা গেল :

“বজ্রের ধ্বনি ছিল সেথবা ছিল সে ‘সওতে হাদী’
দিল যে কাঁপায়ে আরবের মাটি রাসূল সত্যবাদী।
জাগালো সে এক নতুন লগ্ন সকলের অন্তরে,
জাগায়ে গেল সে জনতাকে চির সুপ্তির প্রান্তরে!
সাড়া পড়ে গেল চারদিকে এই সত্যের পয়গামে,
হলো মুখরিত গিরি-প্রান্তর চির সত্যের নামে।”

বস্তুত এটই ছিল ইসরামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় মু’জিজা। এই মু’জিজার কথা যখন উত্থাপিত হয়, তখন স্বভবতই হযরত মুহাম্মদ(স)- জীবনধারা আলোচনা এবং তার পেশকৃত পয়গামকে নিকট থেকে উপলব্ধিকরার জন্যে প্রতিটি উৎসুক মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই বিষয়টি আমরা পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

amarboi.org

amarboi.org

জন্ম ও বাল্যকাল

বংশ পরিচিতি

হযরত মুহাম্মদ(স)-এর সম্মানিত পিতার নাম আব্দুল্লাহ।তিনি ক'বার মুতাওয়াল্লী আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। তার বংশ-পরম্পরা উর্ধ্ব দিকে প্রায় ষাট পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে ইব্রাহীম (আঃ)-তনয় হযরত ইসমাঈল(আ)-এর সাথে মিলিত হয়েছে।তার খান্দানের নাম কুরাইশ।আরব দেশের অন্যান্য খান্দানের মধ্যে এটিই পুরুষানুক্রমে সবচেয় শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত খান্দান বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। আরবদেশের ইতিহাসে এই খান্দানের অনেক বড়ো বড়ো মান্য-গণ্য ব্যক্তির নাম দেখতে পাওয়া যায়।এদের ভেতর আদনান, নাযার, ফাহার, কালাব, কুসসী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুসসী তার জামানায় কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লী ছিলেন ।তিনি অনেক বড়ো বড়ো স্মরণীয় কাজ করে গেছেন।যেমন : হাজীদের পানি সরবরাহ করা, তাদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। তার পরেও তার খান্দানের লোকেরা এই সকল কাজ আঞ্জাম দিতে থাকে।এসব জনহিতকর কাজ এবং কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লী হবার কারণে কুরাইশরা সারা আরব দেশে অতীব সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ খান্দান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।সাধারণভাবে আরবে লুটতরাজ, রাহাজানি ইত্যাকার দুষ্কৃতি হিসেবে স্বীকতি প্রচলিত ছিল এবং এ কারণে রাস্তাঘাট আদৌ নিরাপদ ছিল না।কিন্তু কা'বা শরীফের মর্যাদাও হাজীদের খেদমতের কারণে কুরাইশদের কাফেলার ওপর কখনো কেউ হামলা করতো না।তারা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ব্যবসায়ের পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারতো।

আব্দুল মুত্তালিবের দশটি(মতান্তরে বারোটি) পুত্র ছিল।কিন্তু কুফর বা ইসলামের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র খ্যাতি লাভ করেন। প্রথম আব্দুল্লাহ, ইনি হযরত(স)-এর পিতা। দ্বিতীয়,আবু তালিব; ইনি ইসলাম কবুল করেননি বটে,তবে কিছুকাল হযরতের সাহায্য ও পৃষ্টপোষকতা করেছেন।তৃতীয়,হযরত হামযা(রা) এবং চতুর্থ,হযরত আব্বাস(রা)-এরা দুজনই ইসলামে সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন এবংইসলামের ইতিহাসে অতীব উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।আর পঞ্চম হচ্ছে আবু লাহাব;ইসলামের প্রতি বৈরিতার কারণে ইতিহাসে যার নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কুরাইশদের একটি গোত্রের নাম হচ্ছে জাহারা। এই গোত্রের ওহাব বিন আবদুল মানাফের কন্যা আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহর বিবাহ হয়। সমগ্র কুরাইশ খান্দানের ভেতর ইনি একজন বিশিষ্ট মহিলা ছিলেন।বিবাহকালে আবদুল্লাহর বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর।বিয়ের পর খান্দানী রীতি অনুযায়ী তিনি তিন দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন।অতঃপর ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। ফিরবার পথে মদিনা পর্যন্ত পৌঁছেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। ঐ সময় আমিনা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

জন্ম তারিখ

ঈসায়ী ৫৭১ সালের ২০ এপ্রিল মুতাবেক ৯ রবিউল আওয়াল সোমবারের সুবহে সাদিক।এই স্মরণীয় মুহূর্তে রহমতে ইলাহীর ফয়সালা মুতাবেক সেই মহান ব্যক্তিত্ব জন্ম গ্রহণ করলেন,সারা দুনিয়া থেকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার বিদূরিত করে হেদায়েতের আলোয় গোটা মানবতাকে উদ্ভাসিত করার জন্যে যার আবির্ভাব ছির একান্ত অপরিহার্য এবং যিনি ছিলেন কিয়ামত পর্যন্ত এই দুনিয়ায় বসবাসকারী সমগ্র মানুষের প্রতি বিশ্বপ্রভুর পরম আর্শিবাদ স্বরূপ।জন্মের আগেই এই মহামানবের পিতার ইন্তেকাল হয়েছিল। তাই দাদা আবদুল মুত্তালিব এর নাম রাখলেন মুহাম্মদ(স)।

শৈশবে লালন-পালন

সর্বপ্রথম হযরত(স)- এর স্নেহময়ী জননী আমিনা তাকে দুধ পান করান। দু-তিন দিন পর আবু লাহাবের বাঁদী সাওবিয়াও তাকে স্তন্য দান করেন। সে জামানার রেওয়াজ অনুযায়ী শহরের সম্ভান- লোকেরা তাদের সন্তান-সন্ততিকে দুধ পান করানো এবং তাদের লালন -পালনের জন্য গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দিতেন।সেখানকার খোলা আলো-হাওয়ায় তাদের স্বাস্থ্য ভালো হবে এবং তারা বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে পারবে বলে তারা মনে করতেন।কেনা, আরবের শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের ভাষা অধিকতর বিশুদ্ধ বলে ধারণা করা হতো।এই নিয়ম অনুযায়ী গ্রামের মেয়েরা শহরে এসে বড়ো বড়ো অভিজাত পরিবারের সন্তানদের লালন- পালনের জন্যে সঙ্গে নিয়ে যেতো।তাই হযরত(স)-এর জন্মের কয়েক দিন পরই হাওয়াযেন গোত্রের কতিপয় মহিলা শিশুর সন্ধানে মক্কায় আগমন করেন।এদের হালিমা সা'দিয়া নাম্নী এক মহিলাও ছিলেন। এই ভাগ্যবতী মহিলা অপর কোন বড়ো লোকের শিশু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমিনার ইয়াতিম শিশু সন্তানকে নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

amarboi.org

amarboi.org

দু'বছর পর আমিনা তাঁর শিশু পুত্রকে ফেরত নিয়ে আসেন । এর কিছুদিন পর মক্কায় মহামারী বিস্তার লাভ করলো। তাই আমিনা তাকে আবার গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন ।সেখানে তিনি ছয় বছর পর্যন্ত অতিবাহিত করেন ।

হযরত (স)- এর বয়স যখন ছ' বছর, তখন আমিনা তাকে নিয়ে মদিনায় গমন করেন সম্ভবত স্বামীর কবর জিয়ারত অথবা কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করার জন্যে তিনি এই সফরে বের হন।মদিনায় তিনি প্রায় এক মাস কাল অবস্থান করেন। কিন্তু ফিরবার পথে আরওয়া নামক স্থানে তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং সেখানেই চিরতরে সমাহিত হন।

আম্মার মৃত্যুর পর হযরত(স)-এর লালন-পালন ও দেখা শোনার ভার দাদা আবদুল মুত্তালিবের ওপর অর্পিত হয়। তিনি হামেশা তাকে সঙ্গে-সঙ্গে রাখতেন।হযরত(স)- এর বয়স যখন আট বছর,তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি হযরত(স)-এর লালন পালনের ভার পুত্র আবু তালিবের ওপর ন্যস্ত করে যান। তিনি এই মহান কর্তব্য অতীব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করেন। আবু তালিব এবংআবদুল্লাহ (হযরতের পিতা)সহোদর ভাই ছিলেন।এদিক দিয়েও হযরত(স)- এর প্রতি আবু তালিবের গভীর মমত্ব ছিল।তিনি নিজের ঔরসজাত সন্তানদের চাইতেও হযরত(স)-কে বেশি আদায় যত্ন করতেন।শোবার কালে তিনি হযরত(স)-কে সঙ্গে নিয়ে শুইতেন;বাইরে বেরুবার সময়ও তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতেন।

হযরত(স)-এর বয়স যখন দশ-বারো বছর, তখন তিনি সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ছাগলও চরান।আরবে এটাকে কোন খারাপ কাজ বলে মনে করা হতো না।ভালো ভালো সম্ভান্ত ঘরের ছেলেরাও তখন মাঠে ছাগল চরাতো।

আবু তালিব ব্যাবসায় করতেন। কুরাইশদের নিয়ম অনুযায়ী বছরে একবার তিনি সিরিয়া যেতেন।হযরত(স)-এর বয়স তখন সম্ভবত বারো বছর; এসময় একবার আবু তালিব সিরিয়া সফরের ইরাদা করলেন।সফরকালীন কষ্টের কথা স্মরণ করে তিনি হযরত(স)-কে সঙ্গে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু হযরত(স)-এর প্রতি তার অত্যন্ত প্রগাঢ় মমতা ছিল; তাই সফরে রওয়ানা করার সময় তার সঙ্গে যাবার জন্যে হযরত(স) পীড়াপীড়ি শুরু করলে আবু তালিব তার মনে আঘাত দিতে পারলেন না।তিনি হযরত(স)-কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

নবুয়্যাতের আগে

ফুজ্জারের যুদ্ধ

ইসলাম-পূর্বযুগে আরবদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ ও অসমাপ্য ধারা বর্তমান ছিল। এর ভেতর সবচেয়ে ভয়ংকর ও মশহুর ছিল ফুজ্জারের যুদ্ধ।এই যুদ্ধ কুরাইশ ও কায়েস গোত্রসমূহের মধ্যে সংঘটিত হয়।এতে কুরাইশদের ভূমিকা ছির সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ ;তাই হযরত(স) ও কুরাইশদের পক্ষ থেকে এতে অংশগ্রহণ করেন।কিন্তু তিনি করো ওপর আঘাত হানেন নি এ যুদ্ধে প্রথমে কায়েস এবং পরে কুরাইশরা জয়লাভ করে। শেষ অবধি সন্ধি মারফত এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

হিলফুল ফুযুল

এভাবে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে আরবের শত শত পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল ।লোকদের না ছিল দিনের বেলায় কোন স্বস্তি আর নাছিল রাত্রে কোন আরাম।ফুজ্জারের যুদ্ধের পর এই পরিস্থিতিতে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু কল্যাণকামী লোক এর প্রতিকারের জন্যে একটা আন্দোলন শুরু করেন।হযরত(স)-এর চাচা জুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব পরিস্থিতি দ্রুত শোধরাবার জন্যে বাস্তব ধর্মী কাজের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন।এর কিছু দিন পর কুরাইশ খান্দানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগন জমায়েত হয়ে নিম্নোক্ত চুক্তি সম্পাদন করেনঃ

১.আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করবো।
২.পথিকের জান-মালের হেফাজত করবো।
৩.গরীবদের সাহায্য করতে থাকবো।

amarboi.org

amarboi.org

৪.মজলুমের সহায়তা করে যাবো।
৫.কোনো জালেমকে মক্কায় আশ্রয় দেব না।

এই চুক্তিতে হযরত(স) ও অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন।নবুয়্যাতের জামানায় এ চুক্তি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন :আমাকে ঐ চুক্তির বদলে যদি একটি লাল রং-এর মূল্যবান উটও দেয়া হতো, তবু তা আমি কবুল করতাম না।আজো যদি কেউ এরুপ চুক্তির জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানায়, তাতে সাড়া দিতে আমি প্রস্তুত।

কা' বা গৃহের সংস্কার

তখন কা'বা গৃহের শুধু চারটি দেয়াল বিদ্যমান ছিল। তার ওপর কোনো ছাদ ছিল না।দেয়ালগুলোও বড়জোর মানুষের দৈর্ঘ্য সমান উঁচু ছিল।পরন্ত গৃহটি ছিল খুব নীচু জায়গায়। শহরের সমস্ত পানি গড়িয়ে সেদিকে যেতো।ফলে পানি প্রতিরোধ করার জন্যে বাঁধ দেয়া হতো। কিন্তু পানির চাপে বাঁধ বারবার ভেঙ্গে যেতো এবং গৃহ প্রাঙ্গনে পানি জমে উঠতো। এভাবে গৃহটি দিন দিন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল। তাই গৃহটি ভেঙ্গে ফেলে একটি নতুন মজবুত গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। সমগ্র কুরাইশ খান্দান মিলিতভাবে নির্মাণ কাজ শুরু করলো । কেউ যাতে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হয় , সেজন্য বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা গৃহের বিভিন্ন অংশ ভাগ করে নিলো।কিন্তু কা'বা গৃহের দেয়ালে যখন 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপনের সময় এলো তখন বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গেলো।প্রত্যেক গোত্রই দাবি করছিল যে, এ খেদমতটি শুধু তারাই আঞ্জাম দেবার অধিকারী। অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, অনেকের তলোয়ার পর্যন্ত কোষমুক্ত হলো। চারদিন পর্যন্ত এই ঝগড়া চলতে থাকলো। পঞ্চম দিন আবু উম্মিয়া বিন মুগিরা নামক এক প্রবীণ ব্যক্তি প্রস্তাব করেন যে,আগামীকাল প্রত্যুষে যে ব্যক্তি এখানে সবার আগে হাজির হবে,এর মিমাংসার জন্যে তাকেই মধ্যস্থ নিয়োগ করা হবে। সে যা সিদ্ধান্ত করবে, তাই পালন করা হবে। সবাই এ প্রস্তাব মেনে নিলো।

পরদিন আল্লাহর কুদরতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির ওপর সবার নজর পড়লো, তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ(স)। ফয়সালা অনুযায়ী তিনি হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করতে ইচ্ছুক প্রতিটি খান্দান কে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বললেন্ ।অতঃপর একটি চাদর বিছিয়ে তিনি নিজ হাতে পাথরটিকে তার ওপর রাখলেন এবং বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিগণকে চাদরের প্রান্ত ধরে পাথরটিকে ওপরে তুলতে বললেন। চাদরটি তার নির্দিষ্ট স্থান বরাবর পৌছলে হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এভাবে তিনি একটি সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দিলেন। এ সংঘর্ষে কতো খুন-খারাবী হতো,কে জানে!

এবার কা'বার যে নয়া গৃহ নির্মিত হলো,তার ওপর যথারীতি ছাদও দেয়া হলো;কিন্তু পুরো ভূমির গৃহ নির্মাণের উপযোগী উপকরণ না থাকায় এক দিকের ভূমি কিছুটা বাইরে ছেড়ে দিয়ে নয়া ভিত্তি গড়ে তোলা হলো। এই অংশটিকেই এখন 'হিত্তিম' বলা হয়।

ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ

আরবদের, বিশেষত কুরাইশদের পুরানো পেশা ছিল ব্যবসায় হযরত(স)-এর চাচা আবু তালিবও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। এ কারণেই হযরত(স)-যখন যৌবনে পদার্পন করেন, তখনও তিনি ব্যবসায় কে অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন।কিশোর বয়সে চাচার সঙ্গে তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে যে সফর করেন,তাতে তার যথেষ্ঠ সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।এ ব্যাপারে তিনি লোকদের কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রতিপন্ন হলেন।লোকেরা তার ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ মূলধন তার কাছে জমা করতে লাগলো।পরন্ত ওয়াদা পালন,সদাচরণ ন্যায়পরায়ণতা,বিশ্বস্ততা ইত্যাদি কারণেও তিনি লোকদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। এমনকি, লোকেরা তাকে 'আস-সাদিক'(সত্যবাদী) 'আল-আমীন'(বিশ্বস্ত) বলে সাধারণভাবে অভিহিত করতে লাগলো।ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি সিরিয়া,বসরা, বাহরাইন ও ইয়েমেনে কয়েকবার সফর করেন।

খাদীজার সাথে বিবাহ

তখন খাদীজা নামে আরবে এক সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী মহিলা ছিলেন।তিনি হযরত(স)- এর দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন ছিলেন।প্রথম বিবাহের পর তিনি বিধবা হন এবং দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তার দ্বিতীয় স্বামীও মৃত্যুবরণ করেন এবং পুনরায় বিধবা হন।তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। লোকেরা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ

amarboi.org

amarboi.org

হয়ে তাকে ‘তাহিরা’(পবিত্রা) বলে ডাকতো।তার আগে ধন-দৌলত ছিল। তিনি লোকদের কে পুঁজি এবং পণ্য দিয়ে ব্যবসায় চালাতেন।

হযরত(স)-এর বয়স তখন পঁচিশ বছর। ইতোমধ্যে ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি বহুবার সফর করেছেন। তার সততা,বিশ্বস্ততা ও সচ্চরিত্রের কথা জনসমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল।তার এ খ্যাতির কথা শুনে হযরত খাদীজা তার কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান : আপনি আমার ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে সিরিয়া গমন করুন। আমি অন্যান্যদের কে যে হারে পারিশ্রমিক দিয়ে থাকি, আপনাকেও তা-ই দেবো। হযরত(স)- তার এই প্রস্তাব কবুল করলেন এবং পণ্যদ্রব্য নিয়ে সিরিয়ার অন্তর্গত বসরা পর্যন্ত গমন করলেন।

খাদীজা হযরত(স)-এর অসামান্য যোগ্যতা ওঅতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে প্রায় তিন মাস পর তার কাছে বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। হযরত(স)-তার পয়গাম মন্‌জুর করলেন এবং বিয়ের দিন-ক্ষণও নির্ধারিত হলো। নির্দিষ্ট দিনে আবু তালিব, হযরত হামযা এবং খান্দানের অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে হযরত(স) খাদীজার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। আবু তালিব বিয়ের খোতবা পড়লেন। পাঁচ শো তালায়ী দিরহাম (স্বর্ণ-মুদ্রা) বিয়ের মোহরানা নির্ধারিত হলো।

বিবাহকালে হযরত খাদীজার বয়স চল্লিশ বছর এবং তার পূর্বোক্ত দুই স্বামীর ঔরসজাত দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল।

অসাধারণ ঘটনাবলী

দুনিয়ায় যতো বিশিষ্ট লোকের আবির্ভাব ঘটে তাঁদের জীবনে শুরু থেকেই অসাধারণ কিছু নিদর্শনাবলী লক্ষ্য করা যায় । এ দ্বারা তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা সহজেই অনুমান করা চলে । একথা অবশ্য এমন সব লোকের বেলায়ই প্রযোজ্য,যারা পরবর্তী কালে কোন বিশেষ খান্দান,কওম বা দেশের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করে থাকেন। কিন্তু যে মহান সত্তাকে কিয়ামত অবধি সারা দুনিয়ার নেতত্বের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যাকে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের পূর্ণ সংস্কারের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে,তার জীবন-সূচনায় এমন অসাধারণ নিদর্শনাবলী তো প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হওয়ায় স্বাভাবিক। তাই স্বভাবই তার জীবনী গ্রন্থগুলোয় এ ধরণের নিদর্শনাবলীর প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু যে সকল ঘটনা প্রামাণ্য বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতসহ উল্লিখিত হয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃহযরত(স) বলেছেনঃ ‘আমি যখন আমার মায়ের গর্ভে ছিলাম, তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তার দেহ থেকে একটি আলো নির্গত হয়েছে এবং তাতে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেছে।’বহু রেওয়ায়েত থেকে এ-ও জানা যায় যে, তখন ইহুদী ও খ্রিষ্টান এক নতুন নবীর আগমন প্রতিক্ষায় ছিল এবং এ ব্যাপারে তারা নানা রকম ভবিষ্যত বাণী করেছিল।

রাসূল (স)-এর বাল্যকালের একটি ঘটনা। তখন কা’বা গৃহ কিছুটা সংস্কার কার্য চলছিল এবং এ ব্যাপারে বড়োদের সাথে ছোট ছোট ছেলেরাও ইট বহণ করে নিয়ে যাচ্ছিল।এই ছেলেদের মধ্যে হযরত (স) এবং চাচা হযরত আব্বাসও ছিলেন। হযরত আব্বাস তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ‘তোমার লুঙ্গি খূলে কাঁধের ওপর নিয়ে নাও, তাহলে ইটের চাপে ব্যথা পাবে না।’তখন তো বড়োরা পর্যন্ত নগ্ন হতে লজ্জানুভব করতো না।কিন্তু হযরত(স) যখন এরুপ করলেন, নগ্নতার অনুভূতিতে সহসা তিনি বেহঁশ হয়ে পড়লেন।তার চোখ দুটো ফেটে বের হয়ে যাবার উপক্রম হলো। সম্বিত ফিরে এলে তিনি শুধু বলতে লাগলেনঃ‘‘আমার লুঙ্গি আমার লুঙ্গি ’’। লোকেরা তাড়াতাড়ি তাকে লুঙ্গি পরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর আবু তালিব তার অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বললেনঃ‘আমি সাদা কাপড় পরিহিত এক লোককে দেখতে পাই। সে আমাকে বললো, শিগগির সতর আবৃত কর।’সম্ভবত এই প্রথম হযরত(স) গায়েবী আওয়াজ শুনতে পান।

আরবে তখন আসর জমিয়ে কিসসা বরার একটা কুপ্রথা চালু ছিল। লোকেরা রাত্রি বেলায় কোন বিশেষ স্থানে জমায়েত হতো এবং কাহিনীকাররা রাতের পর রাত তাদের নানারুপ উদ্ভট কিস্‌সা-কাহিনী শোনাতো।বাল্য বয়সে হযরত(স)একবার এই ধরণের আসরে যোগদান করার ইরাদা করেন।কিন্তু পথিমধ্যে একটা বিয়ে মজলিস দেখার জন্যে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং পরে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর চোখ মেলে দেখেন যে ভোর হয়ে গেছে। এরুপ তার জীবনে আরো একবার সংঘটিত হয়। এভাবে আল্লাহ তা’আলা তাকে কুসংসর্গ থেকে রক্ষা করেন।

amarboi.org

amarboi.org

রাসূল(স) যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তখন মক্কা মূর্তি-পূজার সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল।খোদ কা'বা গৃহে তখন তিন শ' ষাটটি মূর্তির পূজা হতো এবং তার নিজ খান্দানের লোকেরা অর্থাৎ কুরাইশরাই তখন কা'বার মুতাওয়াল্লী বা পূজারী ছিলেন।কিন্তু এতদ সত্ত্বও হযরত(স) কোনদিন মূর্তির সামনে মাথা নত করেন নি এবং সেখানকার কোন মুশরিকী অনুষ্ঠানেও অংশ নেন নি। এছাড়া কুরাইশরা আর যে সব খারাপ রসম-রেওয়াজে অভ্যস্ত ছিল, তার কোন ব্যাপারে হযরত(স) কোনদিন তার খান্দানের সহযোগিতা করেন নি।

নবুয়্যাতের সূচনা

amarboi.org

amarboi.org

হযরত (স) এর বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছলো। তার জীবনে এবার আর একটি বিপ্লবের সূচনা হতে লাগলো। নির্জনে বসে একাকী আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা এবং আপন সমাজের নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় তিনি মশগুল হয়ে পড়লেন।তিনি ভাবতে লাগলেনঃ তার কওমের লোকেরা কিভাবে হাতে-গড়া মূর্তিকে নিজেদের মা'বুদ ও উপাস্য বানিয়েছে।নৈতিক দিক থেকে তারা কত অধঃপাতে পৌঁছেছে!তাদের এই সব ভ্রান্তি কি করে দূরীভূত হবে?খোদা-পরস্তির নির্ভুল পথ কিভাবে তাদের দেখানো যাবে? এই বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত স্রষ্টা মালিকের বন্দেগী করা উচিত? এমন অসংখ্য রকমের চিন্তা ও প্রশ্ন তার মনের ভেতর তোলপাড় করতে লাগলো। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে এসব বিষয়ে তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

হেরা গুহায় ধ্যান

মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত জাবালূন নূর-এ 'হেরা'নামে একটি পর্বত-গুহা ছিল।হযরত(স) প্রায়শই সেখানে গিয়ে অবস্থান করতেন এবং নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা-ভাবনা ও খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সাধারণত খানাপিনার দ্রব্যাদি তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন, শেষ হয়ে গেলে আবার নিয়ে আসতেন।কখনো কখনো হযরত খাদীজা(র) ও তা পৌঁছে দিতেন।

সর্ব প্রথম ওহী নাযিল

এভাবে দীর্ঘ ছয়টি মাস কেটে গেল। হযরত চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। একদা তিনি হেরা গুহার ভেতর যথারীতি খোদার ধ্যানে মশগুল রয়েছেন্ সময়টি তখন রমজান মাসের শেষ দশক।সহসা তার সামনে আল্লাহর প্রেরিত এক ফেরেশতা আত্নপ্রকাশ করলেন। ইনি ফেরেশতা-শ্রেষ্ঠ জিবরাঈল(আ) ।ইনিই যুগ যুগ ধরে আল্লাহর রাসূলদের কাছে তার পয়গাম নিয়ে আসতেন।

হযরত জিবরাঈল(আ) আত্নপ্রকাশ করেই হযরত(স)-কে বললেনঃ'পড়ো'। তিনি বললেনঃ 'আমি পড়তে জানি না'।একথা শুনে জিবরাঈল(আ) হযরত(স)-কে বুকে জড়িয়ে এমনি জোরে চাপ দিলেন যে, তিনি থতমত খেয়ে গেলেন।অতঃপর হযরত(স)-কে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেনঃ'পড়ো'।কিন্তু তিনি আগের জবাবেরই পুনরুক্তি করলেন।জিবরাঈল(আ) আবার তাকে আলিঙ্গন করে সজোরে চাপ দিলেন এবং বললেনঃ'পড়ো'। এবারও হযরত(স)জবাব দিলেনঃ'আমি পড়তে জানি না।'পুনর্বার জিবরাঈল(আ) হযরত(স)-কে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{1} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ بِالْقَلَمِ{4} يَعْلَمْ{5}

"পড়ো তোমার প্রভুর(রব) নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন;সৃষ্টি করেছেন জমাট-বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ো এবং তোমার প্রভু অতীব সম্মানিত, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জিনিস শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।"

এই হচ্ছে সর্বপ্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা।এ ঘটনার পর হযরত(স) বাড়ি চলে গেলেন।তখন তার পবিত্র অন্তঃকরণে এক প্রকার অস্থিরতা বিরাজ করছিল।তিনি কাঁপতে কাঁপতে খাদীজা (রা) কে বললেনঃ'আমাকে শিগগির কম্বল দ্বারা ঢেকে দাও' খাদীজা(রা) তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর কিছুটা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে এলে তিনি খাদীজা (রা)-এর কাছে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন;বললেনঃ 'আমার নিজের জীবন সম্পর্কে ভয় হচ্ছে' খাদীজা(রা) বললেনঃ'না, কক্ষনোই নয়।আপনার জীবনের কোন ভয় নেই।খোদা আপনার প্রতি বিমুখ হবেন না।কেননা আত্মীয়দের হক আদায় করেন;অক্ষম লোকদের ভার-বোঝা নিজের কাঁধে তুরে নেন;গরীব-মিসকিনদের সাহায্য করেন;পথিক-মুসাফিরদের মেহমানদারী করেন।মোটকথা, ইনসাফের খাতিরে বিপদ- মুসিবতের সময় আপনিই লোকদের উপকার করে থাকেন।'

এরপর খাদীজা(রা) হযরত(স)-কে নিয়ে প্রবীণ খ্রিষ্টান ধর্মবেত্তা অরাকা বিন নওফেলের কাছে গমন করলেন।তিনি তাওরাত সম্পর্কে খুব ভালো পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হযরত খাদীজা(রা) তার কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন।তিনি সব শুনে বললেনঃ 'এ হচ্ছে মূসার ওপর অবতীর্ণ সেই 'নামূস'(গোপন রহস্যজ্ঞানী ফেরেশতা)। হায়! তোমার কওমের লোকেরা যখন তোমাকে বের করে দেবে, তখন পর্যন্ত আমি যদি জিন্দা থাকতাম! হযরত(স) জিজ্ঞেস করলেনঃ আমার কওমের লোকেরা কি আমায় বের করে দেবে? অরাকা বললেনঃ তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছো, তা নিয়ে ইতঃপূর্বে যে-ই এসেছে, তার

amarboi.org

amarboi.org

কওমের লোকেরা তার সঙ্গে দুশমনি করেছে। আমি যদি তখন পর্যন্ত জিন্দা থাকি, তাহলে তোমায় যথাসাধ্য সাহায্য করবো' এর কিছুদিন পরই অরাকার মৃত্যু ঘটে।

এরপর কিছুদিন জিবরাঈলের আগমন বন্ধ রইলো। কিন্তু হযরত(স) যথারীতি হেরা গুহায় যেতে থাকলেন।এই অবস্থা অন্তত ছয়মাস চলতে থাকলো।এই বিরতির ফলে কিছুটা ফায়দা হলো। মানবীয় প্রকৃতির দরুণ তার অন্তরে ওহী নাযিলের ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হলো। এমন কি, এই অবস্থা কিছুটা বিলম্বিত হলে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে জিবরাঈলের আগমন শুরু হলো। তবে ঘন ঘন নয়,মাঝে মাঝে। জিবরাঈল এসে তাকে এই বলে প্রবোধ দেন যে,আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল মনোনীত হয়েছেন। এরপর হযরত(স) শান্ত চিত্তে প্রতিক্ষা করতে লাগলেন। কিছুদিন পর জিবরাঈল ঘন ঘন আসা শুরু করলেন।

আন্দোলনের সূচনা

হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিলের পর কিছুদিন পর্যন্ত আর কোন ওহী আসেনি। এরপর সূরা মুদ্দাসিরের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল হলো-

{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ}1 قُمْ فَأَنذِرْ{2} وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ{3} وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ{4} وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ{5} وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ{6} وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ{7}

"হে কম্বল আচ্ছাদনকারী ওঠো এবং (ভ্রষ্টাচারী লোকদেরকে)ভয় দেখাও।আর আপন প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। লেবাস-পোশাক পরিষ্কার রাখো এবং নোংরামী ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। বেশি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কারো প্রতি অনুগ্রহ করো না এবং আপন প্রভুর খাতিরে বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করো। "

নবুয়্যাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার এটা ছিল সূচনা মাত্র।এবার তিনি যথারীতি হুকুম পেলেন যে,ওঠো এবং ভ্রষ্ঠ মানবতাকে কল্যাণ দেখাও লোকদের কে সতর্ক করে দাও যে, সফলতার পথ মাত্র একটি এবং তা হচ্ছে এক খোদার বন্দেগী ও আনুগত্য। যারা এই পথ অবলম্বন করবে, পরিণামে তারাই সফলকাম হবে আর যারা এ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করতে চায়,তাদের কে আখিরাতে মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখাও।তাদের কে বল, মানুষের জীবন-ধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত শুধুমাত্র এক খোদার বন্দেগী,তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের স্বীকৃতির ওপর। একমাত্র এভাবেই মানুষ সর্ববিধ প্রকাশ্য নাপাকী ও গোপন নোংরামী থেকে বেঁচে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে খোদা ছাড়া অন্যান্য শক্তির বন্দেগী হচ্ছে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার মূলীভূত কারণ।একইভাবে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করা উচিত;সে সদাচরণের বুনিয়াদ কোন পার্থিব স্বার্থ কিংবা লালসার ওপর স্থাপিত হওয়া উচিত নয়।

সংগ্রামের দুই পর্যায়

এখান থেকে হযরত(স)-এর জীবনের সংগ্রামী পর্যায় শুরু হলো। এই পর্যায়কে আমরা দুটি বড়ো বড়ো অংশে ভাগ করতে পারি। এক :হিজরতের পূর্বে মক্কায় অতিবাহিত অংশ;যাকে বলা হয় মক্কী পর্যায়। দুই :হিজরতের পর মদিনায় অতিক্রান্ত অংশ;একে বলা হয় মাদানী পর্যায়।প্রথম পর্যায় তের বছর এবং দ্বিতীয় পর্যায় প্রায় দশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

amarboi.org

amarboi.org

প্রথম পর্যায় :মক্কী জীবন

হযরত(স)-এর সংগ্রামী জীবনের এই পর্যায় তার নিজস্ব পরিণতির দিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যায়েই ইসলামের ক্ষেত্র কর্ষিত হয়।এই পর্যায়ে মানবতার এমন সব উন্নত নমুনা তৈরি হয়,যাদের কল্যাণে উত্তর কালে ইসলামী আন্দোলন সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমানে যে সব ইতিহাস ও নবী-চরিত পাওয়া যায়, তার কোথাও মক্কী পর্যায়ের বিস্তৃত ঘটনা দেখা যায় না।তাই এ পর্যায়ের গুরুত্ব এবং শিক্ষামূলক ঘটনাবলী অনুধাবণ করতে হলে কুরআনের মক্কী অংশ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা দরকার।প্রকৃতপক্ষে, এই পর্যায়ের সঠিক গুরুত্ব ঠিক তখন উপলব্ধি করা সম্ভব,যখন মক্কী সূরাসমূহের প্রকাশ-ভঙ্গি, তখনকার পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর বর্ণনা, তওহীদ ও আখিরাতের প্রমাণাদি, জীবন ও চরিত্র গঠনের নির্দেশাবলী এবং হক ও বাতিলের চরম সংঘাতকালে আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে মুষ্টিমেয় কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনার বিবরণ সামনে আসবে।

মক্কী জীবনের চার স্তর

হিজরতের পূর্বে হযরত(স) তার পবিত্র জীবনের যে অংশ মক্কায় অতিবাহিত করেন এবং যা ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয, তাকে আপন বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে চারটি স্বতন্ত্র বিভক্ত করা যায়।

প্রথম স্তর :নবুয়্যাতের পর প্রায় তিন বছরকাল;এ সময়ে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ গোপনে আঞ্জাম দেয়া হয়।

দ্বিতীয় স্তর :নবুয়্যাতের প্রকাশ্য ঘোষণার পর প্রায় দু' বছরকাল। এ স্তরের প্রথম দিকে আন্দোলনের কিছু বিরোধিতা করা হয়।এরপর ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, নানারুপ অপবাদ দিয়ে, মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে এবং বিরুদ্ধ কথাবার্তা বলে তাকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয় স্তর :এতদসত্ত্বেও যখন ইসলামী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে সামনে এগুতে থাকে, তখন জুলুম নির্যাতনের শুরু হয়।মুসলমানের ওপর নিত্য- নতুন জোর-জুলুম চলতে থাকে এই অবস্থা প্রায় পাঁচ- ছয় বছরকার অব্যাহত থাকে। এ সময় মুসলমানদের নানারুপ বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয়।

চতুর্থ স্তর : আবু তালিব হযরত খাদিজা(রা)-এর ওফাতের পর থেকে হিজরত পর্যন্ত প্রায় তিন বছরকার। এ স্তরটি হযরত(স) এবং তার সঙ্গীদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন সংকটকাল ছিল।

প্রথম স্তর :গোপন দাওয়াত নবুয়্যাতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হবার পর হযরত(স)-এর সামনে প্রথম সমস্যা ছিলোঃএক খোদার বন্দেগী কবুল করার ও অসংখ্য মিথ্যা খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করার দাওয়াত প্রথম কোন ধরণের লোকদের দেওয়া যাবে?দেশ ও জাতির লোকদের তখন যে অবস্থা ছিল,তার একটি মোটামুটি চিত্র ইতঃপূর্বে পেশ করা হয়েছে। এহেন লোকদের সামনে তাদের মেজাজ,পসন্দ ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত কোন জিনিস পেশ করা বাস-বিকই অত্যন- কঠিন কাজ ছিল। তাই যে সব লোকের সঙ্গে বতেদিন হযরত(স) এর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং যারা তার স্বভাব প্রকৃতি ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সারাসরি অবহিত ছিলেন, তাদেরকেই তিনি সর্ব প্রথম দাওয়াতের জন্যে মনোনীত করলেন। কারণ, এরা হযরত(স)-এর সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন এবং তিনি কোন কথা বললে তাকে সরাসরি অস্বীকার করা এদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত খাদীজা(রা)। তারপর হযরত আলী(রা), হযরত জায়েদ(রা), হযরত আবু বকর(রা) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আলী(রা) হযরত(স)-এর চাচাতো ভাই,জায়েদ(রা) গোলাম এবং আবু বকর(রা) ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।এরা বছরের পর বছর ধরে হযরত(স)-এর সাহচর্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই সর্ব প্রথম হযরত খাদীজা(রা) এবং পরে অন্যান্যদের কাছে তিনি দাওয়াত পেশ করেন। এরাই ছিলেন উম্মাতের মধ্যে পয়লা ঈমান্দার -ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত প্রথম ভাগ্যবান দল। এরা হযরত(স)-এর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তার সত্যতা স্বীকার করেন।এদের পর হযরত আবু বকর(রা)-এর প্রচেষ্টায় হযরত উসমান(রা), হযরত জুবাইর(রা), হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ(রা), হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস(রা) হযরত তালহা(রা) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে গোপনে গোপনে ইসলামের দাওয়াত ছড়াতে লাগলোএবং মুসলমানের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

amarboi.org

amarboi.org

কুরআনের অনন্য প্রভাব

এপর্যায়ে কুরআনের যে অংশগুলো নাযিল হয়েছিল, তা ছিল আন্দোলনের প্রথম স্তরের উপযোগী ছোট-খাটো বাক্য সমন্বিত। এর ভাষা ছির অতীব প্রাঞ্জল, কবিত্বময়, ও হৃদয়গ্রাহী। পরন্ত এতে এমন একটা সাহিত্যিক চমক ছির যে, শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তা শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তার করতো এবং এক একটি কথা তীরের ন্যায় বিদ্ধ হতো। এসব কথা যে শুনতো তার মনেই প্রভাব বিস্তার করতো এবং বারবার তা আবৃত্তি করার ইচ্ছা জাগতো।

আকিদা-বিশ্বাসের সংশোধন

কুরআন পাকের এই সূরাগুরোতে তওহদি ও আখিরাতের তাৎপর্য বর্ণনা করা হচ্ছিল। এ ব্যাপারে এমন সব প্রমানাদি পেশ করা হচ্ছিল, যা প্রতিটি শ্রোতার মনে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল। এসব দলিল প্রমাণ শ্রোতাদের নিকটতম পরিবেশ থেকেই পেশ করা হচ্ছিল। পরন্ত এসব কথা এমন ভঙ্গিতে পেশ করা হচ্ছিল, যে সম্পর্কে শ্রোতারা পুরোপুরি অভ্যস্ত ও অবহিত ছিল। তাদেরই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এসব কথা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। আকিদা-বিশ্বাসের যে সব ভ্রান্তি সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল ছিল, সেগুলো সম্পর্কেই আলোচনা করা হচ্ছিল্ এ কারণেই খোদার এই কালাম শুনে কেউই প্রভাবিত না হয়ে পারছিল না। খোদার নবী প্রথমে একাকীই এই আন্দোরন শুরু করেছিলেন। কিন্তু কুআনের এই প্রাথমিক আয়াতসমূহ এ ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। ফলে গোপনে গোপনে আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

এ পর্যায়ে দাওয়াত প্রচারের জন্যে তওহীদ ও আখিরাতের দলিল-প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্যে খোদ হযরত(স)-কে কিভাবে আত্মপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং কি কি পন্থা তাকে অবলম্বন করতে হবে সে সম্পর্কেও তাকে সরাসরি শিক্ষাদান করা হচ্ছিল।

চুপিসারে নামায

এ পর্যন্ত সবকিছু গোপনে গোপনেই হচ্ছিল্ নেহাত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক ছাড়া বাইরের কারো কাছে কোন কিছু যাতে ফাঁস না হয়ে যায়, সেজন্যে হামেশা সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছিল। নামাযের সময় হলে হযরত(স) আশেপাশের কোন পাহাড়ের ঘাঁটিতে চলে যেতেন এবং সেখানে নামায আদায় করতেন। একবার তিনি হযরত আলী(রা) কে সঙ্গে নিয়ে কোন এক জায়গায় নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তার চাচা আবু তালিব ঘটনাক্রমে সেখানে এসে হাজির হলেন।তিনি অনেকক্ষণ ধরে ইবাদতের এই নতুন পদ্ধতি তাজ্জবের সাথে লক্ষ্য করলেন। নামায শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘এটা কোন ধরণের দ্বীন।’ হযরত(স) জববি দিলেনঃ‘আমাদের দাদা ইবরাহীম(আ)-এর দ্বীন।’ আবু তালিব বললেনঃ‘বেশ, আমি যদিও এটা গ্রহণ করতে পারছি না, তবে তোমাকে পালন করার পুরো অনুমতি দিলাম। কেউ তোমার পথে বাদ সাধতে পারবে না।’

এ যুগের মুমিনের বৈশিষ্ট্য

এই প্রারম্ভিক যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ সময় ইসলাম গ্রহণ ছিল প্রকৃতপক্ষে জীবন নিয়ে বাজী খেলার নামান্তর। কাজেই এ যুগে যারা সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামের দাওয়াত কবুল করেন, তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল,যার ভিত্তিতে তারা এ বিপদ সঙ্কুল পথে অগ্রসর হবার সাহস পেয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই :এসব লোক আগে থেকেই মুশরিকী রসম রেওয়াজ ও ইবাদত বন্দেগীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং সত্যের জন্যে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে এরা ছিলেন সৎ ওসত্যের অধিকারী।

প্রায় তিন বছর যাবত দাওয়াত ও প্রচারের কাজ এভাবে গোপনে গোপনে চলতে লাগলো।কিন্তু কতদিন আর এভাবে চলা যায়!যে সূর্যকে আপন রশ্মি দ্বারা সারা দুনিয়াকে আলোকময় করে তুলতে হবে, তাকে তো লোকচক্ষুর সামনে আত্মপ্রকাশ করতে হবেই। তাই আন্দোলন এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে পদার্পণ করলো।

amarboi.org

amarboi.org

দ্বিতীয় স্তর : প্রকাশ্য দাওয়াত

এবার গোপন কর্মসূচি পরিহার করে প্রকাশ্যেই দাওয়াত প্রচারের আদেশ পাওয়া গেল। সুতরাং একদিন হযরত(স) সাফা পর্বতের ওপর আরোহণ করলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে উচ্চেঃস্বরে বললেনঃ'ইয়া সাবা হা -হে সকাল বেলার জনতা!' আরবে সে সময় একটা নিয়ম ছিল এই যে, কখনো কোন বিপদ দেখা দিলে কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ এই সাংকেতিক কথাটি উচ্চারণ করতো। লোকেরা এই সংকেত ধ্বনি শুনেই দ্রুত সেখানে জমায়েত হলো। এদের মধ্যে তার চাচা লাহাবও ছিল।

হযরত(স) সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃহে লোক সকল! আমি যদি বলি যে, এই পাহাড়ের পিছনে বিরাট একদল শত্রুসৈন্য তোমাদের ওপর হামলা চালানো জন্যে ওঁত পেতে আছে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?রোকেরা বললোঃ 'নিশ্চয় করবো।তুমি তো কখনো মিথ্যা কথা বল নি। আমরা তোমাকে আস সাদিক এবং আল-আমিন বলেই জানি।' হযরত(স) বললেনঃ'তাহলে শোন,আমি তোমাদেরকে এক খোদার বন্দেগীর দিকে আহ্ববান জানাচ্ছি এবং মূর্তি পূজার পরিণাম থেকে তোমাদের কে বাঁচাতে চাচ্ছি। তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তাহলে তোমাদের এক কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।

কুরাইশরা একথা শুনে যারপরনাই অসন্তষ্ট হলেন।আবু লাহাব ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলোঃ'ব্যস এটুকু কথার জন্যেই বুঝি তুমি সাত সকালে আমাদেরকে ডেকেছিলে?

এটা ছিল ইসলামের সাধারণ ও প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা।এবার রাসূলে খোদা অত্যন্ত খোলাসা করে জানিয়ে দিলেন যে, তাকে কি কথা বারবার এবং কোন রাজপথের দিকে লোকদের আহ্ববান জানাবার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেনঃ এই বিশাল সাম্রাজ্যের স্রষ্টা ও মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই তার প্রকৃত মালিক। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা হচ্ছে এই যে, সে এক আল্লাহর বান্দা এবং গোলামের বেশি কিছু নয়। তারই আনুগত্য ও ফরমাবর্দারী করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য(ফরয)। তিনি ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করা অথবা তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা মালিক কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহই মানুষ এবং তামাম জাহানের স্রষ্ঠা, মা'বুদ ও শাসক। তার এই সাম্রাজ্যের ভেতর মানুষ না পূর্ণ স্বাধীন আর না অন্য কারো গোলাম। মানুষের কাছে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আনুগত্য -বন্দেগী বা পূজা-উপাসনা -পাওয়ার যোগ্য নয়। দুনিয়ার এই জীবনে আল্লাহ মানুষ কে কিছুটা কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন বটে, কিন্তু আসলে দুনিয়ার জীবন একটা পরীক্ষাকাল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ পরীক্ষার পর অবশ্যই মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সমস্ত কাজ কর্ম যাচাই করে পরীক্ষার সাফল্য ও ফলাফল ঘোষণা করবেন।

এ ঘোষণা কোন মামুলি ব্যাপার ছিল না।এর ফলে গোটা কুরাইশ এবং অন্যান্য গোত্রের ভেতর আগুন জ্বলে উঠলো এবং চারদিকে এ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল।কয়েকদিন পর হযরত(স) আলী(র)-কে একটি ভোজ সভার আয়োজন করতে বললেন। এতে গোটা আবদুল মুত্তালিব খান্দানকে আমন্ত্রণ করা হলো। এ ভোজ সভায় হামজাহ, আবু তালিব, আব্বাস প্রমুখ সবাই শরীক হলেন।পানাহারের পর হযরত(স) দাঁড়িয়ে বললেনঃআমি এমন একটি জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্যেই যথেষ্ঠ। এই বিরাট বোঝা উত্তোলনে কে আমার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন? এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন সময়। চারদিকে শুধু বিরোধিতার ঝাণ্ডা উত্তোলিত হচ্ছিল। সুতরাং এবোঝা উত্তোরনে সহযোগিতা করার অর্থ ছিল এইযে, শুধু দু'একটি খান্দান, গোত্র শহরের লোকদেরই নয়, বরং গোটা আরবের বিরোধিতা মুকাবেলা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তুত হতে হবে।তাকে এ জন্যেও তৈরি হতে হবে যে, এর বিনিময়ে শুধু আখিরাতের জিন্দেগী সফলকাম হবে এবং সে আপন মালিকের সন'ষ্টি লাভ করতে পারবে।এছাড়া দূরব্যাপী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও তাৎক্ষণিক ফায়দা লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না।ফলে সমস্ত মজলিসের ওপর একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো।উঠে দাঁড়ালেন শুধু কিশোর আলী। তিনি বললেনঃ 'আমার চোখে যদিও যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছে, আমার হাঁটুদ্বয় অত্যন্ত দুর্বল, পরন্ত বয়সেও আমি সবার ছোট, তবুও আমি আপনার(হযরতের) সহযোগিতা করে যাবো।মাত্র তেরো বছর বয়স্ক একটি বালক না বুঝে-শুনে এত বড় একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। গোটা কুরাইশ খান্দানের পক্ষে এটা ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

amarboi.org

amarboi.org

আন্দোলনের বিরোধিতা

এ পর্যন্ত ইসলামী সংগঠনে চল্লিশ কি তার চেয়ে কিছু বেশি লোক যোগদান করেছিল। এরপর একদিন হযরত(স) কা'বা শরীফে গিয়ে তওহীদের কথা ঘোষণা করলেন।মুশরিকদের কাছে এটা ছিল কাবা শরীফের সবচেয়ে বড় অবমাননা।এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এক বিরাট হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। চারদিক থেকে লোকেরা এসে হযরত(স)- এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।হযরত হারিস বিন আবী হালাহ(রা)তাকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে এলেন।কিন্তু চারদিক থেকে এত তলোয়ার ঝনঝনিয়ে উঠলো যে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।ইসলামের পথে এই ছিল প্রথম শাহাদাত। খোদার ফযলে হযরত(স) নিরাপদ রইলেন এবং কোন রকমে হাঙ্গামাও মিটে গেল।

বিরোধিতার কারণসমূহ

ইসলামী আন্দোলনের মূলমন্ত্র তওহীদের এই ঘোষণা সবচেয়ে বেশি আতঙ্কজনক ছিল কুরাইশদের জন্যে।তারাই এ আন্দোলনের বিরোধিতা করছিল তীব্রভাবে।কারণ এ সময় কাবার কারণেই মক্কার যা কিছু ইজ্জত বর্তমান ছিল।আর কুরাইশ খান্দান ছিল কাবার মুতাওয়াল্লী ও তত্ত্বাবধায়ক।ফলে প্রায় সারা আরব উপদ্বীপেই কুরাইশদের এক প্রকার ধর্মীয় আধিপত্য কায়েম ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে লোকেরা তাদের দিকেই চেয়ে থাকতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করতো।তাই ইসলামী আন্দোলনের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক তীব্র আঘাত পড়ে কুরাইশদের এই ধর্মীয় আধিপত্যের ওপর।এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে,বাপ-দাদার অনুসৃত ধর্মের প্রতি মূর্খ জাতিগুলোর একটা অন্ধ বিশ্বাস থাকে বলে কোন যুক্তি সম্মত কথা পর্যন্ত তারা শুনতে চায় না।এ কারণেই এ নতুন ধর্ম আন্দোলনের কথা শুনে আরবের কায়েমি স্বার্থীরা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো।তাছাড়া কুরাইশদের প্রভাবশালী লোকেরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল যে এই নয়া আন্দোলন ফলে-ফুলে বিকশিত হতে পারলে তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।ধর্মীয় কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যে মর্যাদা তারা ভোগ করে আসছে, তা-ও আপনি- আপনিই খতম হয়ে যাবে।এই কারণে যে যতবড় গদিতে সমাসীন, সে ততখানি ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করতে লাগলো।

অপরদিকে কুরাইশদের মধ্যে নানারুপ দুষ্কৃতি ও অনৈতিকতা বিস্তার লাভ করেছিল। বড় বড় পদস্ত ব্যক্তিরা নানারুপ গর্হিত কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। এতদ সত্ত্বেও ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদার কারণে তারা লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হতো না।এই প্রেক্ষিতে হযরত(সা) একদিকে মূর্তিপূজার অনিষ্ঠকারিতা বর্ণনা করে তার পরিবর্তে লোকদেরকে খালেস তওহীদের দিকে আহ্ববান জানাচ্ছিলেন, অন্যদিকে তিনি মানুষের বুনিয়াদী চরিত্রের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো খোলাখুলি বয়ান করে এসব থেকে বাঁচার জন্যে তাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন।তার এসব উপদেশ ঐ বড়লোকদের কঠিন পেরেশানিতে ফেলে দিচ্ছিল। কারণ, হযরত(স)-এর কথাগুলোকে তারা সত্য বলে স্বীকার করে নিতে পারছিল না।আর যেহেতু তারা নিজেরা এসব দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত ছিল না, তাই জনসাধারণের মধ্যে এসব কথা প্রচারিত হতেই তারা আতঙ্কিত বোধ করলো।তারা উপলব্ধি করলো যে, লোকচক্ষে তাদের মর্যাদার অবনতি ঘটছে এবংসামনা-সামনি না হলেও পেছনে অবশ্যই তাদের সমালোচনা হচ্ছে।তাদের মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধির জন্যে এই কথাগুলোই যথেষ্ঠ ছিল।পরন্ত কুরআন মাজীদে এই ধরণের দুশ্চরিত্র ও দুষ্কৃতিকারী লোকদের সম্পর্কে বারবার আয়াত নাযিল হচ্ছিল এবং তাদের এই শ্রেণীর কীর্তিকলাপের জন্যে কঠোর আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছিল।এই সকল আয়াত যখন সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হতে লাগলো, তখন কোথাকার পানি কোনদিকে গড়াচ্ছে, তা সবাই স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলো।

ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা ও বৈরিতার জন্যে এই কারণগুলো এতই যথেষ্ঠ ছিল যে, হয়তো এই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা ইসলামী সংগঠনের মুষ্টিমেয় লোকদের বিরুদ্ধে অসংখ্য তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতো এবং এই নয়া 'বিপদের' নাম-নিশানাকে একেবারে মুছে ফেলতে পারতো। কিন্তু আল্লাহর দরবারে আগেই ফয়সালা হয়েছিল যে, এই মুষ্টিমেয় লোকদের মারফতেই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার একমাত্র মুক্তি-পয়গামকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিবেন। এই জন্যে এ সময় এমন কতকগুলো কার্য-কারণও দেখা দিলো, যার ফলে কুরাইশরা ঐরুপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হলো না।

amarboi.org

amarboi.org

বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচার

মাত্র অল্প কিছুকাল আগে কুরাইশরা গৃহযুদ্ধের ফলে নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়েছিল। ফুজ্জারের যুদ্ধের পর তারা এতোটা হীনবল হয়ে পড়েছিল যে, যুদ্ধের নাম শুনলেই সবাই আঁতকে উঠতো। তদুপরি বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত এবং ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত মুষ্টিমেয় মুসলমানদের হত্যা করার অর্থ ছিল আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া।কেননা এসময় কোন এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অর্থই ছিল তার সাথে সংশ্লিষ্ট তামাম গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। আর এভাবে যুদ্ধ বাঁধলে সমগ্র মক্কারই যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হবার প্রবল আশংকা ছিল। তাই এ পর্যায়ে আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার জন্যে নানারুপ বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা হলো। আন্দোলন ও তার আহ্ববায়ক কে নানাভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হলো। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করা হলো;রাস্তাঘাটে গালিগালাজ ও হৈ-হল্লা দ্বারা উত্যক্ত করা হলো। নিত্য-নতুন মিথ্যা ও ভ্রান- কথা প্রচার চালানো হলো। মজনু ও পাগল বলে আখ্যা দেওয়া হলো;কবি ও জাদুকর বলে প্রচার করা হলো।সর্বোপরী, হযরত(স)-এর কথা শোনা থেকে বিরত রাখার জন্য লোকদেরকে সরাসরি বাধা দেওয়া হলো।

অপপ্রচারের মুকাবেলা

এ পর্যায়ে কুরআন মাজীদে যেসব সূরা অবতীর্ণ হচ্ছিল,তাতে এ পরিস্থিতি মুকাবেলা করার জন্যে বারবার পথনির্দেশনা আসছিল এবং বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত আপত্তি সমূহের যথোচিত ও যুক্তিযুক্ত জবাবও দেয়া হচ্ছিল। দৃষ্টান্তস্বরুপ, সূরা ক্বলমে হযরত(স)-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হলোঃআপনার প্রতি আল্লাহ খুবই মেহেরবান।আপনি পাগল বা মজনু নন;আপনার প্রতি তার অপরিসীম অনুগ্রহ রয়েছে। কার জ্ঞান বুদ্ধি বিকৃত হয়ে গেছে ,তা শিগগিরই জানা যাবে। আপনার প্রভু খুব ভার করেই জানেন যে,কে সঠিক পথে রয়েছে,আর কে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আপনি নিজের কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন। যারা এ আন্দোলনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের কথায় মোটেই কর্ণপাত করবেন না। তারা চায় যে, আপনি আন্দোলনের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করুন তো তাদের তৎপরতাও আপনি আপনি শিথিল হয়ে আসবে।কিন্তু ঐ সব লোকের প্রবৃত্তি অনুসরণ করা আপনার কাজ নয়। আপনি যা কিছু পেশ করেছেন, তা যারা মানতে রাজি নয়, তাদের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। তারা খুব শিগগিরই জানতে পারবে যে,তাদের যে অবকাশ দেয়া হয়েছিল, তার তাৎপর্য কি?আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুনঃ'আমি কি তোমাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করছি? না নিজের ফায়দার জন্যে কিছু দাবি করছি? অথবা আমার কথার বিরুদ্ধে তোমাদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণ আছে ? এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, তাদের কাছে এ ধরণের প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।আপনি অত্যন্ত ধৈর্যশীলতার সাথে পরিস্থিতি মুকাবেলা করুন। যথাসময়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই।

উদ্ধৃত বাণী একটি নমুনা মাত্র। এ ধরনের বাণী বরাবরই নাযিল হচ্ছিল। তাতে লোকদের স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হলো যে, সত্যের আহ্ববায়ক না মজনু না গণক -না কবি নাজাদুকর। গণক, কবি ও জাদুকরের বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদের সামনে রাখো এবং সত্যে আহ্ববায়কে ভিতর তার কোন কোন লক্ষণ পাওয়া যায়, তাও বিচার করে দেখ। তিনি যে কালাম পেশ করেছেন, তার প্রতিটি কাজের মাধ্যমে যে চরিত্র প্রতিভাত হচ্ছে এবং তোমাদের মাঝে তিনি যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন, তার কোনটির সাথে পাগল, কবি ও জাদুকরের তুলনা হতে পারে?

আন্দোলনের প্রতি লোকদের মনোযোগ

মক্কাবাসীদের এই ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় অবশ্য একটি ফায়দা হলো। তারা লোকদের যতোই বিরত রাখার চেষ্টা করছিল, তাদের মধ্যে ততোই এ কৌতূহল জাগতে লাগলোঃআচ্ছা, এ লোকটি কি বলছেন, একটু দেখা যাক না। এই কৌতূহলের ফলে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে যে সব লোক হজ্জ কিংবা অন্য কোন কাজে মক্কায় আগমন করতো, তাদের অনেকে চুপি চুপি হযরত(স)-এর খেদমতে গিয়ে হাযির হতো। এখানে এসে তারা হযরত(স)-এর মহান চরিত্র অবলোকন এবং আল্লাহর বাণী শ্রবণ করতো; ফলে তাদের অন্তর-রাজ্যে এক প্রচণ্ড আলোড়ন ও পরিবর্তন সূচিত হতো। অতঃপর নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তারা ইসলামের দাওয়াত প্রচারে আত্মনিয়োগ করতো।

এভাবে ইসলামের প্রচারকার্য যখন বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়লো, তখন লোকেরা শুধু হযরত(স)- অবস্থা জানবার জন্যেই দূর-দারাজ এলাকা থেকে আসতে লাগলো। এ ধরনের ঘটনাবলীর মধ্যে হযরত আবু জার গিফারী(রা) ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।কুরাইশরা ব্যবসায় উপলক্ষে যে পথ দিয়ে সিরিয়ায় যাতায়াত করতো, সেই পথের পাশেই গিফার গোত্রটি

amarboi.org

amarboi.org

বসবাস করতো। ঐ গোত্রের কাছে মক্কার ঘটনাবলীর কথা উপনীত হলে হযরত(সা)-সাক্ষাত করার জন্যে হযরত আবু জরের হৃদয়ে প্রবল আগ্রহ জাগলো। তিনি প্রথমত তার সহোদর ভাই আনিসকে এই বলে মক্কায় পাঠালেনঃ'তুমি গিয়ে দেখ, যে লোকটি নবুয়্যাতের দাবি করেছেন, তিনি লোকদের কি তালিম দিচ্ছেন।' আনিস মক্কায় এসে হযরত(স) সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে যথারীতি ফিরে গেলেন এবং তার ভাই কে বললেনঃ'লোকটি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তিনি খুব চমৎকার নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেন এবং এক খোদার বন্দেগীর প্রতি লোকদেরকে আহ্বান জানান। তিনি যে কালাম পেশ করেন, তা কবিত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।'

এই সংক্ষিপ্ত কথায় হযরত আবু জার হৃষ্ট হতে পারলেন না। তিনি নিজেই সফরের জন্যে তৈরি হলেন।কিন্তু মক্কায় পৌঁছে ভয়ে কারো কাছে হযরত(স)-এর নাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না। অবশ্য কাবা গৃহে হযরত আলী(রা)-এর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলে তার বাড়িতে তিন দিন মেহমান হিসেবে অবস্থান করলেনএবং শেষ পর্যন্ত তার কাছে সফরের উদ্দেশ্য বিবৃত করতে ভরসা পেলেন।আলী(রা)তাকে হযরত (স)-এর খেদমতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছেই আবু যার ইসলাম কবুল করলেন। হযরত(স) তাকে নিজ গোত্রের মধ্যে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তওহীদের যে সতেজ প্রভাব তার মনে ক্রিয়াশীল হলো, তা তার মন থেকে সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ ও ভয়-ভীতি দূর করে দিলো।তিনি সেখান থেকে কাবা গৃহে পৌঁছেই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেনঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ

''আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ'' এ ঘোষণা শুনেই লোকেরা চারদিক থেকে ছুটে এসে তাঁকে বেদম প্রহার করতে লাগলো।এমনি সময় হযরত আববাস (রা)সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি হামলাকারীদের বললেনঃ'এ লোকটি গিফার গোত্রভুক্ত এবং তোমাদের বাণিজ্য পথটি এদেরই এলাকা দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। কাজেই এরা যদি তোমাদের পথ বন্ধ করে দেয়, তাহলে কি করবে ? একথা শুনেই হামলাকারীরা তাকে ছেড়ে দিল।

হযরত আবুজার আপন গোত্রের মধ্যে ফিরে এসে ইসলামের আহবান জানালে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অর্ধেক লোক মুসলমান হয়ে গেল। গিফারদের কাছাকাছি আসলাম গোত্র বসবাস করত। এদের প্রভাবে তারাও ইসলামের দাওয়াত কবুল করলো। এভাবে ইসলামের দাওয়াত ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।বিরুদ্ধবাদীদের কাছে এটা নিদারুণ ক্ষোভ ও বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। এমনকি এদের ভেতরকার কিছু লোক বাধ্য হয়ে আবু তালিবের কাছে গিয়ে অভিযোগ পেশ করলো। এই প্রতিনিধি দলে প্রায় সমস্ত কুরাইশ নেতাই শামিল ছিল। তারা আবু তালিবকে বললোঃ 'তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের মাবুদ ও উপাস্য দেবতাদের অপমান করছে। আমাদের বাপ-দাদাদের গোমরাহ বলে প্রচার করছে, আমাদের সবইকে আহম্মক ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যা দিচ্ছে। সুতরাং হয় তুমি মাঝপথ থেকে সরে দাঁড়াও, ব্যাপারটা আমরা শেষবারের মত মিটিয়ে ফেলি, নচেত তাকে তুমি বুঝিয়ে ঠিক করো।' আবু তালিব বুঝতে পারলেন,ব্যাপারটা এখন খুবই নাজুক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া তিনি একাকী কতো দিনই বা সমস্ত কুরাইশের মুকাবিলা করবেন। তিনি হযরত (স)-কে ডেকে বললেন : ' স্নেহের ভাতিজা, আমার ওপর তুমি এতো বোঝা চাপিও না যাতে, আমি উঠে দাঁড়াতে না পারি।'

হযরত (স) দেখলেন, এবার চাচা আবু তালিবের পাও নড়ে-চড়ে যাচ্ছে। তাই তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন : 'খোদার কসম ! এই লোকগুলো যদি আমার এক হাতে চন্দ্র এবং অপর হাতে সূর্যও এনে দেয়, তবুও আমি আপন কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবো না। খোদা হয় এই কাজকে পুরা করার সুযোগ দেবেন, নতুবা আমি নিজেই এ কাজের ভেতর বিলীন হয়ে যাবো।' হযরত (স)- এর কঠোর সংকল্প ও নির্ভীক ফয়সালার কথা শুনে আবু তালিবও আবার হিম্মত ফিরে পেলেন। তিনি বললেন : 'যাও, কেউ তোমার একটি চুলও বাঁকা করতে পারবে না।'

amarboi.org

amarboi.org

বিরুদ্ধবাদীদের প্রলোভন

কুরাইশরা এদিক থেকেও নিরাশ হয়ে অবশেষে চরম পন্থা হিসেবে স্থির করলো যে, কঠোরতা দ্বারা সম্ভব না হলে নম্রতা দ্বারাই এ আন্দোলন খতম করতে হবে। তারা প্রবীণ নেতা উতবা বিন রাবিয়াকে একটি প্রস্তাবসহ হযরত (স)- এর খেদমতে প্রেরণ করলো। সে এসে বললো :'মুহাম্মদ ! আচ্ছা বলো তো, তুমি কি চাও? মক্কার শাসন ক্ষমতা পেতে চাও? কিংবা বড় ঘরে বিবাহ করতে চাও? অথবা অগাধ ধন-দৌলত তোমার কাম্য? আমরা এসবই তোমাকে যোগাড় করে দিতে পারি। এজন্যে কেন মিছেমিছি এসব করছো? আমরা সমগ্র মক্কাকে তোমার কর্তৃত্বাধীন করে দিতে রাজি। এছাড়া আরো কিছু চাইলে তারও ব্যবস্থা করে দিতে প্রস্তত; কিন্তু তুমি এই আন্দোলন থেকে বিরত হও।

বেচারা বিরুদ্ধবাদীরা শুধু এটুকুই ভাবতে পেরেছিল। প্রচ্ছন্ন বস্তগত স্বার্থ ছাড়াই যে কোনো আন্দোলন পরিচালনা অথবা কোন আদর্শের দাওয়াত বুলন্দ করা যেতে পারে, এটা আদৌ তাদের ম-মানসে ঠাঁই পায়নি। তারা একথা চিন্তাই করতে পারেনি যে, কোনো কাজ শুধু খোদার সন্তষ্টি এবং নিছক তার আনুগত্যে জন্যেও করা যেতে পারে। তারা শুধু এটুকুই জানতো যে, ধন-দৌলত আর শাসন কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যেই মানুষ জান-মাল কুরবানী করে থাকে।তারা কি করে বুঝবে যে, আখিরাতে অনন্ত জীবনের কামিয়াবীর জন্যেও মানুষ এগুলো উৎসর্গ করে থাকে ? তাই উতবার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, তার প্রস্তাবটি অবশ্যই মঞ্জুর হবে। কিন্তু হযরত(স) তার প্রশ্নের জবাবে শুধু তওহীদের দাওযাত এবং তার নবুয়্যাত উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কুরআন পাকের কতিপয় আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

হযরত(স) -এর জবাব শুনে উতবা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেল। সে কুরাইশ নেতৃবর্গের সামনে নিজের রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে বললোঃ মুহাম্মদ যে কালাম পেশ করছে, তা কিন্তু কবিত্ব নয়, বরং অন্য কিছু। আমার মতে, মুহাম্মদ কে তার নিজের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদি সে কামিয়াবী হয় তো সমগ্র আরবের ওপরই বিজয়ী হবে এবং তাতে তোমাদের ইজ্জত বাড়বে। আর তা না হলে আরব নিজেই তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু কুরাইশরা তার এ অভিমত পছন্দ করলো না।

এরপর একটি কর্মপন্থাই শুধু বাকী রইল,যা এ পর্যায়ে এসে প্রত্যেক বাতিল শক্তিই হকের বিরুদ্ধে অবলম্বন করে থাকে। তাহলো, পূর্ণ জোর-জবরদস্তি ও নিষ্ঠুরতার সাথে হকের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস। তাই কুরাইশরা ফয়সালা করলো যে, মুসলমানরা যাতে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হয়, সেজন্যে তাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করতে হবে। তাদের যাকে যেখানে পাওয়া যাবে , সেখানেই নিপীড়ন চালাতে হবে।

তৃতীয় স্তর: ঈমানের পরীক্ষা

এই পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের কাজ যেটুকু অগ্রসর হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া তিন প্রকারে প্রকাশ পেল : ১. কিছু সৎ ও ভাল লোক এ আন্দোলনকে কবুল করলো। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলনকে যে কোন মূল্যে এগিয়ে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো।

২. অজ্ঞতা, ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা বাপ-দাদার অনুসৃত ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসহেতু বহূ লোক এ আন্দোলনের বিরোধিতার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

৩. মক্কা ও কুরাইশদের গন্ডী অতিক্রম করে এ আন্দোলন অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে নতুন এই আন্দোলন এবং পুরনো জাহিলিয়াতের মধ্যে এক কঠিন দন্দ্ব-সংঘাত শুরু হলো। যেসব লোক নিজেদের পুরনো ধর্মকে আকঁড়ে থাকতে চাইলো, তারা পূর্ণ শক্তি দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কোমর বাধঁলো। তারা নও-মুসলিমদের ওপর অমানুষিক জুলুম-নির্যাতনের স্টীম রোলার চালালো এবং তাদেরকে সর্বতোভাবে হীনবল করার জন্যে সংঘবদ্ধ হলো। বস্তত কুরাইশদের এ পর্যায়ের জুলুম-নির্যাতনের ঘটনাবলী যেমন নির্মম ও হৃদয় বিদারক, তেমনি তা শিক্ষামুলকও। আরবের মত উষ্ণ দেশে দুপুরের প্রচণ্ড রোদে জ্বলন্ত বালুকার ওপর নও-মুসলিমদের শুইয়ে দেয়া, তাদের বুকের ওপর ভারী ভারী পাথর চাপিয়ে রাখা,লোহা গরম করে শরীরে দাগ দেয়া, পানিতে চুবিয়ে রাখা, নির্দয় ভাবে মারধর করা, এবং এ ধরনের অসংখ্য নির্যাতনের স্টীম রোলার মুসলমানদের ওপর চাপানো

amarboi.org

amarboi.org

হলো। এ পর্যায়ে সাধারণভাবে সমগ্র মুসলমানের জীবনই দুর্বিষহ করা হয়েছিল;তবে ইতিহাসে যে সব মুজলমের জীবন কাহিনীর কিছুটা বিবৃত হয়েছে,তাদের মধ্যে থেকে নমুনা স্বরূপ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) : ইনি উম্মে আম্মারের গোলাম ছিলেন। সবেমাত্র ছয়-সাত ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছেন,এমনি সময় তিনি ইসলামের সুশীতল ছাঁয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই অপরাধে তিনি কুরাইশদের নির্মম জুলুমের শিকারে পরিণত হন। একদিন কুরাইশরা মাটির ওপর কয়লা জ্বালিয়ে তার ওপর খাব্বাব (রাঃ)-কে চিৎ করে শুইয়ে দিলো এবং তিনি যাতে নড়াচড়া করতে না পারেন, সেজন্যে এক ব্যক্তি তাকে পা দিয়ে সজোরে চেপে ধরলো। এমন কি, তাঁর পিঠের নীচেই জ্বলন্ত কয়লা নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কিছুদিন পর একদিন তিনি তাঁর পিঠের ওপর সাদা সাদা কতগুলো পোড়া দাগ সবাইকে দেখান।

হযরত বিলাল (রাঃ) : ইনি উমাইয়া বিন্ খালফের গোলাম ছিলেন। উমাইয়া তাঁকে দুপুরের তপ্ত বালুকার ওপর শুইয়ে দিতো এবং বুকের ওপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে বলতো : 'ইসলামকে অস্বীকার কর, নচেৎ এভাবেই ধুঁকে ধুঁকে মরে যাবি।' কিন্তু সেই নিদারুন কষ্টের মধ্যেও তাঁর মুখে শুধু 'আহাদ' শব্দ উচ্চারিত হতো। উমাইয়া তাঁর গলায় রশি বেধেঁ ছোট ছোট ছেলেদের হাতে দিতো। ওঁরা তাঁকে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে টেনে নিয়ে যেতো।

হযরত আম্মার (রাঃ) : ইনি ইয়ামেনের বাসিন্দা ছিলেন। প্রথম দিকে যে কজন সাহসী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন, ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশরা তাঁকে উত্তপ্ত জমিনের ওপর শুইয়ে এত প্রহার করতো যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

হযরত লুবাইনা (রা) : ইনি একজন বাঁদী ছিলেন। মুসলমান হবার আগে হযরত উমর(রা) একে এত মারধর করতেন যে, তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু এই খোদাভক্ত মহিলা শুধু বলতেন : 'যদি ইসলাম গ্রহন না করো তো খোদা তোমার কাছ থেকে এর বদলা গ্রহণ করবেন'।

হযরত জুনাইরাহ(রা):ইনিও হযরত উমর(রা) -এর পরিবারে বাঁদী ছিলেন। একবার আবু জেহেল তাকে এত প্রহার করে যে ,তার চোখ দুটো বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়।

মোটকথা, পুরুষ ও নারীর মধ্যে এরকম অনেক লাচার ও নিরুপায় মুসলমানকেও ইসলাম ত্যাগে সম্মত করাতে পারেনি।

এই বেকসুর ও নিরপরাধ মুসলমানের ওপর যখন জুলুম-পীড়ন চলছিল,তখন লোকেরা স্বভাবতই তাদের প্রতি কৌতুহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে লাগলো। তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলোঃএত মুসিবত সত্বেও এই লোকগুলো কিসের মোহে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে ? কোন প্রলোভনের হাতছানি এদেরকে এতখানি কষ্ট-সহিষ্ণু করে তুলেছে ? একথা সবাই জানতো যে, নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং মানবীয় গুনাবলীর দিক দিয়ে নিঃসন্দেহ এরা উত্তম মানুষ। এদের অপরাধ শুধু এই যে,এরা বলে-'আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্তার আনুগত্য এবং বন্দেগী করবে না।' অব্যাহত জুলুম-পীড়ন সত্ত্বেও নও-মুসলিমদের এহেন দৃঢ়তাব্যঞ্জক উক্তি অনেক লোকের সামনেই এক বিরাট প্রশ্ন তুলে ধরলো এবং তাদের হৃদয় মনে স্বতঃই এক প্রকার নম্রতার সৃষ্টি করলো। তারা এই নতুন আন্দোলনকে নিকট থেকে দেখবার ও বুঝবার জন্যে আগ্রহান্বিত হলো। সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়নিষ্ঠদের ওপর জুলুম-পীড়ন চিরকালই সত্যের কামিয়াবীর পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে।তাই একদিকে যেমন কুরাইশদের জুলুম-পীড়ন বেড়ে চলছিল, অন্যদিকে তেমনি ইসলামী আন্দোলনের পরিধিও সমপ্রসারিত হতে লাগলো। এমনকি গোটা পরিবার বা খান্দানের ইসলাম কবুল করেনি,মক্কায় এমন কোন খান্দান বা পরিবারই আর রইলো না। এই কারনে কুরাইশরা ইসলামের বিরুদ্ধে আরো বেশি ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা দেখতে লাগলো : তাদেরই আপন ভাই-ভাতিজা, বোন-ভগ্নিপতি, পুত্র-কন্যা, ইসলামী দাওয়াতকে কবুল করে চলেছে এবং ইসলামের খাতিরে সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্যে প্রস্তত হচ্ছে। তাদের কাছে এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসহ আঘাতের শামিল। পরন্ত মজার ব্যাপার এই যে, যারা এই নয়া আন্দোলোনে যোগদান করছিল তাদের নৈতিক চরিত্র এবং সাধারণ মানবীয় গুণাবলী সবার কাছেই সুস্পষ্ট ও সুবিদিত ছিলো। এই শ্রেণীর লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের সমস্ত পার্থিব স্বার্থ কুরবানী করতে প্রস্তুত হতে লাগলো, তখন সাধারণ লোকেরা হতবাক হয়ে ভাবলো : এই নতুন আন্দোলোন এবং এর আহবায়কের ভেতর এমন কি আকর্ষণ রয়েছে, যা লোকদেরকে এরূপ আত্মোৎসর্গের জন্যে অনুপ্রাণিত করছে!

amarboi.org

amarboi.org

তাছাড়া লোকেরা এও দেখতে লাগলো যে, ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করার পর এসব লোক অধিকতর ন্যায়ানুগ, সত্যবাদী, চরিত্রবান, এবং আচার-ব্যবহারে উত্তম ও পুত-পবিত্র মানুষে পরিণত হচ্ছে। এসব বিষয় প্রতিটি দর্শকের মনে অনির্বচনীয় এক ভাবধারার সঞ্চার করতে লাগলো এবং এর ফলে ইসলামী দাওয়াত কবুল করুক আর না-ই করুক, তার শ্রেষ্ঠত্বকে তারা কিছুতেই উপলব্ধি না করে পারলো না।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

হযরত (স)-এর নবুয়্যাতের বয়স এবার পাচঁ বছর হলো। তিনি বুঝতে পারলেন যে, কুরাইশদের জুলুম- নির্যাতন খুব শীগগীর বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। অপরদিকে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমানের অবস্থা এই দাঁড়ালো এই যে, কোন দুঃসহ পরিস্থিতিতেই তারা ইসলামের প্রতি বিমুখ হবে না বটে; কিন্তু দুঃখ-দুর্ভোগের মাত্রা তাদের সহ্য-শক্তির বাইরের চলে যাচ্ছে এবং ইসলামের প্রতি কর্তব্য (ফরয) পালন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই হযরত (স) ফয়সালা করলেন যে, কিছু মুসলমানকে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় যেতে হবে। আবিসিনিয়া আফ্রিকার পূর্ব উপকূলবর্তী একটি দেশ। এখানকার বাদশাহ্ নাজ্জাশী ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ন ও সুবিচারক খ্রিস্টান। এই হিজরতের একটি উদ্দেশ্য ছিল এই যে, অবস্থা অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত কিছু সংখ্যক মুসলমান অন্তত কুরাইশদের জোর-জুলুম থেকে রেহাই পাবে। এর আরো একটি বড় ফায়দা ছিলো এই যে, এইসব আত্মোৎসর্গকারী লোকদের সাহায্যে ইসলামের দাওয়াত দূর-দারাজ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হবার সুযোগ পাবে।

সুতরাং প্রথম দফায় এগার জন পুরুষ ও চারজন মহিলা এই হিজরতের জন্যে তৈরি হলেন। এরা পঞ্চম নববী সালের রজব মাসে যাত্রা করলেন। আল্লাহ্‌র কুদরত এই যে, এঁরা যখন বন্দরে পৌঁছলেন, তখন একটি বাণিজ্য জাহাজ প্রত্যাগমনের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়েছিল। এটি তাদেরকে খুব কম ভাড়ায় নিতে সম্মত হলো। কুরাইশরা এই হিজরতের খবর শুনে মুসলমানদের পিছন ধাওয়া করলো। কিন্তু তারা বন্দরে পৌঁছবার আগেই আল্লাহ্‌র ফজলে জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গেল।

আবিসিনিয়ায় মুসলমানরা বেশ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করতে লাগলো। এ খবর কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর (আরবরা তাকে এ নামে ডাকতো) কাছে কয়েকজন লোক পাঠাতে হবে। তারা গিয়ে মুসলমানদের সমন্ধে বলবে যে, এই লোকগুলো আমাদের দেশ থেকে পলাতক অপরাধী; এদেরকে আপনি আপনার দেশ থেকে বের করে দিন। আমরা এদেরকে সাথে নিয়ে যাবো। আব্দুল্লাহ্ বিন রাবিয়া ও আমর বিন আসকে এ কাজের জন্যে মনোনীত করা হলো। তারা অত্যন্ত জাঁক-জমকের সাথে রওয়ানা হলো। প্রথমে তারা আবিসিনিয়ার পাদ্রীদের কাছে গিয়ে বললো : 'এই লোকগুলো একটি নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করেছে। আমরা এদেরকে তাড়িয়ে দেয়ায় আপনাদের দেশে পালিয়ে এসেছে। এখন আপনাদের বাদশাহের খেদমতে আমরা এই মর্মে আবেদন পেশ করতে চাই যে, এরা আমাদের দেশ থেকে পলাতক অপরাধী; এদেরকে আমাদের হাতে প্রত্যার্পণ করুন। আমাদের এই আবেদনের সপক্ষে বাদশাহর দরবারে সুপারিশ করার জন্যে আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

নাজ্জাশীর দরবারে মুসলমান

মক্কাবাসী কুরাইশরা নাজ্জাশীর দরবারে উপরিউক্ত মর্মে আবেদন জানালে তিনি মুসলমানদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমরা কি কোনো নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছ? মুসলমানরা নিজেদের পক্ষ থেকে কথা বলবার জন্যে হযরত জাফর বিন্ আবু তালিবকে (হযরত আলীর ভ্রাতা) মনোনীত করলেন। তিনি নাজ্জাশীর দরবারে যে ভাষণ দেন, তার বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাস গ্রন্থে সংরক্ষিত রয়েছে। তার সার সংক্ষেপ এই : 'হে বাদশাহ ! আমরা কিছুকাল অঙ্গতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছিলাম। এক খোদাকে বিস্মৃত হয়ে মানুষের গড়া অসংখ্য মূর্তির পূজা করতাম। মরা জীব-জন্তুর গোশত খেতাম; ব্যভিচার, লুটতরাজ, চৌর্যবৃত্তি, পারস্পরিক জুলুম ইত্যাদি ছিলো আমাদের দৈনন্দিন কাজের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের

amarboi.org

amarboi.org

শক্তিমানরা দুবলদের শোষণ করতে গর্ববোধ করতো। মোটকথা, জীব-জন্তুর চেয়েও আমাদের জীবন-যাত্রা ছিল নিম্ন পর্যায়ের। কিন্তু আল্লাহর রহমত দেখুন, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। আমাদেরই ভেতরকার এক ব্যক্তিকে রাসূল নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন। আমরা তাঁর বংশ-খান্দানকে খুব ভাল মতো জানি; তিনি অত্যন্ত শরীফ লোক। আমরা তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থার সাথেও সম্যক পরিচিত। তিনি অতীব সত্যবাদী, আমানতদার ও সচ্চরিত্রবান। দোস্ত-দুশমন সবাই তাঁর সততা ও শরাফতের প্রশংসা করে। তিনি আমাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন এবং এই শিক্ষা দিয়েছেনঃ তোমরা মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও, এক আল্লাহকে নিজের মালিক ও মনিব বলে স্বীকার করো, ব্যভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল ক্রিয়া-কর্ম থেকে বেচেঁ থাকো, নামাজ পড় ও রোযা পালন করো।' আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, শিরক ও মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছি এবং সমস্ত অসৎ কাজ থেকে তওবা করেছি। এর ফলে আমাদের কওম আমাদের সাথে দুশমনি শুরু করেছে এবং পুনরায় তাদেরই ধর্মে ফিরে যাবার জন্যে আমাদের ওপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে। আর এজন্যই এ লোকগুলো আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে আবেদন জানাচ্ছে।'

নাজ্জাশী বললেনঃ 'বেশ তোমাদের নবীর ওপর আল্লাহর যে কালাম নাযিল হয়েছে, তার কিছু অংশ আমাকে পড়ে শোনাও'। হযরত জাফর (রা) সূরা মরিয়ম থেকে কতিপয় আয়াত পড়ে শোনালেন। নাজ্জাশী তা শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। তাঁর চোখ দিয়ে দরদর বেগে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন : 'খোদার কসম! এই কালাম আর ইঞ্জিল কিতাব একই প্রদীপের আলোকরশ্মি।' অতঃপর তিনি কুরাইশ প্রতিনিধিদের স্পষ্টত জানিয়ে দিলেন যে, তাদের হাতে মুসলমানদের সমর্পণ করা যাবে না।

নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ

পরদিন কুরাইশরা আর একটি নতুন কৌশল উদ্ভাবন করলো। তারা বাদশাহর দরবারে গিয়ে বললো : 'এই মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞেস করুন তো, এরা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কি আকিদা পোষণ করে?' কুরাইশরা জানতো যে. মুসলমানরা খ্রিস্টানদের আকিদার খেলাফ হযরত ঈসাকে 'খোদার পুত্র' এর পরিবর্তে 'মরিয়ম পুত্র বলে বিশ্বাস করে আর এই কথাটি যখন নাজ্জাশীর সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন তিনি অবশ্যই এদের প্রতি অসন্তষ্ট হবেন।

নাজ্জশী মুসলমানদের আবার দরবারে ডেকে পাঠালেন। পরিস্থিতিটা আঁচ করতে পেরে মুসলমানরাও কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু হযরত জাফর (রা) বললেন যে, 'ব্যাপার যাই হোক না কেন, আমাদের সত্য কথাই বলতে হবে।' অতঃপর তিনি ভরপুর দরবারে দাড়িঁয়ে ঘোষণা করলেনঃ 'আমাদের পয়গম্বর (স) আমাদেরকে বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল ছিলেন।' একথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি সরু ঘাস হাতে তুলে নিয়ে বললেনঃ 'খোদার কসম! তুমি যা কিছু বললে , ঈসা তার চেয়ে এই ঘাস পরিমাণও বেশি ছিলেন না।' এভাবে কুরাইশদের শেষ চালবাজিও ব্যর্থ হলো। নাজ্জাশী হযরত জাফর ও তার সঙ্গীদেরকে সম্মানের সাথে তাঁর দেশে বাস করবার অনুমতি দিলেন এবং তিনি হযরত (স) এর নবুয়্যাতকে সত্য মেনে নিয়ে ইসলাম কবুল করলেন। এই নাজ্জাশীরই নাম ছিল আসমাহা। এর ইন্তিকাল হলে হযরত (স) এঁর গায়বানা জানাযা আদায় করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে ৮৩ জন মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

হযরত হামযা (র)-র ইসলাম গ্রহণ

মক্কায় একদিকে কুরাইশদের জুলুম-পীড়ন তীব্রতর হচ্ছিল, অন্যদিকে হযরত (স) এবং তার সঙ্গী-সাথীগণ ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগলেন। এই সংঘাতের মধ্যে মক্কার উত্তম ব্যক্তিগণ একে একে ইসলামী সংগঠনে শামিল হতে লাগলেন। হযরত হামযা হযরত (স)-এর পিতৃব্য ছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি ইসলাম কবুল করেননি। হযরত (স)-এর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর সঙ্গে যেরুপ নির্দয় ব্যবহার করছিলো, তা আপনজন তো দুরের কথা, কোনো অনাত্মীয় লোকও সহ্য করতে পারে না। একদিন আবু জেহেল হযরত (স)-এর সঙ্গে অত্যন্ত অবমাননাকর আচরণ করলো। হযরত হামযা তখন শিকারে গিয়েছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে জনৈক ক্রীতদাসী তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলো। তিনি ক্রোধে ধৈর্যচ্যুত হলেন এবং তীর-ধনুকসহ সোজা কাবা গৃহে গিয়ে আবু জেহেলকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করলেন। এমন কি, সেখানেই তিনি ঘোষণা করলেনঃ 'আমিও ইসলাম কবুল করলাম।'

amarboi.org

amarboi.org

হযরত (স)-এর প্রতি সহানুভূতির আবেগে মুখে তো ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন; কিন্তু মন তার তখনো বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে তৈরি হয়নি। সমস্ত দিন তিনি ভাবতে লাগলেন। অবশেষে সত্যের আবেদনই বিজয়ী হলো। তিনি মনে-প্রাণে ইসলামের প্রতি ঈমান আনলেন। এ ঘটনাটি ঘটে নবুয়্যতের পঞ্চম বছরে। এর মাত্র কদিন পরেই হযরত উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এ ঘটনাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের কঠোরতম দুশমনদের অন্যতম। কুরাইশরা একদিকে ইসলামী আন্দোলন ও তাঁর আহবায়কের বিরোধিতায় চরমপন্থা অবলম্বন করতে লাগলো, অন্যদিকে এদের সঠিক পথ নির্দেশনার জন্যে হযরত (স)-এর হৃদয়-মন প্রেমের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। আবু জেহেল এবং উমর উভয়েই তাঁর দুশমনীতে অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। দাওয়াত ও তাবলীগের কোনো প্রচেষ্টাই তাদের উপর কার্যকর হচ্ছিল না। তাই একদিন রাহমাতুল্লিল আলামীন সরাসরি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন : 'প্রভূ হে! আবু জেহেল এবং উমর এ দু'জনের মধ্যে যে তোমার কাছে বেশি প্রিয়, তাকে তুমি ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করো। এ দোয়ার কয়েকদিন পরই হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার তওফীক লাভ করেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরুপ :

খোদ হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, 'একদা রাত্রে আমি হযরত (স)-কে উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলাম। তখন তিনি কাবার মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি ত্রস্তপায়ে এগিয়ে গিয়ে নামাজ শুরু করলেন। আমি তা শুনবার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি সূরা আল-হাক্কাহ থেকে কিরআত পড়ছিলেন। আমি সে কালাম শুনে বিস্ময়ে মুগ্ধ হলাম। তার কবিত্বময় ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী মনে হলো। আমি মনে মনে ভাবলাম : খোদার কসম! লোকটি নিশ্চয়ই কবি। ঠিক এ মুহূর্তেই তিনি এ আয়াত পড়লেন :

{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ{40} وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ{41

অর্থ : এ এক সম্মানিত বার্তাবাহকের কালাম, এ কোনো কবির বাণী নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে খুব কম লোকই ঈমান এনে থাকে। (আয়াতঃ ৪০-৪১)

একথা শোনামাত্রই আমার ধারণা : 'ওহো, লোকটি তো আমার মনের কথা জেনে ফেলেছে। এ নিশ্চয়ই কোনো গণক হবে।' এরপরই মুহাম্মদ (স)-এ আয়াত পাঠ করলেন :

{وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ{42} تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ{43

অর্থঃ এ কোনো গণকের কালাম নয়; তোমরা খুব কমই নসিহত পেয়ে থাকো। এতো রাব্বুল 'আলামীনের কাছ থেকে নাযিল হয়েছে। (আয়াতঃ ৪২-৪৩)

তিনি এ সূরা শেষ পর্যন্ত পড়লেন। আমি অনুভব করলাম, ইসলাম আমার হৃদয়ে তার আসন করে নিচ্ছে।'

কিন্তু যতদূর মনে হয়, হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির ও দৃঢ় চিত্ত লোক ছিলেন। এজন্যে এবারই তাঁর ভেতরকার পরিবর্তনটা পূর্ণ হলো না। তিনি তাঁর চিরাচরিত পথেই চলতে লাগলেন। এমনকি, একদিন তিনি দুশমনীর তাড়নায় উত্তেজিত হয়ে হযরত (স)-কে হত্যা (নাঊযুবিল্লাহ) করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। পথিমধ্যে নয়ীম বিন আব্দুল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছ ওমর?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করতে যাচ্ছি।' নয়ীম বললো, 'আগে তোমার নিজের ঘরেরই খবর নিয়ে দেখো। তোমার নিজের বোন-ভগ্নিপতিই তো ইসলাম গ্রহণ করেছে।' একথা শুনে ওমর মোড় ফিরলেন এবং সোজা বোনের বাড়ীতে গিয়ে হাযির হলেন। তাঁর বোন-ভগ্নিপতি উভয়েই তখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। ওমরকে আসতে দেখেই তাঁরা চুপ করে গেলেন এবং কুরআনের

amarboi.org

amarboi.org

অংশটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তারা যে কিছু পড়ছেন, তা ওমর টের পেয়েছিলেনল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী পড়ছিলে? তোমরা নাকি বাপ-দাদার ধর্মকে ত্যাগ করেছ? একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীর সাহায্যের জন্যে বোন এগিয়ে এলে তাঁকেও তিনি মারতে লাগলেন। এমনকি উভয়ে রক্তাপ্লুত হয়ে গেলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, : 'আমরা সজ্ঞানে ইসলাম কবুল করেছি; সুতরাং তোমার কোনো কঠোরতাই আমাদেরকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।' তাদের এই অটল সংকল্প দেখে হযরত ওমর (রাঃ) কিছুটা প্রভাবিত হলেন। তিনি বললেন,' আচ্ছা তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে শোনাও দেখি।'

বোন ফাতিমা কুরআনের অংশটি এনে সামনে রাখলেন। সেটি ছিলো সূরা তা-হা। তিনি পড়তে শুরু করলেন এবং এই আয়াত পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন :

{إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}14

'আমিই খোদা, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; সুতরাং আমারই বন্দেগি করো এবং আমায় স্মরণের জন্যে নামায পড়ো।' এ পর্যন্ত আসতেই তিনি এতটা প্রভাবিত হলেন যে, হঠাৎ সজোরে বলে উঠলেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ। এরপর তিনি সেখান থেকে সোজা হযরত (স)-এর খেদমতে রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত (স) সাহাবী আরকামের গৃহে অবস্থান করছিলেন। ওমর দরজার কাছে পৌঁছলে তাঁর হাতে তরবারি দেখে উপস্থিত সাহাবীগণ ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু হযরত হামযা (রাঃ) বললেন, 'আসুক না, তার নিয়্যত যদি ভাল হয় তো ভাল কথা। নচেৎ তার তরবারি দ্বরাই তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো।' ওমর ঘরের মধ্যে পা বাড়াতেই হযরত (স) এগিয়ে এসে তাকে সজোরে আকঁড়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন :'কি ওমর, কি উদ্দেশ্যে এসেছ?' একথা শুনেই যেন ওমর ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি অত্যন- বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন, 'ঈমান আনার উদ্দেশ্যে।' হযরত (স) স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবার' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহাবী তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী সংগঠনের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো। এতদিন মুসলমানরা প্রকাশ্যে ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে পারছিল না; কাবা গৃহে জামাআতের সাথে নামায পড়াও ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটলো। তিনি নিজেই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। এ ব্যাপারে অনেক হাঙ্গামা হলো বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা কা'বা মসজিদে জা'মায়াতের সাথে নামায আদায় করার সুযোগ লাভ করলো; তাদের সংগঠনও আগের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হলো। পরন্ত আল্লাহর দরবারে আখিরী নবী (স)-এর দো'আ কতোখানি মঞ্জুর হয়েছিল, তাও বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করতে পারলো। দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আজ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ওমর (রাঃ)-এর দ্বারা ইসলামকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন, তার দ্বিতীয় কোনো নজীর নেই।

সামাজিক বয়কট গিরি-দুর্গে বন্দী

ইসলামী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি দেখে কুরাইশ সর্দারগণ ক্রমাগত তেলে-বেগুনে জ্বলতে লাগলো। তারা এ আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার জন্যে নিত্য নতুন ফন্দি আঁটলো। তারা সমস্ত গোত্রকে একত্র করে এই মর্মে একটা চুক্তি সম্পাদন করলো যে, যতক্ষন পর্যন্ত মুহাম্মদ (স) কে হত্যা করার জন্যে তাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে, ততক্ষণ কেউ তার খান্দান বনী হাশিমের সংস্পর্শে যাবে না, কেউ তাদের সাথে বেচাকেনা করবে না, কেউ তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না এবং কেউ তাদেরকে খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করবে না। এই চুক্তি লিখে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হলো।

amarboi.org

amarboi.org

এবার বনী হাসিমের সামনে মাত্র দুটি পথই খোলা রইলো : হয় হযরত (স)-কে কাফিরদের হাতে সমর্পণ করে দিতে হবে, নচেৎ এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের ফলে উদ্ভূত দুঃখ-মুসিবত বরদাশত করার জন্যে তৈরি হতে হবে। আবু তালিব বাধ্য হয়ে এই শেষোক্ত পন্থাটিই বেছে নিলেন এবং বনু হাসিমের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত খান্দান নিয়ে 'শে'বে আবু তালিব' নামক একটি গিরি-দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। জায়গাটি উত্তারাধিকার সূত্রে বনী হাসিমের মালিকানাভুক্ত ছিলো। এ গিরি-দুর্গের মধ্যে হযরত (স)-এর সাথে তাঁদের দীর্ঘ তিন বছরকাল অশেষ দুর্গতির মধ্যে জীবন কাটাতে হলো। এ সময়ে কখনো কখনো তাঁদের গাছের পাতা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হতো॥ এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় শুকনো চামড়া পর্যন্ত সিদ্ধ করে খেতে হতো। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যখন ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করতো, তখন জালিমরা তা শুনে পৈশাচিক আনন্দ প্রকাশ করতো। কখনো কোনো হৃদয়বান ব্যক্তির মনে করুনার উদ্রেক হলে হয়তো লুকিয়ে তিনি কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতেন।

এভাবে ক্রমাগত তিন বছরকাল বনী হাসিম গোত্র ধৈর্যের অগ্নি-পরীক্ষা প্রদান করলো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জালিমদের হৃদয়েই করুণার সঞ্চার করলেন। একের পর এক কুরাইশদের মন নম্র হতে লাগলো এবং তাদের তরফ থেকেই চুক্তি ভঙ্গের আন্দোলন শুরু হলো। আবু জেহেল ও তার মতালম্বী কিছু লোক অবশ্য বেঁকে বসলো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের চক্রান্ত- আর সফলকাম হলো না। প্রায় দশম নববী সালে হাসিম গোত্র গিরি-দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো।

আন্দোলনের বিস্তৃতি

আগেই বলা হয়েছে যে, ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থগুলোতে মক্কী পর্যায়ের সংগ্রামের বিবরণ খুব কমই উল্লেখিত হয়েছে। তাই এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের মধ্যে দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজ কিভাবে চালু ছিল এবং তা কতোটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, এ সম্পর্কে কোনো বিস্তৃত বিবরণই পাওয়া যায় না। অবশ্য কুরআন শরীফ যথারীতিই নাযিল হতে থাকে। এ সময় যে সমস- সূরা নাযিল হয়, তার বিষয়বস্তু, নির্দেশাবলী ও শিক্ষাগুলো সামনে রাখলে এ পর্যায়ে আন্দোলনকে কোন্ কোন্ অবস্থার ভেতর দিয়ো এগোতে হয়েছে, তা অনেকটাই অনুমান করা যায়।

এই দীর্ঘ ও কঠিন সংঘাতকালে আল্লাহ তা'য়ালা যেসব কালাম নাযিল করেন, সে সবের বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত আবেগময় এবং প্রভাবশালী। এতে ঈমানদারগণকে তাদের কর্তব্য-কর্ম বাতলে দেয়া হয় এবং তার উপর অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়; তাদের ব্যক্তি চরিত্রকে উচ্চ থেকে উচ্চতর মানে উন্নীত করার পদ্ধতি বলে দেয়া হয়; তাকওয়া ও পরহেজগারী রপ্ত করা এবং অধিক পরিমানে এ গুণটি অর্জন করার ওপর জোর দেয়া হয়; নৈতিক চরিত্রের সমুন্নতি এবং আদত-অভ্যাস সংশোধনের জন্যে তাগিদ দেয়া হয়। লোকদের মধ্যে সংগঠনী চেতনা উজ্জীবিত করে সমষ্টিগত চরিত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; দ্বীন ইসলাম প্রচারে সঠিক পন্থা বাতলে দেয়া হয় এবং কঠিন ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ করার জন্যে তাকিদ দেয়া হয়; সাফল্যের ওয়াদা এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে লোকদের মনোবল বৃদ্ধি করা হয়; দ্বীন ইসলামের বন্ধুর পথে অবিচল থাকা এবং হিম্মতের সঙ্গে আল্লাহর পথে অব্যাহত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়; সর্বোপরি লোকেরা যাতে দুঃখ-মসিবত ও নির্মমতা বরদাশত করতে সমর্থ হয়, সেজন্য তাদের মধ্যে আত্নত্যাগ ও আত্নোৎসর্গের উদ্দীপনার সঞ্চার করা হয়। পক্ষান্তরে বিরুদ্ধবাদী অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিরুপ লোকদেরকেও তাদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কেও বারবার সতর্ক করে দেয়া হয়। এ ধরণের গাফিলতি অবিশ্বাসের কারণে ইতঃপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের শিক্ষামূলক ঘটনাগুলো এদেরকে বারবার শুনানো হয়। (এ সমস্ত ঘটনার কথা খোদ আরবরাও কম-বেশি অবহিত ছিল।) যে বিরাট জনপদের ওপর দিয়ে তারা দিনরাত যাতায়াত করতো, সেগুলির ধ্বংসাবশেষের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরন্ত তারা জমিন ও আসমানে দিনরাত যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছিলো, সেগুলির সাহায্যে তাওহিদ ও আখেরাতের দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়; শেরকের অনিষ্টকারিতা ও ভয়াবহ পরিণতি সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করা হয়; খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্নক ভুমিকা গ্রহণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়। আখিরাতের প্রতি অবিস্বাসের ফলে জীবনে যে বিকৃতি ও বিপর্যয় দেখা দেয়, সে সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়। বাপ-দাদার অন্ধ অনুসৃতির ফলে মানবতার যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয় , তার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়। আর এসব কথা এমন অকাট্য-দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে বিবৃত করা হয় যে, একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই তা মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

পরন্ত বিরুদ্ধবাদী ও অবিশ্বাসীদের উত্থাপিত আপত্তিগুলোও যুক্তিসহ জবাব দান করা হয়। তারা যেসব সন্দেহ পেশ করতো, তারও নিরসন করা হয়। মোটকথা, যেসব বিভ্রান্তিতে তারা নিজেরা নিমজ্জিত ছিলো যা দ্বারা অন্যকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা

amarboi.org

amarboi.org

করতো, তার সবই দূরীভুত করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই গোটা সময়ে তাদের বিরুদ্ধতা ও বৈরুতা এতটুকু হ্রাস পায়নি, বরং তা ক্রমাগত বেড়েই চলছিলো।

চতুর্থ স্তরঃ জুলুম ও নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা

হযরত (স) এবং তার সঙ্গী-সাথীগণ শে'ব গিরি-দুর্গ থেকে কেবল বেরিয়ে এসেছেন এবং কুরাইশদের জুলুম-পীড়ণ থেকে সাময়িকভাবে কিছুটা অব্যাহতি পেয়েছেন। এর মাত্র ক'দিন পরই তার চাচা আবু তালিব মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এর কিছুদিন পর হযরত খাদিজা (রাঃ)ও পরলোক গমন করলেন। এই বছরটিকে হযরত (স) 'শোকের বছর' বলে অভিহিত করতেন। এই দুই ব্যক্তিত্বের তিরোধানের পর কুরাইশদের বিরুদ্ধতা ও জুলুম-পীড়নের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। এ যুগটি ছিল ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন যুগ।এরপর থেকে কুরাইশরা মুসলমান ও হযরত (স)-এর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে উৎপীড়ন চালাতে শুরু করলো।

মক্কার বাইরে তাবলীগ

মক্কাবাসীদের মধ্যে যাঁরা উত্তম লোক ছিলেন, তাঁরা একে একে প্রায় সকলেই ইসলামী সংগঠনে যোগদান করলেন। তাই হযরত (স) এবার মক্কার বাইরে গিয়ে আল্লাহর বাণী প্রচার করার ফয়সালা করলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথমে তিনি তায়েফ গমন করলেন। তায়েফে ছিলো বড়ো বড়ো বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকদের বাস। হযবত (স) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এইসব বড়ো লোকদের কাছে হাযির হলেন। কিন্তু দৌলত ও ক্ষমতা যেমন প্রয়শই সত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, এখানেই ঠিক তাই হলো। হযরত (স)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে জনৈক তায়েফ সর্দার বিদ্রুপ করে বললো : 'খোদা কি তাঁর রাসূল বানাবার জন্যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাননি?' অপর একজন বললো :'আমি তো তোমার সঙ্গে কথাই বলতে পারি না। কারণ তুমি যদি সত্যবাদী হও তো তোমার সঙ্গে কথা বলা আদবের খেলাফ। আর মিথ্যবাদী (নাউযুবিল্লাহ) হলে তো তুমি মুখ লাগানোরই যোগ্য নও।'

মোটকথা, এই বড়ো লোকেরা হযরত (স)-এর কথাকে এমনি হেসে উড়িয়ে দেয়। শুধু তাই-ই নয়, তারা শহরের গুন্ডা-বদমায়েশদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে পথে-প্রান্তরে সর্বত্র ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এবং তাঁর প্রতি অবিরাম পাথর নিক্ষেপ করে। এর ফলে তিনি অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত হন; তার পবিত্র দেহ থেকে অনর্গল রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং তাতে তার পাদুকাদ্বয় পূর্ণ হয়ে যায়। তবুও জালিমরা অবিরাম তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ ও গালি-গালাজ বর্ষণ করতে থাকে। এমনকি, তিনি একটি বাগানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

কোনো বিরোধী শহরে এভাবে একাকী গিয়ে তাবলীগের দায়িত্ব পালন করা এবং জীবন বিপন্ন করে খোদার বান্দাদের কাছে খোদার বাণী পৌঁছানো কতোখানি হিম্মত ও নির্ভীকতার পরিচায়ক, তা আন্দাজ করা মোটেই কষ্টকর নয়। খোদার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান ও তার ওপর চূড়ান্ত নির্ভরতার এ যেমন এক মহোত্তম উদাহরণ, তেমনি পরবর্তীকালের লোকদের জন্যেও এ এক অনুকরণীয় আদর্শ।

হযরত (স)-এর একটি নিয়ম ছিলো এই যে, প্রতি বছর হজ্জ উপলক্ষে যখন সারা দেশ থেকে নানান গোত্রের লোকেরা মক্কায় আগমন করতো, তখন তিনি প্রত্যেক গোত্রের কাছে গিয়ে লোকদেরকে ইসলামের আহবান জানাতেন। অনুরুপভাবে আরবের বিভিন্ন স্থানে যেসব মেলা বসতো, তাতেও তিনি যোগদান করতেন এবং এই জনসমাগমের সুযোগে লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। এই সব ক্ষেত্রে প্রায়শই কুরাইশ সর্দারগণ (বিশেষত আবু লাহাব) তার পেছন ধরতো এবং তিনি যেসব সমাবেশে বক্তৃতা করতেন, সেখানে গিয়ে লোকদের বলতো : 'দেখ, এর কথা তোমরা শুনো না; এ আমারে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং লোকদের কাছে মিথ্যা কথা বলে।' এসব ক্ষেত্রে হযরত (স) লোকদেরকে কুরআন পাকের এমন সব অংশ শোনাতেন, প্রভাব বিস্তারের দিক দিয়ে যা শাণিত তীরের ন্যায় কাজ করতো। কুরআনের এসব অংশ শুনে অধিকাংশ লোকের হৃদয়ে ইসলামের জন্যে আসন তৈরি হয়ে যেতো। মোটকথা, হযরত (স)-এর এইসব তাবলীগী সফর প্রভাব ও পরিণতির দিক দিয়ে অত্যন্ত সফলকাম বলে প্রমণিত হলো। এখন আর আরবে ইসলামী আন্দোলন কোনো অভিনব বস্তর পর্যায়ে রইলো না; বরং দূর-দূরাঞ্চল পর্যন্ত তার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করলো। আর যারা ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গী হবার জন্যে আগেই মনস্ত করেছিলেন, তারাও নিজ নিজ এরাকায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করে দিলেন।

amarboi.org

amarboi.org

জ্বিনদের প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে জ্বিনও একটি বিশেষ সৃষ্টি। মানুষের ন্যায় জ্বিনদেরও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা আছে। এই কারণে তাদের প্রতিও খোদার দেয়া বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য। তওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ এবং এক আল্লাহর তা'আলার হুকুম-আহকামের আনুগত্য করা তাদের জন্যেও বাধ্যতামূলক। আর এ কারণে তাদের মধ্যেও ভাল-মন্দ দুটি শ্রেণী আছে।

জ্বিনদের অস্বিত্ব সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে মানব সমাজে আজগুবি ধারণা চলে আসছে। আরবেও জ্বিনদের সম্পর্কে একটি বিশেষ মতবাদ গড়ে উঠেছিলো। মূর্খ লোকেরা তাদের পূজা করতো, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো। সাধারণ ওঝা শ্রেণীর লোকেরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের দাবি করতো। নানারূপ কিসসা-কাহিনী তাদের সম্পর্কে প্রচলিত ছিলো। মোটকথা, অসংখ্য দেব-দেবীর ন্যায় জ্বিনদেরকেও খোদায়ীর ব্যাপারে শরীকদার মনে করা হতো। ইসলাম এসে এসব আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন করে দিলো। সে বললো : জ্বিন খোদার একটি সৃষ্টি বটে; কিন্তু খোদায়ীর ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্রও দখল নেই। সে আপন ক্ষমতাবলে না পারে কারো উপকার করতে আর না পারে কারো ক্ষতি করতে। মানুষের ন্যায় জ্বিনদের প্রতিও আল্লাহর বন্দেগী ফরয করা হয়েছে। তাদের মধ্যেও খোদার অনুগত ও অবাধ্য-এ দুটি শ্রেণী রয়েছে। তারাও মানুষের ন্যায় নিজ নিজ আমলের পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে। খোদার কুদরতের সামনে তারাও একটি অক্ষম ও অসহায় জীবমাত্র।

হযরত (স)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন পরিপূর্ণ ও সর্বশেষ রূপ নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে। এ দ্বীনের আনুগত্য যেমন মানুষের জন্যে, তেমনি জ্বিনের জন্যেও বাধ্যতামূলক ছিলো। একদা হযরত (স) এক তাবলীগী সফর উপলক্ষে 'উকাজ' নামক আরবের এক বিখ্যাত মেলায় গমন করছিলেন। পথে 'নাখলা' নামক স্থানে তাঁকে একটি রাত অবস্থান করতে হলো। ঘটনাক্রমে এমনি সময় জ্বিনদের একটি দল ঐদিক দিয়ে যাচ্ছিলো। তারা হযরত (স)-এর কিরআত শুনে থমকে দাঁড়ালো। এ ঘটনা কুরআনের সূরা আহকাফ-এ এভাবে বিবৃত হয়েছে : হে নবী! আমরা জ্বিনদের একটি দলের গতি তোমার দিকে ফিরিয়ে দিই, যেন তারা কুরআন শুনতে পায়। তারা এসে পরস্পরকে বললো :'চুপ থাক।' কুরআন পাঠ শেষ হলে তারা গিয়ে আপন জাতিকে সতর্ক করে বললো : 'ভাই সব! আমরা একটি কিতাব শুনে এসেছি, যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, যা সত্যের দিকে পরিচালিত করে এবং সোজা পথ প্রদর্শন করে। ভাইসব! আল্লাহর দিকে আহবানকারীদের কথা মানো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো, যেন তিনি তোমাদের গুনাসমূহ মাফ করে দেন এবং কঠিন ও যন্ত্রনাদায়ক আযাব থেকে তোমাদের নিস্কৃতি দান করেন। (আয়াতঃ২৯-৩১)। এ ঘটনার কথা হযরত (স) ওহীর মারফতে জানতে পারেন। সূরা জ্বিনে এর বিস্তৃত বিবরণও উল্লেখ আছে।

মদিনায় ইসলামের আগমন

ইসলামের আওয়াজ যেমন আরবের বিভিন্ন দূর-দারাজ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছলো, তেমনি সে আওয়াজ মদিনায় গিয়েও উপনীত হলো॥ মদিনায় তখন বেশ কিছু ইহুদী জনবসতি ছিলো। তারা বহু প্রাচীনকাল থেকে সেখানে এসে বাস করতো। তারা মদিনার আশেপাশে ছোট ছোট দুর্গ বানিয়ে নিয়েছিলো। এ ছাড়াও সেখানে ছিলো বড় বড় দু'টি অ-ইহুদী গোত্র।

একদা আওস ও খাযরাজ নামে মদিনায় দুই ভাই ছিলো। এদের আদি নিবাস ছিলো ইয়ামেন; কিন্তু কোনো এক সময় এরা মদিনায় এসে বসবাস শুরু করে। এদেরই সন্তান-সন্ততি থেকে সেখানে 'আওস' ও 'খাজরাজ' নামে দু'টি বড় বড় খান্দান গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এরাই 'আনসার' উপাধিতে ভূষিত হয়। এরা মদিনা এবং তার আশপাশে অনেক ছোট ছোট দুর্গ তৈরি করে রেখেছিলো। ধর্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়ে এরাও মূর্তিপূজক ছিলো বটে, কিন্তু ইহুদীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ওহী, নবুয়্যত, আসমানী কিতাব এবং আখিরাত সম্পর্কিত আকিদা-বিস্বাসের সঙ্গেও অনেকটা পরিচিত ছিলো। কিন্তু এদের নিজেদের কাছেই যেহেতু এ ধরণের কোনো জিনিস বর্তমান ছিলো না, সে জন্যে ধর্মীয় ব্যাপারে এরা ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। তাদের কথার ওপর এরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতো। এরা ইহুদী আলেমদের কাছ থেকে এ-ও জানতে পেরেছিলো যে, দুনিয়ায় আরো একজন পয়গম্বর আসবেন। যারা তার অনুগমন করবে, তারাই সফলকাম হবে। পরন্ত এই পয়গম্বরের অনুবর্তীরাই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতেই মদিনাবাসী নবী করীম (স) এবং তার আন্দোলনের প্রতি উৎসুক হয়ে উঠেছিলো। আগেই বলা হয়েছে যে, হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগত গোত্র প্রধানদের কাছে গমন করা এবং তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হবার আহবান জানানো হযরত (স)-এর একটি নিয়ম ছিলো। দশম

amarboi.org

amarboi.org

নববী সালের কোনো এক সময়ে হযরত (স) মক্কার অদূরবর্তী 'আকাবা' নামক স্থানে খাজরাজ বংশের কতিপয় লোকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং তাদেরকে কুরআন মজীদের কিছু আয়াত পড়ে শোনান। সে কালাম শুনে তারা অত্যন্ত প্রভাবিত হলো এবং বুঝতে পারলো : ইহুদী আলেমরা যে নবী আসার কথা বলেন, ইনিই সেই নবী। তারা একে অপরের দিকে চেয়ে বললো : 'না জানি এই নবীর ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে ইহুদিরা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবটুকু অর্জন করে বসে।' একথা বলেই তারা ইসলাম কবুল করলো। এদের দলে মোট ছয়জন সদস্য ছিলো। এভাবে মদিনার আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা হলো এবং যে জনপদটি উত্তরকালে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিলো, তাতে ইসলামের রোশনি প্রবেশ করলো।

বিরোধিতার তীব্রতা

যে কোনো আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতও স্বভাবত বাড়তে থাকে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে বিরোধিতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যে প্রচন্ডতা দেখা দেয়, তা তার অনুগামীদেরকে অধিকতর কঠিনতর পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে। দশম নববী সাল নাগাদ ইসলামী আন্দোলন যেমন ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করছিল, তেমনি সত্যের আহবায়ক এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছিলো। কুরাইশ প্রধানগণ চূড়ান্ত ভাবে স্থির করলো যে, তারা খোদ হযরত (স)-এর ওপর এতোটা উৎপীড়ন চালাবে, যাতে তিনি নিজেই বাধ্য হয়ে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত হন। কুরাইশদের বড়ো বড়ো সর্দারগণ ছিলো তাঁর প্রতিবেশী এবং এরাই ছিলো তার সবচেয়ে বড় দুশমন। এরা হযরত (স)-এর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো, নামায পড়ার সময় হাসি-ঠাট্টা করতো। তিনি সিজদায় থাকলে তাঁর ঘাড়ের ওপর নাড়িভুঁড়ি এনে ফেলতো এবং গলায় চাদর জড়িয়ে এমন নির্দয়ভাবে টানতো যে, তাঁর পবিত্র গর্দানে দাগ পড়ে যেতো। তার পেছনে দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে হাততালি দিতো। কোথাও কখনো তিনি বক্তৃতা দান করলে সভার মাঝখানে তারা গোলযোগের সৃষ্টি করতো এবং বলতো, এ সবই মিথ্যা কথা। মোটকথা, হয়রানি ও উৎপীড়নের যতো ন্যক্কারজনক পন্থা ছিলো, তা সবই তারা অবলম্বন করেছিলো।

এ পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তার নবীর প্রতি যে সব ওহী নাযিল করেছিলেন, তাতে এ সব অবস্থার মুকাবেলার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বর্তমান ছিল। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসেনাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হলোঃ বর্তমানে সত্যের ওপর দৃশ্যত যে জুলুমের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, তাকে কোন স্থায়ী ব্যাপার মনে করা উচিত নয়। দুনিয়ার জীবনের এ ধরনের তামাসা বারবারই ঘটে আসছে। তাছাড়া সফলতার আসর ক্ষেত্র এ দুনিয়ার জীবন নয় বরং পরকালীন জীবন। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে ,যারা তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে, পরকাল তাদের জন্যেই উত্তম।

রাসূলে আকরাম কে উদ্দেশ্য করে বলা হলোঃআমি জানি তোমার সাথে যা কিছু করা হচ্ছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু এই সব লোক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে শুধু তোমারই নয়, বরং আমারই প্রতি অসত্য আরোপ করছে। আর এটা কোন নতুন কথা নয়, এর আগেও আমার নবী-রাসূলদের সাথে এরুপ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তারা ধৈর্য ও সবরের সাথে এই পরিস্থিতি মুকাবেলা করেছেন এবং আমার সাহায্য না পৌঁছা পর্যন্ত সর্ববিধ দুঃখ-মসিবতকে হাসিমুখে সহ্য করেছেন। তুমিও এমনি পরিস্থিতি অতিক্রম করছো এবং এরুপ পরিস্থিতিই অতিক্রম করতে হবে।

সাহাবায়ে কেরামকে বারবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, যাকে বদলে দেয়ার সাধ্য কারো নেই।সে নিয়ম অনুসারে হকপন্থীদের কে এক সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী যাচাই করা এবং তাদের ধৈর্য, সততা, আত্মত্যাগ, আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ঈমানী দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া একান্ত অপরিহার্য। সেই সঙ্গে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং তার প্রতি ঈমানের ব্যাপারে তারা কতখানি মজবুত,তা-ও নিরুপণ করা প্রয়োজন। কারণ, এইরুপ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মাধ্যমে তাদের মধ্যে এমন সব গুণাবলীর সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীকালে আল্লাহর দ্বীনের খাঁটি অনুবর্তী হবার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে। আর লোকেরা যখন এরুপ পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য প্রতিপন্ন হয়, কেবল তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে হাজির হয়। এর আগে কখনো তা আসতে পারে না।

amarboi.org

amarboi.org

আকাবার প্রথম শপথ

পরবর্তী বছর মদিনার বারোজন অধিবাসী আকাবা নামক স্থানে হযরত(সা:)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। তারা হযরত(সা:)-এর হাতে হাত দিয়ে ছ'টি মৌল বিষয়ে আনুগত্যের শপথ(বাইয়াত) গ্রহণ করলো। হযরত(সা:) মাসয়াব বিন উমাইর(রা:)-কে তাদের সাথে মদিনায় প্রেরণ করলেন। তিনি মদিনার ঘরে ঘরে গিয়ে লোকদের কে কুরআন পড়ে শোনাতেন এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন।এভাবে দু'একজন করে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। ক্রমান্বয়ে মদিনার বাইরেও ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আওস গোত্রের প্রধান হযরত সা'দ বিন মা'আজও হযরত মাসয়াবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার ইসলাম গ্রহণ ছিল গোটা আওস গোত্রেরই ইসলাম গ্রহণের শামিল।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

এর পরবর্তী বছর হজ্ব উপলক্ষ্যে মদীনা থেকে বাহাত্তর জন অধিবাসী মক্কায় এল। তারা অন্য সঙ্গীদের থেকে লুকিয়ে আকাবা গিয়ে হযরত (স) এর হাতে ইসলাম কবুল করলেন এবং যেকোন অবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। হযরত (স) এর এই দলটির মধ্য থেকে বার ব্যাক্তিকে বেছে নিয়ে নকিব (নেতা) নিযুক্ত করলেন। এদের মধ্যে নয়জন ছিল খাযরাজ গোত্রের এবং বাকি তিনজন আওস গোত্রের। হযরত (স) পূর্বোক্তদের মতো এদের কাছ থেকে ও নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞাসমূহ গ্রহণ করলেনঃ

১. এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবো না।
২. চৌর্যবৃত্তির প্রশ্রয় দেবো না।
৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হবো না।
৪. আপন সন্তানদের হত্যা করবো না।
৫. কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবো না।
৬. রাসূলুল্লাহ (স) দেয়া সুকৃতির আদেশ কখনও অমান্য করবোনা।

শপথের পর হযরত (স) বললেন, 'যদি তোমরা এই শর্তগুলি পালন করো, তাহলে তোমাদের জন্যে বেহেশতের সুসংবাদ। নচেত তোমাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ খোদার হাতে নিবদ্ধ। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের মাফ করেও দিতে পারেন অথবা শাস্তি দানও করতে পারেন।'

এ লোকগুলো যখন শপথ করছিলেন, তখন সাদ বিন জারারাহ দাড়িয়ে বললেনঃ ''ভাই সব! তোমরা কি জানো, কি কথার উপর তোমরা শপথ গ্রহণ করছো? জেনে রাখো, এ হচ্ছে গোটা আরব ও আযমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। সকলে সমস্বরে বলল, হ্যাঁ, আমারা সবকিছু সবকিছু বুঝে শুনেই শপথ করছি। প্রতিনিধি দলের আরো কয়েকজন সদস্য এধরনের জোরালো বক্তৃতা প্রদান করেন। ঠিক এ সময়ে মদীনার এই সব নওমুসলিম এবং হযরত (স) এর মধ্যে স্থিরিকৃত হয় যে, কোনো সময় যদি হযরত (স) মদীনায় গমন করেন তো মদীনা বাসী সর্বতভাবে তার সাহায্য সহযোগীতা করবে। এসময় বারাআ (রা) বলেন যে, আমরা তরবারীর কোলে লালিত হচ্ছি।

amarboi.org

amarboi.org

মু’জিযা ও মি’রাজ

মু’জিযা কথাটির সাধারণ অর্থ কোন অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু দ্বীন ইসলামের পরিভাষায় মু’জিযা হচ্ছে এক প্রকারের চূড়ান্ত দলীল। কোন পয়গম্বরের নবুয়্যাত প্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ তাআলা চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসাবে বিশ্ববাসীর সামনে এই দলিল কে উপস্থাপন করেন। অবশ্য তার জন্যে শর্ত এই যে, দলিলের বিষয়বস্তুকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরুপ বলা যায়ঃ আগুনের কাজ হচ্ছে দাহ করা, কিন্তু এ ক্ষেত্রে দাহ করবে না;সমুদ্রের ধর্ম হচ্ছে প্রবাহিত হওয়া, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রবাহ থেমে যাবে;বৃক্ষের স্বভাব হচ্ছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা, কিন্তু এক্ষেত্রে সে চলমান হবে। অনুরুপভাবে মৃত জীবিত হয়ে উঠবে , লাঠি সাপে পরিণত হবে ইত্যাদি। যেহেতু দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজের আসল কারন হচ্ছে আল্লাহর মহিমা এবং তার ইচ্ছা মাত্র , সেহেতু কোন কোন কাজ যেমন নির্ধারিত নিয়মে ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে, ঠিক তেমনি কোন কোন কাজ আল্লাহ তাআলার মহিমায় এই স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন অস্বাভাবিক নিয়মেও হতে পারে। আর যখন আল্লাহর ইচ্ছা হয় ,তখন তা হয়েও থাকে।

আল্লাহ তাআলা অধিকাংশ নবীকেই তাদের নবুয়্যাতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে মু’জিযার ক্ষমতা দান করেছিলেন। কিন্তু সে মু’জিযা কাফিরদের ঈমান আনা ও বিশ্বাস পোষণের কারণ হিসাবে খুব কমই কাজ করেছে।আগেই বলা হয়েছে ম’জিযা হচ্ছে এক প্রকারের চূড়ান্ত দলিল।এজন্যে লোকেরা যখন মু’জিযা দেখার পরও নবীকে অস্বীকার করেছে, তখন তাদের ওপর আল্লাহ তাআলা গযব নাযিল করেছেন এবং দুনিয়া থেকে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। মক্কার কুরাইশরাও হযরত (সা)-এর কাছে মু’জিযা দাবি করেছিল । তাদের এই দাবিকে বারবার এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল । কারণ আল্লাহ তাআলার নিয়মানুযায়ী কোন জনগোষ্ঠী কে তাদের দাবি অনুসারে যদি কোন মুজিযা দেখানো হয়,তাহলে তারপর তাদের সামনে শুধু দুটি পথই খোলা থাকেঃঈমান অথবা ধ্বংস। কুরাইশদেরকে এক্ষুনি ধ্বংস দেয়ার ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা ছিল না। সে জন্য তাদের দাবিকেও বারবার এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে যখন দীর্ঘ দশ-এগারটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল এবং অন্যান্য মুমিনদের মনে মাঝে মাঝে আগ্রহ জাগতো লাগলো :হায়!আল্লাহর তরফ থেকে যদি কোন অলৌকিক নির্দশন প্রকাশ পেত, যা দেখে অবিশ্বাসী লোকেরা ঈমান আনতো ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো! কিন্তু তাদের এই আগ্রহের জবাবে বলা হচ্ছিলঃ ‘দেখো, অধৈর্য হয়ো না। যে ধারা ও নিয়মে আমি আন্দোলন পরিচালনা করছি, ঠিক সেভাবে ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তুমি কাজ করতে থাকো। মুজিয়া দ্বারা কাজ হাসিল করতে চাইলে তা অনেক আগেই সম্পন্ন হয়ে যেত। আমি যদি ইচ্ছা করতাম তো এক একটি কাফিরের অন্তর মোমের মত নরম করে দিতাম এবং তাদেরকে জোরপূর্বক সুপথে চালিত করতাম। কিন্তু এ আমার নীতি নয়। এভাবে না মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার কোন পরীক্ষা হয়ে থাকে আর না তার চিন্তাধারা ও নৈতিক জীবনে আদর্শ সমাজ গড়ার উপযোগী কোন বিপ্লব আসতে পারে। তথাপি লোকদের বেপরোয়া আচরণ এবং তাদের অবিশ্বাসের ফলে যদি তুমি ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মুকাবেলা করতে না পারো তো তোমার যা ইচ্ছা হয় তা-ই করো। জমিনের মধ্যে ঢুকে অথবা আসমানে উঠে কোন মুজিযা নিয়ে এসো। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, হযরত (সা:)-কে কোন মু’জিযায় দান করা হয়নি। তার সবচেয়ে বড় মু’জিযা তো খোদ কুরআন মজীদ। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে তার ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে অসংখ্য মু’জিযা প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ এবং তার মহাকাশ ভ্রমণ (মিরাজ) অত্যন- গুরুত্বপূর্ণ । এতৎভিন্ন বহুতর ভবিষ্যৎ বাণীর সফল হওয়া, তার দু’আর ফলে পানি বর্ষিত হওয়া, লোকদের সুপথপ্রাপ্ত হওয়া, প্রয়োজনের সময় অল্প জিনিস বৃদ্ধি পাওয়া, রুগ্ন ব্যক্তির আরোগ্য লাভ করা, পানি প্রবাহিত হওয়া ইত্যাকার অসংখ্য মু’জিযা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্র দ্বিখন্ডিতকরণ

মক্কার কাফিরদের সামনে প্রমাণ পেশ করার জন্যে হযরত(সা:)-কে যে সব মু’জিযা দেখাতে হয়, তন্মধ্যে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণের ঘটনাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) এই ঘটনাটি বিবৃত করেছেন এবং সহীহ বুখারী , মুসলিম প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে তা উল্লেখিত হয়েছে। তিনি এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে চাঁদকে দু’টুকরা হতে দেখেছেন। তিনি বলেনঃ আমরা হযরত(সা:)- এর সঙ্গে মিনায় ছিলাম , ঠিক এমনি সময় দেখলাম চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং তার একটি খন্ড পাহাড়ের দিকে চলে গেল। হযরত(সা:) বললেন : ‘সাক্ষী থেকো।’ কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, মু’জিযা দেখার পরই কাফিররা ঈমান আনবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই ; বরং কার্যত দেখা যায় যে সব লোকের মন অবিশ্বাস ও হঠকারিতায় পরিপূর্ণ ,কেবল তারাই মু’জিযা দাবি করে। এভাবেই তারা নিজেদের অবিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকার

amarboi.org

amarboi.org

জন্যে বাহানা তালাশ করে থাকে। নচেত যাদের অন্তরে ঈমান কবুল করার মত যোগ্যতা থাকে এবং যারা পার্থিব স্বার্থের জালেও জড়িত নয়, তাদের কাছে তো হযরত (সা:) এর মহান চরিত্র এবং তার শিক্ষাগুলোই সবচেয়ে বড়ো মু'জিযা। আর এই শ্রেণীর লোকেরাই যে সত্য ধর্ম গ্রহণে হামেশা অগ্রবর্তী হয়ে থাকে , তা বলাই বাহুল্য। তাই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার পরও কাফিররা বলতে পারলো; 'ওহো , এটা তো একটা জাদুর সাহায্যে চিরদিনই এরকম হয়ে আসছে।' এভাবে তারা সুপথ প্রাপ্তির এক দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলো। অবশ্য এমনি সুস্পষ্ট নিদর্শনের পরও তারা আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা মনে করায় তাদের ব্যাধির তালিকায় আরো একটি গুরুতর ব্যাধি সংযোজিত হলো।

মি' রাজ

মি'রাজ অর্থ ঊর্ধে আরোহণ করা। যেহেতু হযরত (সা:) তার এক মহাকাশ ভ্রমণ সম্পর্কে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এজন্যে তার এই ভ্রমণ কে মি'রাজ বলা হয়। এর অপর নাম হচ্ছে ইসরা অর্থাৎ রাতের পর রাত ভ্রমণ করা । এ ভ্রমণ যেহেতু রাতের পর রাত অব্যাহত ছিল , সে জন্যে একে ইসরাও বলা হয়। কুরআন পাকে এই শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহর নবীদেরকে দাওয়াত , তাবলীগ , ও ইকামতের দ্বীনের যে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিতে হয়, সে জন্যে অত্যন্ত উচু দরের ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। এ কারণেই তারা যে অদৃশ্য সত্যের প্রতি ঈমান আনার জন্যে আহ্বান জানিয়ে থাকেন , তা অন্তত তাদের নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করা দরকার। কারণ তাদেরকে সারা দুনিয়ার সামনে এ কথা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে হয় যে, তোমরা শুধু আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে একটা জিনিসকে অস্বীকার করছো; অথচ আমরা নিজ চোখে দেখা সত্যকেই বিবৃত করছি। তোমাদের কাছে আছে শুধু আন্দাজ-অনুমান, আমাদের কাছে আছে ইলম ও জ্ঞান।এজন্যে অধিকাংশ নবীর কাছেই ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদেরকে আসমান ও জমিনের বিশাল রাজত্ব প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে, স্বচক্ষে বেহেশত ও দোযখ দেখানো হয়েছে এবং এ জীবনেই মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছে মি'রাজ বা ইসরা এ ধরণেরই একটা ঘটনা মাত্র ।এতে একজন মুমিনকে যে সব অদৃশ্য সত্যের প্রতি ঈমান আনতে হয়, হযরত (সা:)-কে তা স্বচক্ষে দেখানো হয়েছে।

মিরাজের ঘটনা কোন তারিখে ঘটেছিল, এ সম্পর্কে হাদিসে বিভিন্ন রুপ বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশ্য সমস্ত বর্ণনা সামনে রেখে ঐতিহাসিকগণ এ তথ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ ঘটনা হিজরতের প্রায় বছর দেড়েক আগে ঘটেছিল। এ সম্পর্কে বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনা সামনে রাখলে যে মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপঃ একদিন সকাল বেলা হযরত (সা:) প্রকাশ করেনঃ'গত রাতে আমার প্রভু আমায় অত্যন্ত সম্মানিত করেন। আমি শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম, এমন

সময় জিবরাঈল এসে আমাকে জাগিয়ে কা'বা মসজিদে নিয়ে যান। সেখানে তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করেন এবং তা জমজমের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলেন অত:পর তাকে ঈমান ও হিকমত দ্বারা পূর্ণ করে বিদীর্ণ স্থান পূর্বের ন্যায় জুড়ে দেন। এরপর তিনি আমার আরোহণের জন্যে খচ্চরের চেয়ে কিছু ছোট একটি সাদা জানোয়ার উপস্থিত করেন। তার নাম ছিল বুরাক। এটি অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন জানোয়ার ছিল। আমি তার ওপর আরোহণ করতেই বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে উপনীত হলাম। এখানে বুরাকটি মসজিদে আকসার দরজার সাথে বেঁধে রেখে আমি মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকায়াত নামাজ পড়লাম। এই সময় জিবরাঈল আমার সামনে দুটি পেয়ালা উপস্থিত করলেন। তার একটিতে শরাব এবং অপরটিতে দুধ ছিল। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করে শরাবেরটি ফেরত দিলাম। এটা দেখে জিবরাঈল বললেনঃ'আপনি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করে স্বভাব ধর্মকেই (দ্বীনে ফিতরাত) অবলম্বন করেছেন। 'এর পর মহাকাশ ভ্রমণ শুরু হল। আমরা যখন পথম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন জিবরাঈল পাহারাদার ফেরেশতা কে দরজা খুলে দিতে বললেন। সে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সাথে কে আছেন?' জিবরাঈল বললেন,'মুহাম্মদ। ফেরেশতা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'একে কি ডাকা হয়েছে ?' জিবরাঈল বললেন, 'হ্যাঁ ডাকা হয়েছে।' একথা শুনে ফেরেশতা দরজা খুলতে খুলতে বললো, 'এমন ব্যক্তিত্বের আগমন মুবারক হোক।' আমরা ভেতরে ঢুকতেই হযরত আদম(আ:)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। জিবরাঈল আমায় বললেন, 'ইনি আমার পিতা আদম। আপনি একে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাবদান প্রসঙ্গে বললেন, ' খোশ আমদেদ! হে নেক পুত্র , হে সত্য নবী! এর পর আমরা দ্বিতীয় আকাশে পৌঁছলাম এবং প্রথম আকাশের ন্যায় সওয়াল - জওয়াবের পর দরজা খুলে দেওয়া হলো। আমরা ভেতরে গেলাম হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা(আ:)- এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। জিবরাঈল তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'খোশ আমদেদ, হে নেক ভ্রাতা, হে সত্য নবী! অত:পর আমরা তৃতীয় আকাশে পৌঁছলাম। এখানে হযরত ইউসুফ (আ:) এর সঙ্গে দেখা হলো। আগের মতই তার সঙ্গে সালাম কালাম হলো। অনুরুপভাবে চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরীস (আ:) এর সঙ্গে , পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আ:) এর সঙ্গে

amarboi.org

amarboi.org

এবং ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা(আ:) এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। সর্বশেষ সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ:) এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো এবং তিনিও সালামের জবাব দান প্রসঙ্গে বললেন,'খোশ আমদেদ ! হে নেক পুত্র,হে নেক নবী! এরপর আমাকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' নামক একটি সমুন্নত বরই গাছ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হলো। এর ওপর অগনিত ফেরেশতা জোনাকির মতো ঝিকমিক করছিল।

এখানে হযরত (সা:) অনেক গোপন রহস্য প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার সঙ্গেও কথাবার্তা বললেন। এ সময় আল্লাহ তাআলা তার উম্মতের জন্যে মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করে দিলেন। এ সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আবার হযরত মূসা(আ)এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ'বলুন খোদার দরবার থেকে কি উপহার নিয়ে যাচ্ছেন ?' হযরত (সা:) বললেন, 'দিন-রাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ?' মূসা(আ:) বললেন, 'আপনার উম্মত এত বড় বোঝা বহন করতে পারবে না; কাজেই আপনি ফিরে যান এবং এটা কম করে আনুন।' হযরত (সা:) আবার ফিরে গেলেন এবং নামাজের ওয়াক্ত কমানোর জন্যে আবেদন জানালেন। ফলে ওয়াক্তের সংখ্যা কিছুটা কমিয়ে দেয়া হলো।কিন্তু মূসা(আ:) হযরত (সা:) কে বারবার পাঠালেন এবং প্রত্যেক বারই সংখ্যা কমতে লাগলো। অবশেষে কমতে কমতে সংখ্যা মাত্র পাঁচটি রয়ে গেল। এতেও হযরত মূসা(আ:) নিশ্চিত হলেন না, বরং তিনি আরো কম করানোর কথা বললেন। কিন্তু হযরত (সা:) বললেন :'আমার আর কিছু বলতে লজ্জা করছে।' এ সময় আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে এই মর্মে ঘোষণা এলো :যদিও আমি নামাজের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে পাঁচ করে দিয়েছিম তবুও তোমার উম্মতের মধ্যে যারা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, তাদেরকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজেরই পুরস্কার দান করা হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়া এই উপলক্ষে আল্লাহর নিকট থেকে আরও দুটি উপহার পাওয়া গেল। একটি হচ্ছে সূরা বাকারার শেষ আয়াত সমষ্টি, যাতে ইসলামের মৌল আকিদাগুলো এবং ঈমানের পূর্ণতার বিষয় বিবৃত করার পর এই মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মুসিবতের দিন এখন সমাপ্ত প্রায়। দ্বিতীয় হচ্ছে এই সুসংবাদ যে, উম্মতে মুহাম্মদীর যারা অন্তত শিরক থেকে বেঁচে থাকবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।'এই ভ্রমণকালে হযরত (সা:) স্বচক্ষে বেহেশত এবং দোযখও পরিদর্শন করেন। মৃত্যুর পর আপন কৃত কর্মের দৃষ্টিতে মানুষকে যে সমস্ত পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, তার কয়েকটি দৃশ্যও তার সামনে উপস্থাপন করা হয়।

মহাকাশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আবার বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে দেখেন যে, অন্যান্য নবীগণ সেখানে সমবেত হয়েছেন। তিনি নামাজ পড়লেন এবং সবাই তার পেছনে নামাজ আদায় করলেন। এরপর তিনি নিজের জায়গায় ফিরে আসেন এবং ভোর বেলা সেখান থেকে সজাগ হন ।

মি' রাজের গুরুত্ব ভবিষ্যতের জন্যে ইঙ্গিত

সকাল বেলা হযরত (স) মহাকাশ ভ্রমণের এই ঘটনার কথা জনসমক্ষে বিবৃত করলেন। বিরুদ্ধবাদী কাফের কুরাইশরা তাকে মিথ্যাবাদী (নাউযুবিল্লাহ) বলে অভিহিত করলো। পক্ষান্তরে যাদের হৃদয়ে তার সত্যতা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে আস্থা ছিল, তারা এর প্রতিটি হরফকেই সত্য বলে মেনে নিল। তারা বললোঃ হযরত যখন নিজেই এ ঘটনার কথা বলেছেন,তখন এর সবটাই সত্য।' এভাবে মিরাজের ঘটনা একদিকে ছিল ঈমান ও নবুয়্যাত স্বীকারের পরীক্ষাস্বরুপ, অন্যদিকে ছিল খোদ হযরত (সা:) এর পক্ষে অসংখ্য গায়েবী রহস্য প্রত্যক্ষ করার উপায়। সেই সঙ্গে এ ছিল সেই অনাগত বিপ্লবের প্রতিও এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যা ইসলামী আন্দোলনকে অনতিকালের মধ্যেই সংঘটিত করতে হয়েছিল। এই ইঙ্গিতের বিস্তৃত বিবরণ কুরআন পাকের সূরা বনী ইসরাঈলে (মি'রাজ সম্পর্কিত আলোচনায়) বিবৃত হয়েছে। এই সূরার বিষয়বস্তুতে যেসব সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, তা নিম্নরুপঃ

নেতৃত্ব থেকে ইহুদীদের অপসারণ

বনী ইসরাঈল গণ এই পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীনের উত্তরাধিকার আল্লাহর বাণীর সাথে বিশ্ববাসীকে পরিচিত করানোর মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তারা এ খেদমত আঞ্জাম দেয়া তো দূরের কথা, বরং নিজেরাই অসংখ্য প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করার অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। সুতরাং এ খেদমতের দায়িত্ব এবার বনী ইসমাঈলের ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এবং হযরত (সা:)- কে এই খান্দানের মধ্যেই প্রেরণ করা হলো। ইতঃপূর্বে বনী ইসরাঈলকে

amarboi.org

amarboi.org

সরাসরি উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় নি; কিন্তু এবার সূরা বনী ইসরাঈলে তাদের কে বলে দেয়া হলো যে, এ পর্যন্ত তোমরা যা ভুলভ্রান্তি করেছো তাতো করেছোই। এর আগে তোমাদেরকে দু' দুবার যাচাই করা হয়েছে; কিন্তু তোমরা আপন দোষ-ত্রুটি সংশোধন করোনি। এবার বনী ইসমাঈলের এই নবীকে পাঠানোর পর তোমাদেরকে শেষ বারের মতো সুযোগ দেয়া হচ্ছে। যদি তোমরা এর আনুগত্য করো, আবার তোমরা উন্নতির পথে চলতে পারবে। বস্তত মক্কার চরম উৎপীড়ন ও পেরেশানীময় জীবনে এই ইঙ্গিত ছিল একটি মস্তবড় সুসংবাদ, যা পরবর্তীকালে হুবহু সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

মক্কার কাফিরদের প্রতি সতর্কবাণী

মক্কার কাফিরদের জুলুম-পীড়ন এবং হঠকারিতা ইতোমধ্যে চরমে পৌঁছেছিল। তারা বারবার চ্যালেঞ্জ দিতে লাগলোঃ 'মুহাম্মদ যদি আল্লাহর রাসূলই হবে তাহলে আমাদের অবিশ্বাসের কারণে আমাদের ওপর কেন আযাব নাযিল হয় না? তাহলে তো সে আমাদেরকে ভয় দেখাতে পারতো।' এর জবাবে তাদেরকে বলা হলোঃ 'আল্লাহ তাআলার শাশ্বত নীতি এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন জাতির মধ্যে আল্লাহর রাসূল আসেন, ততক্ষণ তার ওপর কোন আযাব নাযিল হয় না। যখন রাসূল আগমন করেন, তখন জাতির বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকেরা তার সত্য প্রচারের পথ রোধ করার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে যায়। অন্যদিকে সাধারণ ও নির্যাতিত লোকেরা তার সহযোগিতা করার জন্যে এগিয়ে আসে। অবশ্য প্রথমোক্তদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু লোকও বর্তমান থাকে এবং তারা এগিয়ে এসে সত্যকে গ্রহণও করে। এরপর এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় এবং পরিণামে মজলুমের জন্যে আল্লাহর সাহায্য আসে।এই সাহায্যের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই তাড়াহুড়া প্রবণ বলে কখনো কখনো সে অকল্যাণকর জিনিসকেও ভালো মনে করে দাবি করতে থাকে। তার এটা খেয়ালই হয় না যে,আল্লাহ তাআলার প্রত্যেকটি কাজই তার নিজস্ব সময়ের জন্য নির্ধারিত। দিন-রাতের আবর্তনের বিষয়টির প্রতিই লক্ষ করো :এর ভেতর আল্লাহ তাআলার কতবড় নিদর্শন রয়েছে এবং একটি বাঁধা-ধরা নিয়ম অনুযায়ী কিরুপ একের পর এক দিন-রাত ঘুরে আসছে। অতীত ইতিহাস লক্ষ করে দেখঃ নূহ(আ:) এর পর থেকে এ পর্যন্ত কত জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।বস্তত আল্লাহ তার বান্দাদের অবস্থা পুরাপুরি অবগত রয়েছেন।তিনি প্রত্যেকের কৃত কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দিয়ে থাকেন। সুতরাং মক্কার কাফিরদেরও জানা উচিত যে, তারা প্রথম আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতের মুকাবেলায় যে ভূমিকা গ্রহণ করবে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হবে। আর চূড়ান্ত ফয়সালার সময় এখন খুবই নিকটবর্তী।

ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ

এবার মুসলমানদের জীবন থেকে দুঃখ-রজনীর অবসান ঘটায় এবং ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ একটি সমাজ গঠিত হবার সময় ঘনিয়ে এলো। মি'রাজের ঘটনা থেকে এই ইসলামী সমাজের বুনিয়াদী নীতিসমূহও উপহার পাওয়া গেল। যে নীতিসমূহ ভবিষ্যতে ইসলামী জীবন পদ্ধতির জন্যে নির্দেশক নীতিমালা হিসেবে কাজ করবে, তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে :

১.আল্লাহর সাথে আর কাউকে প্রভু ও মাবুদ বানানো যাবেনা। ইবাদত-বন্দেগী, আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতাও তার সাথে কাউকে শরীক করা চলবে না।

২.পিতামাতা কে সম্মান এবং তাদের আনুগত্য করে চলতে হবে। কোথাও তাদের আনুগত্য খোদার আনুগত্যের প্রতিকূল হলে সেখানে তাদের আনুগত্য বর্জন করতে হবে।

৩.আত্মীয়-কুটুম্ব,মিসকীন ও মুসাফিরদের হক আদায় করতে হবে। সমাজের নাগরিকদের পরস্পরের ওপর যে অধিকার রয়েছে, তার প্রতি উপেক্ষা বা ঔদাসিন্য দেখানো যাবে না। সমস্ত অধিকার সঠিক ভাবে আদায় করতে হবে। নচেত কোন সামাজিক ব্যবস্থা শোধরানো যেতে পারে না।

৪. অপব্যয় ও অপচয় করা যাবে না;কেননা খোদার দেয়া সম্পদকে অনর্থক ব্যয় করা শয়তানের কাজ যে সমাজের লোকেরা নির্বিচারে অর্থ ব্যয় করে অর্থের মায়ায় সম্পূর্ণরুপে হাত গুটিয়ে বসে ,তা কখনো সুস্থ বা সমৃদ্ধ হতে পারে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

amarboi.org

amarboi.org

৫.দারিদ্র্য ও অনটনের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না; কেননা জীবিকার ব্যবস্থা করা খোদার কাজ এবং তিনি তার ইন্তেজাম করেই থাকেন। কাজেই খাদ্যাভাবের আশংকায় ভবিষ্যত বংশধর ধ্বংস করো না। এটা অত্যন্ত গুনাহর কাজ এবং সামাজিক আত্মহত্যার নামান্তর।

৬.ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। এই নোংরা কাজটি থেকে শুধু বেঁচে থাকাই নয় , বরং এই ঘৃন্য কাজে উৎসাহজনক প্রত্যেকটি তৎপরতায় খতম করে দাও। যে সমাজ এই লা'নত থেকে মুক্ত না হবে, সে নিজেই নিজের মূলোচ্ছেদ করবে এবং শীগগীরই ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হবে।

৭.অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করো না। যে সমাজে লোকদের জীবন-প্রাণ নিরাপদ নয়, তা কখনো সমৃদ্ধ হতে পারে না। শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছাড়া কোন সমাজেরই উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই সর্বপ্রথম জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা আবশ্যক।

৮.ইয়াতিমের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। অক্ষম, দুর্বল, অসহায় লোকদের সাহায্য করো। যে সমাজে দুর্বল ও অক্ষম লোকদের অধিকার সংরক্ষণ না করা হবে, তা কখনো প্রগতি অর্জন করতে পারবে না।

৯.আপন অঙ্গিকার পূর্ণ করো। কারণ অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। অঙ্গীকার বলতে লোকদের পারস্পরিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি যেমন বুঝায়, তেমনি ঈমান আনার সময় খোদার সাথে মুমিন বান্দাহর কৃত ওয়াদাকে বুঝায়।

১০. ওজন ও মাপ-জোখের সময় দাঁড়িপাল্লা ও মাপকাঠি ঠিক রেখো। লেন-দেনের ব্যাপারে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা এবং পরের অধিকার সংরক্ষণ করা সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যে অতীব প্রয়োজন।যেখানে লোকদের পরস্পরের প্রতি আস্থা না থাকবে এবং সাধারণভাবে লোকেরা পরের হক মেরে খাবার ফিকিরে থাকবে, সেখানে কোন সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না।

১১.যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছু::টো না। অজানা ও অজ্ঞাত বিষয়ের পেছনে ছুটা এবং আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই লোকদের পারস্পরিক অবনতি ঘটে। কাজেই এই সব দোষ-ত্রুটি থেকে প্রত্যেকটি উত্তম সমাজেরই মুক্ত হওয়া উচিত। লোকদের জেনে রাখা দরকার যে,তাদের কান, চোখ এবং মন সম্পকেই সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাসা করা হবে।

১২.জমিনের ওপর অহংকারের সাথে চলো না ; কেননা গর্ব ও অহংকার মানুষকে নিকৃষ্ট চরিত্রের দিকে ঠেলে দেয়।এই দোষের ফলেই মানুষ সমাজের পক্ষে অনিষ্ঠের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই নিজের মুকাবেলায় অন্য কাউকে হেয় মনে না করা এবং কারো সঙ্গে অমানুষিক আচরণ না করা পারস্পরিক সম্পর্কের সুস্থতা বিধানের জন্যে একান্ত অপরিহার্য।

হিজরতের জন্য ইঙ্গিত

আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতির মধ্যে তার রাসূল প্রেরণ করেন, তখন সেই জাতির লোকেরা যাতে সেই রাসূলের দাওয়াত শুনতে ,বুঝতে এবং গ্রহণ করতে পারে, তজ্জন্যে তিনি কিছুকাল সুযোগ প্রদান করেন। এই সুযোগের ফলে কিছু লোক তো আপনাতেই সেই দাওয়াত কবুল করে নেয়।, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই পার্থিব স্বার্থ, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসৃতি ও প্রবৃত্তির গোলামীতে লিপ্ত থাকে বলে সেই দাওয়াত কে বর্জন করে এবং তার বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগে যায়। অবশেষে এমন এক সময় আসে, যখন স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, জাতির মধ্যেকার যোগ্য লোকেরা আন্দোলনকে কবুল করে নিয়েছে; এখন আর এ আন্দোলনের প্রতি কর্ণপাত করতে এ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করতে আগ্রহী কোন লোক বাকী নেই।

বস্তত এমনই পর্যায়ে এসেই জাতির লোকেরা নবীর কাছে মু'জিযা দাবি করে বসে এবং প্রায়শই সে জাতির সামনে মু'জিযা উপস্থাপন করা হয়। তাই এ পর্যায়ে এসে হযরত(সা:) এর কাছেও মু'জিযা দাবি করা হলো এবং তিনি বিভিন্ন রূপ মু'জিযা প্রদর্শনও করলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অবিশ্বাসের ওপর অটল হয়ে রইলো, তখন স্থির করা হলো যে, এখন এ জাতির মধ্যে থেকে এ নবীর চলে যাওয়াই উচিত। কেননা এখন যেকোন মুহূর্তে এদের ওপর আযাব আসতে

amarboi.org

amarboi.org

পারে। এই আযাব কখনো আসমান বা জমিনের কোন প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে আসে আবার তা কখনো মুমিনের দ্বারাও সংঘটিত হয়। তাই আল্লাহ তাআলা এই সূরা বনী ঈসরাইলেই তার এ নিয়মের কথা উল্লেখ করে নবীকে সুস্পষ্ট ভাষাই বলেন যে,'এই লোকগুলো হঠকারিতার চরমে পৌঁছে খুব শিগগিরই তোমাকে এই জনপদ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবে।যদি তা-ই হয়, তাহলে তোমার বিদায়ের পর এরা এখানে নিশ্চিত থাকতে পারবে না। তোমার পূর্বে আমি যতো রাসূল পাঠিয়েছি , সবার ক্ষেত্রেই এ নিয়ম চলে এসেছে। আর এখনো এতে কোন পরিবর্তন সূচিত হবে না।'

তাহাজ্জদ নামাজের গুরুত্ব

এই সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি মুকাবেলায় আত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে ফরয নামাজ ফরজ নামাজ ছাড়াও তাহাজ্জদ নামাজের আয়োজন করার নির্দেশ দেয়া হলো। এ ছাড়াও হিজরতের জন্যে নবীকে নিম্নোক্ত দো'আ শিখিয়ে দেয়া হলোঃ'হে প্রভু আমাকে ভালো জায়গা চিনে নেবার তওফীক দিও এবং এখান থেকে সহি-সালামতে বের করে নিও আর নিজের তরফ থেকে সাহায্য পাঠিয়ে দুশমনদের ওপর বিজয় দান করো।' অতঃপর এই সুসংবাদও প্রদান করা হলো যে, সত্যের বিজয় এবং মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী ; কারণ পতনের জন্যেই মিথ্যার উত্থান। এর জন্যে শুধু শর্ত এই যে, সত্যকে ময়দানে উপস্থিত থাকতে হবে।

এরপর হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে মক্কার কাফিররা যে সব প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করেছিল, তারও জবাব দেয়া হলো। এভাবে যুক্তি-প্রমাণ কানায় কানায় পূর্ণ করে দেয়ার পর শিক্ষণীয় বিষয়ে হিসেবে হযরত মূসা(আ:)- এর ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হলো।

এ যুগের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

এ পর্যায়ে কুরআনের যেসব অংশ নাযিল হচ্ছিলো, সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

১.আল্লাহর ওপর নির্ভরতা

মানুষের প্রকৃতি এই যে, যখন সে কোনো কাজের জন্যে চেষ্টা-সাধনা করে এবং তার আশানুরূপ ফলাফল লাভে ব্যর্থ হয়, তখন তার ওপর একটা নৈরাশ্যের অন্ধকার নেমে আসতে থাকে। সত্যের আন্দোলনের নিশানবাহীদের জন্যে এই পর্যায়টিই সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়ে থাকে। খোদা না করুন,তারা যদি এরূপ নৈরাশ্যের শিকারে পরিণত হয়,তাহলে তাদের এবং গোটা আন্দোলোনের পক্ষে তা এক বিরাট ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এমনই পর্যায়ে সঠিক পথে থাকা এবং ফলাফলকে সম্পূর্ণ খোদার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত মজবুত ঈমানের প্রয়োজন । তাই এই কঠিন পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এ সম্বন্ধেই পথনির্দেশ নাযিল করেন। দীর্ঘ বারো বছরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা সাধনার যে ফলাফল সামনে ছিল, তা একজন সাধারণ লোকের পক্ষে ছিল নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক । তাছাড়া এত দীর্ঘদিন পরেও মুমিনদের যে সব উৎপীড়নের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, তাও নেহাত কম তিতিক্ষার ছিল না। এ জন্যে মুমিনদের হৃদয় কে মজবুত করা এবং তাদেরকে সঠিক পথে চালিত করার জন্যে এ পর্যায়ে বিশেষভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

এ ব্যাপারে সূরা আনকাবুতের প্রতিপাদ্য বিষয় একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এতে মুমিনদের সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হলো যে, তোমরা যে পথে চলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছো, যাচাই-পরীক্ষা হচ্ছে সে পথের অপরিহার্য মঞ্জিল। এই নিরিখ দ্বারা যাচাই করেই ঈমানের প্রশ্নে সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। কিন্তু মুমিনদের এই যাচাই-পরীক্ষা করার অর্থ এই নয় যে, কাফিররা প্রকৃতপক্ষে প্রাধান্য লাভ করেছে, বরং তাদেরও জেনে নেয়া উচিত যে, খোদার মুকাবেলায় তারা কখনোই বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত সত্যের আওয়াজ বুলন্দ হবেই। এ জন্যে শুধু শর্ত এই যে, সত্যের অগ্রসেনাদেরকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দ্বারা আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য প্রতিপন্ন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে মুমিনদেরকে আরো বলা হলো :এ পথে তো স্বভাবতই বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এসে থাকে,কিন্তু তাদের কিছুতেই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। এর আগেও আল্লাহর যে সমস্ত বান্দাহ ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করেছেন, তাদেরকেও এমনি অবস্থাই অতিক্রম করতে হয়েছে। হযরত নূহ (আ:)-এর কথা উল্লেখ করে বলা হলো যে, তিনি দীর্ঘ সাড়ে ন'শ বছর পর্যন্ত কতো

amarboi.org

amarboi.org

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে আপন জাতির বিরোধিতা সহ্য করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ:), হযরত লূত(আ:), হযরত শুআইব(আ:), হযরত সালেহ(আ:) প্রমুখকেও এমনি পরিস্থিতিরই মুকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যেরই বিজয় হয়েছে এবং মিথ্যাকে ময়দান ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

এর আগে বলা হয়েছে যে, কাফিরদের মুজিযা দাবির ফলো হযরত(সা:) এবং অন্যান্য মুমিনদের হৃদয়ে কখনো কখনো এই মর্মে আগ্রহ জাগতোঃ হায়! এমন কোন মুজিযা যদি প্রকাশ পেত, যা দেখে এই লোকগুলো ঈমান আনতো।এই আগ্রহের জবাবে আল্লাহ তাআলা যে পথনির্দেশ পাঠিয়েছেন, তাও ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা তার সর্বশেষ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযার প্রতি লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তোমরা তো মুজিযা দাবি করছো; কিন্তু তার পূর্বে যে মুজিযা দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত মানব জাতির জন্যে এক স্থায়ী নিদর্শন রূপে বিরাজ করবে এবং যাতে রয়েছে প্রতিটি জ্ঞানী ও সমঝধার মানুষের জন্যে নির্ভুল পথনির্দেশ ,সেই কুরআন মজীদের ওপর সর্বপ্রথম তোমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত।

এই পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছেঃ 'নবুয়্যাতের আগে হযরত(সা:) যে কোন প্রকার পুথিগত জ্ঞান অর্জন করেন নি এবং কোনরুপ লেখাপড়া পর্যন্ত শেখেন নি, তা ঐ বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কে না জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পেশকৃত কালাম এত উন্নত এবং জ্ঞানগর্ভ যে একজন উম্মী লোক যে এমন অপূর্ব কালাম পেশ করতে পারে , তাদের বড়ো বড়ো আলেমরা পর্যন্ত তার কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে না। এতৎসত্ত্বেও এই লোকগুলো অবিরত মু'জিযা দাবি করে চলেছে। এদেরকে বলে দিন,মু'জিযা প্রকাশ পাওয়া বা না পাওয়া তো আমার প্রভুর ইচ্ছাধীন বিষয়। আমি শুধু তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র। অবশ্য আমি তোমাদেরকে যে আল্লাহর বাণী শুনাই ,তা আমার নবুয়্যাতের দাবি প্রমাণের জন্যে যথেষ্ঠ কিনা তা তোমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। তোমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, যে সব লোকের ভেতর হৃদয়কে ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধ করার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রয়েছে, এ বাণীসমূহ কেবল তাদেরই জন্যে রহমত ও নসিহত স্বরুপ।

২.কুরআন শ্রেষ্ঠ মু'জিযা

বস্তুত হযরত(সা:)- কে যতো মু'জিযাই দান করা হয়েছে তন্মধ্যে করআন নি:সন্দেহ শ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

হযরত(সা:)- নিজেও কুরআন পাককে তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মু'জিযা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'প্রত্যেক পয়গম্বরকেই আল্লাহ তাআলা প্রচুর মু'জিযা দান করেছেন তা দেখেই লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যে মু'জিযা দান করা হয়েছে, তা হচ্ছে আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহী(কুরআন) এজন্যে আমি প্রত্যাশা করি, কিয়ামতের দিন আমার অনুগতের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি হবে। বস্তত কুরআন হচ্ছে এক স্থায়ী মু'জিযা এবং অন্যান্য মুজিযা হচ্ছে সাময়িক। সেসব মু'জিযা বিলীন হয়ে গেছে; কিন্তু এ মু'জিযা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে এবং লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকবে। কুরআন পাকের ছন্দোময় ভাষা ,এর মাধুর্য ও লালিত্য এতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভত অদৃশ্য খবরাখবর ও ভবিষ্যত বাণীর উল্লেখ ,এর অপূর্ব প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতা , এর বিধি-বিধান ও শিক্ষাসমূহের অতুলনীয় কল্যাণকর ভূমিকা ,আজ পর্যন্ত কুরআন উপস্থাপিত জীবন পদ্ধতির মতো কার্যকর আর কোন জীবন পদ্ধতি উদ্ভাবনে মানব সমাজের ব্যর্থতা , এর বিষয়বস্ত বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও সকল প্রকার অসংগতি ও বৈপরিত্য থেকে তার মুক্ত থাকা ,সর্বোপরি এক নিরক্ষর ব্যক্তির জবান থেকে এইসব বাণী নিসৃত হওয়া - এসব কিছুই কুরআন পাকের মু'জিযা হবার জন্যে অকাট্য প্রমাণ। এই সমস্ত দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে আজো হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নবয়্যাত সম্পর্কে মানুষের মন পুরোপরি নিশ্চিন্ত ও নিঃসন্দেহ হতে পারে এবং তা হয়েও থাকে।

৩.চূড়ান্ত কথা

এ পর্যায়ে অবতীর্ণ কালামের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এবার থেকে কাফিরদের সাথে অত্যন্ত সম্পষ্ট ও চূড়ান্ত ভাবে কথা বলা শুরু হলো। এর ধরণটা ছিলো এই যে, এবার বুঝানো এবং বাতলানোর পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। মানবার যদি ইচ্ছা থাকে তো এখনো সময় আছে, মেনে নাও। নচেত অবিশ্বাস ও হঠকারিতার পরিণাম ভোগ করার জন্যে তৈরি হও।

amarboi.org

amarboi.org

তাই হযরত(সা:)- তাদেরকে সম্পষ্টত বলে দিলেন : আমি আমার প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ একটি উজ্জ্বল প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আর তোমরা তাকে এই বলে অস্বীকার করছো যে, এই অবিশ্বাসের ফলে যে আযাব আসার তা আসুক। কিন্তু তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, যে বস্তুটির জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছো, তা আমার হাতে নেই। এ সম্পর্কিত ফয়সলা সম্পূর্ণ খোদার হাতে। এটা যদি আমার এখতিয়ারের বিষয় হতো, তাহলে কবে এর মিমাংসা হয়ে যেত! গায়েবের খবর তো শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন। কোন কাজের জন্যে কোন সময় উপযুক্ত , তা তিনিই ভালো বুঝেন। তিনি যখন ইচ্ছা তখন তোমাদের ওপর আযাব নাযিল করতে পারেন। এ আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে নির্দেশ করা হলোঃ 'যে সব লোক দ্বীনের ব্যাপারটিকে একটি খেল তামাসা মনে করে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবনেই মোহগ্রস্থ হয়ে আছে, তাদেরকে নিজস্ব অবস্থার ওপরই ছেড়ে দাও। অবশ্য তাদেরকে যথারীতি কুরআন শুনাতে থাকো। এরপরও যদি তারা সত্যকে মেনে নিতে রাজি না হয়, তাহলে তাদেরকে বলে দাওঃ লোক সকল ! তোমরা যা করতে চাও তা নিজের জায়গায় করতে থাকো আর আমিও আমার জায়গায় কাজ করতে থাকি। এর পরিণামে কে সঠিক পথে আছে, তা শিগগিরই তোমরা জানতে পারবে।

এই ধরনের কালামের এ একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এ ছাড়াও এই পর্যায়ে ওহীতে এ ধরণটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং প্রায় দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, এবার বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে।

৪.হিজরতের প্রস্তুতি

এতদভিন্ন এ পর্যায়ের কালামে হিজরতের জন্যেও বারবার ইশারা আসতে লাগলো। এই সূরা আনকাবুতেই নির্দেশ করা হলোঃ 'হে আমার বান্দাহ গণ!তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী করতে থাকো। আমার বন্দেগীর কারণে যদি স্বদেশের জমিন তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে জন্যে কোন পরোয়া করো না। আমার জমিন অত্যন্ত প্রসস্ত ; এজন্য যদি ঘরবাড়িও ও ছেড়ে দিতে হয় দাও, কিন্তু আমার বন্দেগীর সম্পর্ক ছিন্ন করো না।কোন জানদারের পক্ষে সবচেয়ে বড় ভয় যা হতে পারে, তাহলো মৃত্যুভয়। নিশ্চয় জেনে রেখ, প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তার পর সবাইকে আবার আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। কাজেই সেই মৃত্যু যদি আমার পথেই আসে, তাহলে আর চিন্তা কিসের ? যে কেউ ঈমান ও সৎকর্মের পুঁজি নিয়ে আসবে, তাকে এমন আরামদায়ক বাগিচায় স্থান দেয়া হবে, যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে চিরকাল সে অবস্থান করবে। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল , যারা কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও আল্লাহর দ্বীনের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যারা নিজেদের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মে শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপরই ভরসা রাখে, তাদের জন্যে এ কত উত্তম বিনিময়!এরপর বলা হলো যে, আল্লাহর পথে ঘর-বাড়ি ছাড়বার দ্বিতীয় ভয় হচ্ছে আর্থিক দুর্গতি। এ সম্পর্কে তাদের এই প্রত্যয়কে আরো মজবুত করা হলো যে, প্রকৃতপক্ষে রিযিক দেবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।দুনিয়ায় বিচরণশীল কত প্রাণী রয়েছে; তাদের কেউই আপন রিযিক সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের রিযিক যুগিয়ে থাকেন। কাজেই রিযিক দাতা হিসেবে তার ক্ষমতা সম্পর্কে তোমরা কেন নিরাশ হও এবং তিনি তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন না বলে কেন ভয় পাও ?এছাড়া এ পর্যায়ের অপর সূরা বনী ইসরাঈলে হিজরতের জন্যে দু'আ ও শিক্ষাদান করা হলো। বলা হলোঃ দু'আ প্রার্থনা করোঃ 'প্রভু হে! আমায় উত্তম জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও , মক্কা থেকে ভালভাবে বের করে নাও এবং শত্রুর ওপর বিজয় ও সাহায্য দান করো।' আর হে নবী !ঘোষণা করে দাওঃ সত্য এসে পড়েছে এবং মিথ্যা অপসৃত হয়েছে। মিথ্যাকে অপসৃত হতেই হয়েছে।' মোটকথা, এ পর্যায়ের কালামে এগুলো ছাড়াও এ ধরনের আরো বহুতর ইঙ্গিত রয়েছে। এতে একদিকে যেমন সেই প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি এরূপ পরিস্থিতির মুকাবেলায় যে প্রস্তুতির দরকার, তার প্রতিও বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছিল। আখিরাতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা, অন্তর থেকে পার্থিব সম্পদের বাসনা মুছে ফেলা, খালেস তওহীদ এবং তার দাবিগুলোকে মনের ভেতর বদ্ধমূল করে নেয়া, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো অবলম্বনকে মনের মধ্যে স্থান না দেয়া, কেবল তারই সত্তার ওপর পুরোপুরি ভরসা করা, তার কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলীকে কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি না করে যথারীতি পেশ করতে থাকা এবং এসব কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের নিমিত্ত নামাজ কায়েম করা ও তার প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া ইত্যাকার উপায়-উপকরণের মাধ্যমে মুসলমানদের কে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। সেই সঙ্গে এই কঠিনতর পরিস্থিতিতেও দ্বীনের প্রচার অব্যাহত রাখার জন্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছিল।

amarboi.org

amarboi.org

হিজরত

হিজরত শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে পরিত্যাগ কিংবা পরিবর্জন । কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় হিজরত বলতে বুঝায় : দ্বীন ইসলামের খাতিরে নিজের দেশ ছেড়ে এমন স্থানে গমন করা যেখানে প্রয়োজন সমূহ পূর্ণ হতে পারে। কারণ ইসলামী জীবন যাপন করার এবং আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানোর আজাদী যে দেশে নেই, সে দেশকে শুধু আয়-উপার্জন ,ঘর-বাড়ি ,ধন-সম্পত্তি কিংবা আত্মীয়-স্বজনের খাতিরে আঁকড়ে থাকা মুসলমানদের পক্ষে আদৌ জায়েয নয়।

প্রসঙ্গত একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে,আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ঈমান পোষণকারীর পক্ষে কোনো কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করা কেবল দুটি অবস্থায়ই সঙ্গত হতে পারে। একঃ সংশ্লিষ্ট দেশে ইসলামের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় রুপান্তরিত করার জন্যে সে ক্রমাগত চেষ্টা-সাধনা করতে থাকবে - এ যাবত মক্কায় থেকে মুসলমানেরা যেরূপ চেষ্টা-সাধনা করে আসছিল এবং সে জন্যে সর্বপ্রকার দুঃখ-মুসিবত সহ্য করেছিল। দুই :সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে তার বেরোবার কোন পথ যদি সত্যই না থাকে কিংবা ইসলামী ধারায় জীবন যাপন ও ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চেষ্টা-সাধনা করার উপযোগী কোন জায়গা যদি সে খুঁজে না পায়। কিন্তু দ্বীনের প্রয়োজন পূর্ণ হবার উপযোগী জায়গা যখনি পাওয়া যাবে - এবার মদিনা থেকে যেমন প্রত্যাশা করা গিয়েছিল - তখন অবশ্যই তাদের হিজরত করে সেখানে চলে যেতে হবে। তবে এক্ষেত্রে যারা নিতান্তই অক্ষম ও পঙ্গু এবং যারা অসুস্থতা কিংবা দারিদ্র্যের কারণে কোন প্রকারেই হিজরতের জন্যে সফর করতে সক্ষম নয়, কেবল তারাই ক্ষমা পাবার যোগ্য।

মদিনায় সাধারণ মুসলমানদের হিজরত

মদিনায় ইতোমধ্যেই ইসলাম বেশ কিছুটা প্রচারিত হয়েছিল। এই অবস্থায় মক্কায় যে সব মুসলমান কাফিরদের হাতে উৎপীড়িত হচ্ছিল, হযরত(সা:) তাদেরকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। এটা টের পেয়েই কাফিররা মুসলমানদেরকে বিরত রাখার জন্যে জুলুমের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল এবং যাতে মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে, সে জন্যে সর্বোত ভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মুসলমানেরা তাদের ধন প্রাণ ও সন্তান-সন্ততির জীবন বিপন্ন করেও নিছক দ্বীনের খাতিরে দেশ ত্যাগ করাকেই পছন্দ করলো। কোন প্রলোভন বা ভয়-ভীতিই তাদেরকে এই সংকল্প থেকে বিরত রাখতে পারলো না। ক্রমান্বয়ে বহু সাহাবী মদিনায় চলে গেলেন। এখন হযরত(সা:)এর সঙ্গে থেকে গেলেন শুধু হযরত আবু বকর(রা:) এবং হযরত আলী(রা:)। আর থাকলো দারিদ্র্য ও শারীরিক অক্ষমতা হেতু সফর করতে অসমর্থ এমন কিছু সংখ্যক মুসলমান।

হযরত (সা:) কে হত্যা করার সলা-পরামর্শ

এভাবে নবুয়্যাতের ত্রয়োদশ বছরের সুচনা পর্যন্ত বহু সাহাবী মদীনায় হিজরত করলেন। কুরাইশরা দেখতে পেল মুসলমানরা একে একে মদীনায় গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং সেখানে ইসলাম ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। এর ফলে তারা অত্যন্ত শংকিত হয়ে উঠলো এবং ইসলামকে চিরতরে খতম করে ফেলার পন্থা সর্ম্পকে চিন্তা-ভাবনা করলে লাগলো। সাধারন জাতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও সলা-পরামর্শ করার জন্যে 'দারুন্নদ্ওয়া' নামে তাদের একটি জায়গা নির্দিষ্ট ছিলো। সেখানে প্রত্যেক গোত্রের প্রধান ব্যক্তিগণ জমায়েত হলো এবং এই আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করার জন্যে কি পন্থা অবলম্বন করা যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো। কেউ কেউ পরামর্শ দিলো : মুহাম্মদ (সাঃ)-কে শৃংখলিত করে কোন ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা উচিত। কিন্তু কেউ কেউ মত প্রকাশ করলো যে, মুহাম্মদ (সাঃ) - এর সঙ্গী-সাথীগণ হয়তো আমাদের কাছ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এবং তার ফলে আমাদের পরাজয়ও ঘটতে পারে; এজন্যে উক্ত পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করা হলো। কেউ কেউ আবার পরামর্শ দিলো যে, তাঁকে নির্বাসিত করা উচিত। কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) যেখানে যাবেন সেখানেই তাঁর অনুগামী বাড়তে থাকবে এবং তাঁর আন্দোলনও যথারীতি সামনে অগ্রসর হবে; এ আশংকায় উক্ত পরামর্শও নাকচ করা হলো। অবশেষে আবু জেহেল পরামর্শ দিলো : 'প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক মনোনীত করা হবে; এরা সবাই এক সঙ্গে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর হামলা করবে এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এর ফলে তাঁর রক্ত সকল গোত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। আর সমস্ত গোত্রের সঙ্গে একাকী লাড়াই করা হাশিমী খান্দানের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হবে না।' এ অভিমতটি সবাই পছন্দ করলো এবং শেষ পর্যন্ত এ কাজের জন্যে একটি রাত ও নির্দিষ্ট করা হলো। সিদ্ধান্ত করা হলো যে নির্দিষ্ট রাতে মনোনীত ব্যক্তিগণ হযরত (সা:) এর বাসভবন ঘেরাও করে থাকবে।

amarboi.org

amarboi.org

ভোরে তিনি যখন বাইরে বেরোবেন ,তখন তারা আপন কর্তব্য সমাধা করবে। এরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ এই যে, আরবরা রাতের বেলায় অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করাকে পছন্দ করতো না।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার কৃপায় দুশমনদের ঐসব গোপন অভিসন্ধির কথা হযরত (সা:) এর কাছে যথারীতি পৌঁছতে থাকে। অতঃপর সেই প্রতিক্ষিত সময়টি এলো,যখন তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় গমন করার জন্যে ওহী যোগে নির্দেশ পেলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিজরতের দুদিন আগে থেকেই তিনি আবু বকর সিদ্দিক (রা:) এর সঙ্গে এ সম্পর্কে পরামর্শ করেন এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তার সাথে হযরত আবু বকর(রা:) ও গমন করবেন। সফরের জন্যে দুটি উষ্ট্রী ঠিক করা হলো এবং কিছু পাথেয়ও তৈরি করা হলো।

মক্কা থেকে রওয়ানা

কাফির কুরাইশগণ হযরত(সা:) কে হত্যা করার জন্যে যে রাতটি নির্দিষ্ট করেছিল, সেই রাতেই তিনি আলী(রা:) কে ডেকে বললেন :'আমি হিজরতের নির্দেশ পেয়েছি এবং আজ রাতেই মদিনা রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি । আমার কাছে বহু লোকের আমানত জমা রয়েছে। এগুলো তুমি প্রত্যুষে লোকদের কাছে প্রত্যার্পণ করে দিয়ো। আর আজ রাতে তুমি আমার বিছানায় থেকো,যেন আমি ঘরে আছি ভেবে লোকেরা নিশ্চিন্ত থাকে।

কুরাইশরা ইসলাম বৈরিতার কারণে হযরত(সা:) এর রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল; কিন্তু এ অবস্থায়ও তারা হযরত(সা:) কে এতোখানি আমানতদার ও বিশ্বাসভাজন মনে করতো যে, তাদের নিজ নিজ আমানত ও মাল-মাত্তা এনে তার কাছে জমা রাখতো।

নির্দিষ্ট রাতে কাফিররা হযরত(সা:) এর গৃহ ঘেরাও করলো। রাত যখন গভীর হলো , হযরত(সা:) নিরবে ও নিশ্চিন্তে ঘর থেকে বের হলেন । সে সময় তিনি সূরা ইয়াছিনের একটি আয়াত (فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) পাঠ করছিলেন। তিনি এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে 'শাহাতিল ওজুহ '(মুখমন্ডল আচ্ছন্ন হয়ে যাক) কথাটি বলে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে নিবিঘ্নে বেরিয়ে গেলেন। সে সময় আল্লাহর কুদরতে অবরোধকারি গণ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো; ফলে তারা হযরত(সা:) কে বেরিয়ে যেতে দেখতে পেলো না।প্রথমে তিনি হযরত আবু বকর (রা:) এর গৃহে গমন করলেনএবং সেখান থেকে তাকে নিয়ে মক্কার বাইরে গিয়ে সওর পর্বত গুহায় আশ্রয় নিলেন।

ভোরবেলা কাফিরগণ দেখতে পেলো, হযরত (স) মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন। তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো এবং তাঁর সন্ধানে চারদিকে ছুটাছুটি শুরু করলো। একবার তারা খুঁজতে খুঁজতে' সওর'পর্বত তাদের পদধ্বনি শুনে হযরত আবু বকর (রা) কিছুটা বিচলিতও হয়ে উঠলেন। তার কারণ,তার নিজের জীবন সম্পর্কে তার কোন ভয় ছিল না;বরং হযরত(সা:)- এর ওপর না জানি কোন বিপদ এসে যায় এই ছিল তার আশংকা । তার এই অস্থিরতা লক্ষ্য করে হযরত(স)অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে বললেনঃ'লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা' - ঘাবড়িও না,আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। কার্যত তা-ই হলো।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে গুহামুখে এমন কতকগুলো নিদর্শন ফুটে উঠলে যে, তা দেখে কাফিররা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। তাদের মনে ধারণা জন্মালো যে , এ গুহার ভেতরে কেউ প্রবেশ করে নি।

হযরত আবু বকর(রা:)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ তখন বয়সে নবীন। তিনি রাতের বেলায় হযরত(সা:) ও সিদ্দিক (রা:)-এর কাছে থাকতেন এবং ভোরে মক্কায় এসে কাফিরদের শলা-পরামর্শ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে গুহায় ফিরে গিয়ে বুজর্গদ্বয়কে অবহিত করতেন। কয়েক রাত যাবত হযরত আবু বকর(রা:)-এর গোলাম বকরীর দুধ নিয়ে যেত, কখনো বা ঘর থেকে কিছু খাবার নিয়ে পৌঁছতো। এভাবে তিন রাত পর্যন্ত হযরত(সা:) ও সিদ্দিক(রা:) সেখানে অবস্থান করলেন।

চতুর্থ দিন হযরত(সা:) সওর পর্বত গুহা থেকে বেরোলেন এবং পুরো এক রাত এক দিন তারা সমানে পথ চললেন। সফরের জন্যে আবু বকর(রা:) আগে থেকেই দুটি উষ্ট্রী ঠিক করে রেখেছিলেন। পথ বাতলানোর জন্যে একশো জানাশোনা লোকও নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। পরদিন দুপুর বেলা রোদের তেজ প্রখর হয়ে উঠলে বিশ্রামের জন্যে একটি বৃহদাকার পাথরের ছায়ায় তারা কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। অদূরেই একটি গোয়ালা ছিল ; তার বকরী থেকে হযরত(সা:) দুধ পান করলেন।অতঃপর সেখান থেকে তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। তিনি সামনে পা বাড়াতেই সোরাকা বিন জাশিম নামক

amarboi.org

amarboi.org

জনৈক্য কুরাইশ হঠাৎ তাকে দেখে ফেললো।এই লোকটি পুরস্কারের লোভে হযরত(সা:) এর সন্ধানে বেরিয়েছিল। সে হযরত(সা:) কে দেখতে পেয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিন্তু ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সে আবার নিজেকে সামলে নিল এবং হযরত(সা:) এরওপর হামলাকরার জন্যে তৈরি হলো। কিন্তু এবারও সামনে এগুতেই তার ঘোড়া হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে বসে গেল। এবার সোরাকা শংকিত হয়ে উঠলো এবং বুঝতে পারলো। ব্যাপারটা মোটেই সুবিধাজনক নয়। তার পক্ষে মুহাম্মদ(সা:) এর ওপর হামলা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লো এবং হযরত(সা:) এর কাছে আত্মসমার্পণ করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলো। হযরত(সা:) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এও ছিল হযরত(সা:) এর একটি মু'জিযা।

মদিনায় শুভাগমন

হযরত(সা:) এর আগমন বার্তা পূর্বেই পৌঁছেছিল গোটা শহরই তার শুভাগমনের জন্যে প্রতিক্ষমান ছিল। ছোট-বড় সবাই প্রতিদিন সকালে শহরের বাইরে গিয়ে জমায়েত হতো এবং দুপুর পর্যন্ত ইন্তেজার করে ফিরে আসতো। অবশেষে একদিন তাদের সেই প্রতিক্ষিত শুভ মুহূর্তটি এসেই পড়লো। দূর থেকে হযরত (সা:) এর আসবার আলামত দেখে গোটা শহরটি তকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। প্রতিটি প্রতিক্ষাকারী হৃদয় উজার করে তাকে স্বাগত জানালো। মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে 'কুবা' নামক স্থানে আনসারদের অনেকগুলো খান্দান বসবাস করতো। এদের মধ্যে আমর ইবনে আওফের খান্দান টি ছিল সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয়। কুলসুম বিন আল হাদাম ছিলেন এদের প্রধান ব্যক্তি। এর পরম সৌভাগ্য যে, দো-জাহানের নেতা সবার আগে এরই আতিথ্য কবুল করেন এবং কুবাই এর গৃহেই অবস্থান করেন। হযরত (সা:) এর রওয়ানার তিন দিন পর হযরত আলী(রা:) মক্কা থেকে যাত্রা করেছিলেন ; তিনিও এখানে এসে হযরত (সা:) এর সঙ্গে মিলিত হলেন।

কুবায় হযরত (সা:) শুভাগমন করেন নবুয়্যাতের ত্রয়োদশ বছরের ৮ রবিউল আওয়াল (মুতাবেক ২০সেপ্টেম্বর , ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)।এখানে অবস্থানকালে তার পয়লা কাজ ছিল একটি মসজিদ নির্মাণ করা । তিনি তার পবিত্র হস্ত দ্বারা এইমসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং অন্যসাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে এর নির্মানকাজ সম্পূর্ণ করেন। কয়েকদিন অবস্থান করে তিনি শহরের দিকে রওয়ানা করলেন। দিনটি ছিল শুক্রবার । পথে বনী সালেমের মহল্লা পর্যন্ত পৌঁছলে জুহর নামাজের সময় হলো। এখানে তিনি সর্বপ্রথম জুম'আর খুতবা প্রদান করেন এবং প্রথম বার জুম'আর নামাজ পড়ালেন।

মদিনায় প্রবেশকালে প্রতিটি আত্মোৎসর্গী মুসলিমের হৃদয়েই তার মেহমানদারীর সৌভাগ্য লাভের আকাঙ্খা জাগলো। তাই প্রত্যেক গোত্রের লোকই তার সামনে এসে আবেদন জানাতে লাগলো :'হুযুর, এই হচ্ছে আপনার ঘর, অনুগ্রহ করে এখানে আপনি অবস্থান করুন। লোকদের মধ্যে এতখানি আগ্রহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হলো যে প্রতিটি হৃদয়ই যেন পথের ফরাশে পরিণত হলো; প্রতিটি হৃদয়ই উৎসর্গীকৃত হবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো। এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত গৃহের ছাদে উঠে গাইতে লাগলোঃ

চন্দ্র উদিত হয়েছে,
বিদা পর্বতের ঘাঁটি থেকে, খোদার শোকর আমাদের কর্তব্য, ,
যতক্ষণ প্রার্থনাকারীরা প্রার্থনা করে। ,
কিশোরী বালিকারা দফ বাজিয়ে বাজিয়ে গাইতে লাগলোঃ ,
আমরা নাজ্জার খান্দানের বালিকা ,
(আর) মুহাম্মদ(সা:) আমাদের কত উত্তম পড়োশী! ,
হযরত(সা:) বালিকাদের জিজ্ঞেস করলেন 'তোমরা কি আমায় ভালোবাস ? তারা বললো ,হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ 'আমিও তোমাদের ভালোবাসি।'

মদিনায় অবস্থান

হযরত(সা:) এর মেহমানদারীর সৌভাগ্য কে লাভ করবে? এমন একটি প্রশ্ন যে এর মিমাংসা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। হযরত বললেন যে, আমার উষ্ট্রী যার গৃহের সামনে দাঁড়াবে , এ খেদমত সেই আঞ্জাম দিবে। ' ঘটনাক্রমে এ সৌভাগ্য টুকু হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এর ভাগ্যে পড়লো। বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত , তার নিকটেই ছিল তার গৃহ। গৃহটি ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট । তিনি হযরত (সা:) এর থাকবার জন্যে ওপরের তলাটি পেশ করেন। কিন্তু লোকদের আসা-যাওয়ার সুবিধার্থে হযরত (সা:) নিচের তলায় থাকা পছন্দ করলেন্ হযরত আবু আইয়ুব এবং তার স্ত্রী নিচের তলা ছেড়ে

amarboi.org

amarboi.org

ওপরের তলায় চলে গেলেন। এখানে হযরত(সা:) সাত মাস কাল অবস্থান করলেন। এরপর তার বসবাসের জন্যে মসজিদে নববীর নিকটে একটি কোঠা নির্মিত হলো এবং সেখানেই তিনি স্থানান-রিত হলেন। কয়েক দিনের মধ্যে তার খান্দানের অন্যান্য লোকও মদিনায় চলে এলো ।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

মদিনায় আগমনের পর সবচেয়ে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল একটি মসজিদ নির্মাণ করা। হযরত (সা:) যেখানে অবস্থান করছিলেন, তার নিকটেই দুই ইয়াতিমের কিছু অনাবাদী জমি ছিল। নগদ মূল্যে তাদের কাছ থেকে এই জমিটি খরিদ করা হলো। তারই ওপর মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হলো। এবারও হযরত(সা:) সাধারণ মজুরের ন্যায় সবার সাথে মিলে কাজ করলেন। স্বহস্থে তিনি ইট-পাথর বয়ে আনলেন। মসজিদটি অত্যন্ত সাদাসাদি ভাবে নির্মিত হলো। কাঁচা ইটের দেয়াল, খেজুর গাছের খুঁটি এবং খেজুর পাতার ছাদ - এই ছিল এর উপকরণ। মসজিদের কিবলা হলো বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে। কেননা, তখন পর্যন্ত মুসলমানদের কিবলা ছিল ঐ দিকে। অতঃপর কিবলা কা'বামুখী হলে তদনুযায়ী মসজিদের সংস্কার করা হলো। মসজিদের একপাশে একটি উঁচু চত্বর নির্মিত হলো। এর নাম রাখা হলো ' সুফফা'। যে সব নও মুসলিমের কোন বাড়ি-ঘর ছিলো না। এটি ছিল তাদের থাকবার জায়গা।

মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে তার নিকটেই হযরত (সা:) তার স্ত্রীদের জন্যে কয়েকটি কোঠা তৈরি করে নিলেন। এগুলো কাঁচা ইট এবং খেজুর গাছ দ্বারা নির্মিত হলো। এই ঘরগুলো ছয়-সাত হাত করে চওড়া এবং দশ হাত করে লম্বা ছিল। এর ছাদ এতোটা উঁচু ছিল যে, একজন লোক দাঁড়ালে তা স্পর্শ করতে পারতো। দরজায় ঝুলানো ছিল কম্বলের পর্দা।

হযরত(সা:) এর গৃহের নিকটে যে সব আনসার বাস করতো, তাদের ভিতরকার স্বচ্ছল লোকেরা তার খেদমতে কখনো তরকারী , কখনো বা অন্য কিছু পাঠাতো। এর দ্বারাই তার দিন গুজরান হতো; অর্থাৎ সংকটের ভেতর দিয়েই তার জীবন-যাত্রা নির্বাহ হতো।

ভাই ভাই সম্বন্ধ

মক্কা থেকে যে সব মুসলমান ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে মদিনায় চলে এসেছিল, তাদের প্রায় সবাই ছিল সহায় সম্বলহীন। তাদের মধ্যে যারা স্বচ্ছল ছিল, তারাও নিজেদের মাল-পত্র মক্কা থেকে আনতে পারেন নি। তাদের সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে একদম রিক্ত হস্তেই আসতে হয়েছিল। এই সব মুহাজির যদিও মুসলমানদের (আনসার) মেহমান ছিলো, তথাপি এদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল । তাছাড়া এরা নিজেরাও স্বহস্থে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে ভালবাসতো। তাই মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে একদিন হযরত (সা:) আনসারদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি এবং মুহাজিরদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, 'আজ থেকে তোমরা পরস্পর ভাই ।' এভাবে সমস-মুহাজিরকে তিনি আনসারদের ভাই বানিয়ে দিলেন। তার ফলেই আল্লাহর এই খাঁটি বান্দাগণ শুধু ভাই-ই নয়, পরস্পরে ভাইয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হলেন। আনসারগণ মুহাজিরদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে গেল এবং তাদের সামনে নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি ও সামান-পত্রের হিসাব করে বললো : 'এর অর্ধেক তোমাদের আর অর্ধেক আমাদের।' এভাবে বাগানের ফল, ঘরের সামান, বাসগৃহ, সম্পত্তি - মোটকথা, প্রতিটি জিনিসই সহোদর ভাইদের মতো বিভক্ত হলো। ফলে আশ্রয়হীন মুহাজিরগণ সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হলো। তারা যথারীতি ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করলো, দোকান-পাট খুললো এবং অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হলো। এভাবে মুহাজির পুনর্বাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলো এবং এদিক দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত হলো।

amarboi.org

amarboi.org

নবপর্যায়ে ইসলামী আন্দোলন

হিজরতের আগে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছিল মক্কার মুশরিকদের কাছে। তাদের কাছে এটা ছিল একটি অভিনব জিনিস। কিন্তু হিজরতের পর সমস্যা দেখা দিল মদিনার ইহুদীদের নিয়ে। এরা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ফেরেশতা, ওহী ইত্যাদি বিশ্বাস করতো এবং একজন পয়গম্বরের (হযরত মূসার) উম্মত হিসাবে খোদার তরফ থেকে আগত একটি শরীয়াতের অনুগামী হবারও দাবিদার ছিল। নীতিগত ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা:) যে দ্বীন-ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তাদেরও প্রকৃত দ্বীন ছিল তা-ই। কিন্তু শতাব্দী কালের অনাচার ও বেপরোয়া আচরণের ফলে তাদের ভেতর নানারকমের দোষ-ত্রুটি দেখা দিয়েছিল ।তাদের জীবন প্রকৃত খোদায়ী শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং তাদের ভেতর অসংখ্য কুসংস্কার , বিদয়াত ,ও কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ।তাদের কাছে তওরাত কিতাব ছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে তারা বহু মানবীয় কালাম শামিল করে নিয়েছিল। তবুও তার মধ্যে খোদায়ী বিধি-বিধান যা কিছু বাকী ছিল , তাও মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ছাঁচে ফেলে তারা ওলট-পালট করে দিয়েছিল। এভাবে খোদার দ্বীনের সাথে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সামাজিক দিক দিয়ে তাদের ভেতর মারাত্মক সব দোষ-ত্রুটি শিকড় গেড়ে বসেছিল। আল্লাহর কোন বান্দাহ যদি তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চাইতো, তার কোন কথা পর্যন্ত তারা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। বরং তাকে তারা ঘোরতর দুশমন বলে মনে করতো এবং তার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা চালাতো। যদিও তারা মিলগতভাবে মুসলিমই ছিল, তবুও তাদের এতখানি পতন ঘটেছিল যে, তাদের আসল দ্বীন কি ছিল , তা তাদের নিজেদেরই স্মরণ ছিল না।

এদিক দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সামনে শুধু দ্বীন-ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বুনিয়াদী প্রচারের কাজই ছিলনা, বরং ঐসব বিভ্রান্ত মুসলমানের ভেতর পুনরায় দ্বীনি ভাবাদর্শ জাগ্রত করার দায়িত্বও বর্তমান ছিল। তাছাড়া হযরত (সা:) এর আগমনের পর মুসলমানেরা ক্রমান্বয়ে চারদিক থেকে এসে মদিনায় জমায়েত হচ্ছিল এবং এই সব মুহাজির ও মদিনার আনসার গণ মিলে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির ইসলামী রাষ্ট্রেরও ভিত্তি পত্তন করেছিল। ৩৭ এ কারণে আন্দোলনকে এ যাবত শুধু আদর্শ প্রচার, আকীদা-বিশ্বাসের সংস্কারে এবং কিছু নৈতিক শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করতে হলেও, এখন সামাজিক জবিনধারার সংস্কার, প্রশাসনিক আইন-কানুন প্রণয়ন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা জারির প্রয়োজন দেখা দিলো। সুতরাং এবার এদিকে পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া হলো।

এ সময় আরো একটি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হলো। এই পর্যন্ত কুফরী পরিবেশেই ইসলামী দাওয়াত পেশ করা হচ্ছিলো এবং এরই ভেতর থেকে মুসলমানরা কাফিরদের জুলুম-পীড়ন বরদাশত করছিরো। কিন্তু এবার তারা ক্ষুদ্রাকৃতির হলেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করলো যা চারদিকে দিয়েই ছিলো কাফিরদের দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই ব্যাপারটি এখন আর শুধু উৎপীড়ন আর হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না, বরং গোটা আরব উপদ্বীপই এবার সংকল্পগ্রহণ করলো যে, এই নগন্য দলটিকে যতো শীঘ্র সম্ভব খতম করে দিতে হবে; নচেৎ ইসলামের এই কেন্দ্রটি শক্তি অর্জন করতে শুরু করলে তাদের জন্যে দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত থাকবে না। তাই নিজেদের এবং আন্দোলনের নিরাপত্তার তাগিদে এই নয়া ইসলামী দলের সামনে জরুরী কর্তব্য হয়ে দেখা দিলো :

১. পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জিদের আদর্শ প্রচার করা, দলিল প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতা প্রতিপন্ন করা এবং যতো বেশি সম্ভব লোকদেরকে এর সমর্থক বানানোর চেষ্টা করা;

২. বিরুদ্ধবাদীগণ যে সব আকীদা-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিলো, যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে তার অসারতা প্রমাণ করা, যেনো বিবেকের আলোয় কেউ কিছু বুঝতে চাইলে প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে তাকে কোনো বেগ পেতে না হয়:

৩. ঘরবাড়ি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নষ্ট করে যারা এই নতুন রাষ্ট্রে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের জন্যে শুধু বসবাসের ব্যবস্থাই নয়, বরং তাদেরকে উন্নত মানের নৈতিক ও ঈমানী শিক্ষা দান করা, যেনো চরম দুঃখ-দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তার মধ্যেও তারা পূর্ণ ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারে এবং কোনো কঠিনতর অবস্থায়ও তাদের পা কেঁপে না ওঠে;

amarboi.org

amarboi.org

৪. মুসলমানদেরকে চরম প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত করা, যাতে করে তাদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধবাদীগণ কোনো সশস্ত্র হামলা চালালে নিজেদের দুর্বলতা ও অস্ত্রপাতির দৈন্য সত্ত্বেও তারা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে এবং আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সত্যতা সম্পর্কে গভীরতর প্রায় ও খোদার প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতার কারণে ময়দান থেকে কখনো পশ্চাদপসারণ না করে;

৫. যে সব লোক নানাভাবে বুঝানো সত্ত্বেও ইসলামের কাঙ্খিত জীবন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠার পথে বাদ সাধবে, তাদেরকে প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ করে ময়দান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে আন্দোলনের অনুর্বর্তীদের মধ্যে পূর্ণ হিম্মত ও সৎ সাহস পয়দা করা।

ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি

মদীনার প্রায় চারদিকেই ইহুদীদের বসতি ছিলো।৩৮এদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণেরও প্রয়োজন ছিলো। কারণ মুসলমানদের মক্কা ত্যাগের কথা জানতে পেরে কাফির কুরাইশগণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেনি, বরং মুসলমানদের একটি সংঘবদ্ধ দলকে মদীনায় একত্রিত হতে দেখেই তারা ইসলামের এই নয়া কেন্দ্রকে আপন শক্তি ও প্রভাবে মিটিয়ে দেবার পন্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিলো। এ কারণেই মদীনার চার দিককার ইহুদী বাসিন্দাদের সথে একটা স্পষ্টতর রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলো, যেনো মক্কার মুশরিকগণ কোনো হামলা চালালে ইহুদীদের ভূমিকাটা অনুমান করা যেতে পারে। তাই মদীনা ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রগুলোর সঙ্গে হযরত (স) নিরপেক্ষতার চুক্তি সম্পাদন করলেন। অর্থাৎ কুরাইশ বা অন্য কেউ যদি মদীনার মুসলমানদের ওপর হামলা করে, তাহলে এরা না মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করবে আর না তাদের শত্রুপক্ষকে সমর্থন করবে; আর কারো সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করা হলো যে, যদি মুসলমানদের ওপর কেউ হামলা করে, তাহলে তারা মুসলমানদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে।

মুনাফিক

এ সময় মদীনায় ইসলামী আন্দোলনকে কতকগুলো নতুন সমস্যার মুকাবিলা করতে হলো। এর মধ্যে মুনাফিকদের সমস্যাটি ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মক্কায় শেষ পর্যায়ে এমন কিছু লোক ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো, যারা ইসলামী দাওয়াতকে সম্পূর্ণ সত্য বলে জানতো বটে, কিন্তু ঈমানের দুর্বলতাবশত ইসলামের খাতিরে পার্থিব স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলো না। চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্নীয়তা ইত্যাদি প্রায়শ ইসলামের দাবি পূরণের পথে তাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু মদীনায় আসার পর এমন কিছু লোকও ইসলামী সংগঠনে অনুপ্রবেশ করলো, যারা আদতেই ইসলামে বিশ্বাসী ছিলো না। এরা নিছক ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ইসলামী সংগঠনে শামিল হয়েছিল। আবার কিছু লোক অক্ষমতা হেতু নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করতো। এদের হৃদয় যদিও ইসলাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল না। কিন্তু নিজ গোত্র বা খান্দানের বহু লোক মুসলমান হবার ফলে এরা বাধ্য হয়ে মুসলমানের দলে শামিল হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আরো কিছু সুযোগ সন্ধানী লোকও ইসলামী সংগঠনে ঢুকে পড়েছিল । এরা একদিকে মুসলমানদের সঙ্গী হয়ে পার্থিব ফায়াদা হাসিলের চিন্তা করতো, অন্যদিকে কাফিরদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতো। এদের চেষ্টা ছিল ইসলাম ও কুফরের সংঘর্ষে যদি ইসলামী বিজয়ী হয়, তাহলে এরা যেন ইসলামের মধ্যে আশ্রয় পেতে পারে আর যদি কুফর জয়লাভ করে , তবুও যেন এদের স্বার্থ নিরাপদ থাকে।

ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে এই মিত্রবেশী শত্রুরাই ছিল সবচেয়ে বেশি অসুবিধার কারণ। এদের সঙ্গে কাজ-কারবার করা মোটেই সহজতর ছিল না। মদিনার গোটা জীবনে এই শ্রেণীর লোকদের সৃষ্ট ফিতনার কিভাবে মুকাবেলা করা হয়, যথাস্থানে তা আলোচিত হবে। এখানে শুধু ঐ শ্রেণীর মুনাফিক আর সাচ্চা মুমিনদের তুলনামূলক পরিচয়টা জেনে রাখারই প্রয়োজন বেশি। কারণ এইসময় ইসলামী আন্দোলন কে এক সংকটজনক পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে হয় এবং এ কারণেই যেসব লোক পুরানো বিদ্বেষ এবং ইসলাম বিমুখ চিন্তাধারা আঁকড়ে ধরে ছিল অথবা যাদের ঈমান কোন দিক দিয়ে দুর্বল ছিল , আন্দোলন থেকে তাদের সরে পড়বার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

amarboi.org

amarboi.org

কিবলা পরিবর্তন

এ যাবত ইসলামের কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। এদ্দিন ঐদিকে মুখ করেই মুসলমানরা নামায পড়তো। বায়তুল মুকাদ্দাসের সাথে ইহুদীদের সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠতর । এরাও ঐদিকে মুখ করে উপাসনা করতো। দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে একদিন ঠিক নামাজের মধ্যে কিবলা পরিবর্তন করার নির্দেশ এলো এবং তখন থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের বদলে কা'বাকে মুসলমানদের কিবলা বলে ঘোষণা করা হলো। তাই হযরত (সা:) নামাজের মধ্যেই তার মুখ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । খোদ আল্লাহ তাআলা এর গুরুত্ব নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ

''আমরা কা'বাকে তোমাদের কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছি। এর কারণ হচ্ছে, কে পয়গম্বরের অনুবর্তী আর কে পশ্চাদপসরণকারী , তা যাচাই করে নেয়া''।

এর দ্বারা এ সত্য ঘোষিত হলো যে, এ যাবত দুনিয়ার নৈতিক এবং ঈমানী নেতৃত্বের যে দায়িত্ব ইহুদীদের ওপর ন্যস্ত ছিল , তা থেকে তাদেরকে অপসারণ করা হয়েছে। কারণ তারা এ দায়িত্ব পালন করেনি এবং এ নিয়ামতটির কদরও বুঝতে পারেনি। তাই তাদের বদলে এ খেদমতের দায়িত্ব এখন উম্মতে মুসলিমার ওপর ন্যস্ত করা হলো। তারা এই কর্তব্য পালন করে যাবে।

এই ঘটনার প্রভাবে বহু কপট মুসলমানেরই -যাদের হৃদয়ে ঈমানের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি - মুখোশ খসে পড়লো। তারা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর এই কার্যের তীব্র সমালোচনা করলো। এর ফলে ইসলামী আন্দোলনে এইসব লোকের ভূমিকা কি, তাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। এভাবে বহু দো-দিল বান্দাহ ইসলামী সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং এই শ্রেণীর মিত্ররুপী শত্রুদের দুষ্ট প্রভাব থেকে আন্দোলনও বহুলাংশে মুক্ত হলো।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরক্ষা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কার অদূরবর্তী আকাবা নামক স্থানে মদিনার কিছু লোক হযরত (সা:) এর কাছে আনুগত্যে শপথ গ্রহণ করেছিল। তারা হযরত (সা:) এবং তার সঙ্গী-সাথীদের মদিনায় চলে আসবার জন্যে তার খেদমতে একটি প্রস্থাবও পেশ করেছিল। তখনই এ আশংকা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যে, এইশপথও প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে তামাম আরব উপদ্বীপের প্রতি মদিনাবাসীদের একটি চ্যালেঞ্জ স্বরুপ।এ ব্যাপারে শপথ গ্রহণকারীদের অন্যতম পুরোধা হযরত আব্বাস বিন উবাদাহ (রা:) তার সাথীদের উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন, আজো তা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেঃ 'তোমরা কি জানো, এই ব্যক্তির কাছে তোমরা কি জিনিসের শপথ গ্রহণ করছো ? তোমরা এর কাছে শপথ গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছো। সুতরাং তোমরা যদি ধারণা করে থাকো যে, তোমাদের জান-মাল ও সম্ভ্রান- ব্যক্তিগণ বিপন্ন হয়ে পড়লে একে একে দুশমনদের হাতে সোপর্দ করে দিবে, তাহলে আজই একে পরিত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে উত্তম। কেননা খোদার কসম ,দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ের পক্ষেই এটা চরম অবমাননাকর। পক্ষান্তরে তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এ-ই হয় যে, তোমাদের জান-মাল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিপন্ন হলেও তোমরা তাকে রক্ষা করবে,তাহলে নিসন্দেহ এর হাত তোমরা আঁকড়ে ধরো। খোদার কসম,এটা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর।' এ সময় গোটা

amarboi.org

amarboi.org

প্রতিনিধিদলই সম্মিলিতভাবে বলেছিলেন : 'আমরা একে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের জান-মাল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতেও প্রস্তুত আছি। ' এবার মদিনাবাসীদের সেই প্রতিশ্রুতিরই সত্যতা যাচাইয়ের সময় এলো।

কুরাইশদের বিপদ

মদিনায় মুসলমান এবং হযরত(সা:) এর স্থানান্তরিত হবার অর্থ ছিল এই যে, এবার ইসলাম অন্তত দাঁড়াবার মতো একটি জায়গা পেলো এবং মুসলমানরাও বারবার ধৈর্যের পরীক্ষা দেবার পরিবর্তে একটি সুসংহত সমাজ সংগঠনে পরিণত হলো। কুরাইশদের পক্ষে এ ছিল একটি কঠিন বিপদের ইঙ্গিত । তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলো, এভাবে ইসলামী সংগঠনের শক্তি সঞ্চয় প্রকৃতপক্ষে তাদের জাহিলী ব্যবস্থারই মৃত্যু ঘটার শামিল। এ ছাড়া আরও একটি কঠিন আশংকা তাদেরকে অস্থির করে তুলেছিল । তাহলো এই যে, মক্কাবাসীদের জীবিকার একটি বড় উপায় ছিল ইয়েমেন ও সিরিয়ার বাণিজ্য। আর লোহিত সাগরের তীর দিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত যে বানিজ্য-পথ ছিলো, মদিনা ঠিক তারই ওপর অবস্থিত। সুতরাং মদিনায় মুসলমানদের শক্তি অর্জনের অর্থ ছিলোঃ মুসলমানদের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কুরাইশদেরকে সিরিয়ায় বানিজ্যিক সুবিধা ভোগ করতে হবে। নতুবা মুসলিম শক্তিকে চিরতরে খতম করে দিয়ে ঐ পথে তাদের ব্যবসায়ের পণ্য চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ কারণেই হিজরতের আগে মুসলমানরা যাতে মদিনায় গিয়ে জমায়েত হতে না পারে, সেজন্যে কুরাইশরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তারা এই ক্রমবর্ধমান বিপদকে যেভাবে হোক, চিরতরে মিটিয়ে ফেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

কুরাইশদের চক্রান্ত

আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিলো মদীনার একজন প্রভাবশালী ইয়াহূদী সর্দার। হিজরতের আগে মদীনাবাসীগণ তাকে নিজেদের বাদশা নিযুক্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কিন্তু বিপুল সংখ্যক মদিনাবাসীর ইসলাম গ্রহণ এবং মক্কা থেকে হযরত (সা:) এর মদিনায় আগমনের ফলে এই পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আব্দুল্লাহ বিন উবাইর আশা আকাঙ্ক্ষাও পণ্ড হয়ে যায়। এমনি সময় মক্কাবাসীগণ তাকে এই মর্মে একটি চিঠি লিখলোঃ'তোমরা আমাদের লোকদেরকে আশ্রয় দান করেছো। আমরা খোদার কসম করে বলছি, হয় তোমরা নিজেরা লড়াই করে ওখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দাও , নচেত আমরা সবাই মিলে তোমাদের ওপর হামলা চালাবো; তোমাদের পুরুষদের কে হত্যা করবো এবং মেয়েদেরকে বাঁদি বানিয়ে রাখবো।' এই চিঠিখানি আবদুল্লাহ বিন উবাইর হতাশ মনে কিছুটা আশার সঞ্চার করলো। কিন্তু হযরত (সা:) যথাসময়ে তার নষ্টামি প্রতিরোধ করার জন্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলেন। তিনি তাকে এই বলে বুঝালেন যে, 'তুমি কি আপন পুত্র এবং ভাইদের সঙ্গে লড়াই করতে চাও ? যেহেতু মদিনাবাসীদের (আনসার) অধিকাংশই ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল , এজন্যে আব্দুল্লাহ বিন উবাইর শেষ পর্যন্ত তার উচ্চাভিলাস থেকে বিরত হলো।

এসময়েই একবার মদিনার নেতা সা'দ বিন মা'আজ উমরা উপলক্ষে মক্কা গমন করলেন। কা'বার দরজায় আবু জেহেলের সঙ্গে তার সাক্ষাত হলো। আবু জেহেল তাকে বললোঃ 'তোমরা আমাদের ধর্মত্যাগীদের আশ্রয় দান করেছো আর তোমাদেরকে নিশ্চিনে- কা'বা তাওয়াফ করতে দিবো?তুমি যদি উমাইয়া বিন খালাফের মেহমানই না হতে তাহলে এখান থেকে জিন্দা যেতে পারতে না। একথা শুনে সা'দ বললেনঃ খোদার কসম , তোমরা যদি আমায় এতে বাধা দান করো, তাহলে তোমাদের পক্ষে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে (অর্থাৎ মদিনার ওপর দিয়ে বাণিজ্য যাত্রায়) আমি তোমাদেরকে বাধা দিবো। বস্তুত কুরাইশরা কোনরূপ নষ্টামি করলে মদিনার ওপর দিয়ে তাদের বাণিজ্য পথ বন্ধ হয়ে যাবে, এ ছিল তারই সুস্পষ্ট ঘোষণা।

amarboi.org

amarboi.org

কুরাইশদের ওপর চাপ প্রদান

বস্তত এ সময় কুরাইশরা মুসলমান এবং ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে যে পরিকল্পনা আঁটছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে জব্দ করতে হলে তাদের ঐ বাণিজ্য পথটি দখল করে সিরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য পথ বন্ধ করে দেওয়ার চেয়ে উত্তম পন্থা মুসলমানদের কাছে আর কিছুই ছিল না। একমাত্র এহেন চাপের দ্বারাই মক্কাবাসী কুরাইশদের জব্দ করা সম্ভব ছিল। তাই হযরত (সা:) এ বাণিজ্য পথটির নিকটবর্তী ইহুদী বাসিন্দাদের সঙ্গে বিভিন্নরুপ চুক্তি সম্পাদন করে যেমন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তেমনি কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাকে শাঁসানোর জন্যে মাঝে মাঝে মুসলমানদের ছোট ছোট প্রহরী দল ও পাঠানো শুরু করলেন। অবশ্য এইসব প্রহরী দলের দ্বারা না কখনো কোন খুন-খারাবী হয়েছে আর না কোন কাফেলার ওপর লুটতরাজ চলেছে। এদের প্রেরণ করে শুধু কুরাইশদের জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তারা যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক না কেন, হাওয়ার গতি কোন দিকে তা বুঝে শুনেই যেনো গ্রহণ করে। তারা যদি এখনো মুসলমানদের উত্তক্ত করতে চায় , তাহলে তাদেরকেও আপন ব্যবসায় থেকে হাত গুটাতে হবে।

হাযরামীর হত্যা

এরই মধ্যে কুরাইশগণ কখন কি পরিকল্পনা গ্রহণ করে , তা জানবার জন্যে হযরত (সা:) সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথারীতি অবহিত থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন। দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে তিনি বারোজন লোক দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন হাজারকে নাখলার দিকে পাঠালেন। জায়গাটি মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে অবস্থিত । হযরত (সা:) আব্দুল্লাহর হাতে একটি দিয়ে বললেনঃ এটি দু'দিন পরে খুলবে। 'আব্দুল্লাহ যথাসময়ে চিঠিখানা খুলে দেখলেন,'নাখলা নামক স্থানে অবস্থান করো কুরাইশদের অবস্থান জেনে নিয়ে খবর দাও ।' ঘটনাক্রমে কুরাইশদের কতিপয় লোক সিরিয়া থেকে ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে ঐ পথ দিয়ে আসছিল । হযরত আব্দুল্লাহ তাদের মুকাবেলা করলেন। ফলে আমর বিন হাযরামী নামক এক ব্যক্তি নিহত হলো।এছাড়া আরো দুই ব্যক্তি কে বন্ধী করা হলো এবং গনীমতের মাল ও যুদ্ধের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহ করা হলো। হযরত আবদুল্লাহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে এই ঘটনার কথা বিবৃত করে হযরত (স) এর খেদমতে গণীমতের মাল উপস্থাপন করলেন। কিন্তু হযরত (স) এতে বেজায় অসন্তুষ্ট হয়ে বললেনঃ আমি তো তোমাকে এর অনুমতি দেয়নি। তিনি গণীমতের মাল গ্রহণেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

এই দুর্ঘটনায় নিহত ও ধৃত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হলো তারা মুসলমাদের কাছ থেকে রক্তের বদলা নেবারও একটি অজুহাত খুঁজে পেলো।

amarboi.org

amarboi.org

বদর যুদ্ধের পটভূমি

এমনি অবস্থায় দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে (৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী কিংবা মার্চ কুরাইশদের এক বিরাট কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুসলিম অধিকৃত এলাকার কাছাকাছি এসে পৌঁছলো। কাফেলার সঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার আশরাফী মূল্যের ধন-মাল এবং ৩০/৪০জনের মতো তত্ত্বাবধায়ক (মুহাফেজ) ছিল। তাদের ভয় ছিল, মদিনার নিকটে পৌঁছলে মুসলমানরা হয়ত তাদের ওপর হামলা করে বসতে পারে। কাফেলার নেতা ছিল আবু সুফিয়ান। সে এই বিপদাশংকা উপলব্ধি করেই এক ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্যে মক্কায় পাঠিয়ে দিল। ঐ লোকটি মক্কায় পৌঁছেই এই বলে শোরগোল শুরু করলো যে, 'তাদের কাফেলার ওপর মুসলমানরা লুটতরাজ চালাচ্ছে। সুতরাং সাহায্যের জন্যে সবাই ছুটে চলো।'

কাফেলার সঙ্গে যে ধন-মাল ছিল, তার সাথে বহু লোকের স্বার্থ জড়িত ছিল। ফলে এ একটা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হলো। তাই সাহায্যের ডাকে সাড়া দিয়ে কুরাইশদের সমস্ত বড় বড় সর্দারই যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে পড়লো। এভাবে প্রায় এক হাজার যোদ্ধার এক বিরাট বাহিনী তৈরি হয়ে গেল।এই বাহিনী অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শান-শওকতের সঙ্গে মক্কা থেকে যাত্রা করলো। এদের হৃদয়ে একমাত্র সংকল্প :মুসলমানদের অস্তিত্ব এবার নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে, যেন নিত্যকার এই ঝঞ্ঝাট চিরতরে মিটে যায়। বস্তত ,একদিকে তাদের ধন-মাল রক্ষার আগ্রহ , অন্যদিকে পুরনো দুশমনি ও বিদ্বেষের তাড়না - এই দ্বিবিধ ক্রোধ ও উন্মাদনার সঙ্গে কুরাইশ বাহিনী মদিনা আক্রমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।

কুরাইশদের হামলা

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছেও এই পরিস্থিতি সম্পর্কে যথারীতি খবর পৌঁছতে লাগলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এবার সত্যসত্যই মুসলমানদের সামনে এক কঠিন সংকটকাল উপস্থিত হয়েছে। এবার যদি কুরাইশরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয় এবং মুসলমানদের এই নয়া সমাজ-সংগঠনটিকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে সামনে এগোনো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। এমনকি, এর ফলে ইসলামের আওয়াজও হয়তো চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। মদিনায় হিজরতের এ যাবত দুটি বছর ও অতিক্রান্ত হয়নি। মুহাজিরগণ তাদের সবকিছুই মক্কায় ফেলে এসেছে এবং এখনো তারা রিক্তহস্ত । আনসার গণ যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। অন্যদিকে ইহুদীদেরও অনেকগুলো গোত্র বিরুদ্ধতার জন্যে প্রস্তত । খোদ মদিনায় মুনাফিক এবং মুশরিকদের অবস্থিতি এক বিরাট সমস্যার রুপ পরিগ্রহ করেছে। এমনি অবস্থায় কুরাইশরা যদি মদিনা আক্রমণ করে ,তাহলে মুসলমানদের এই মুষ্টিমেয় দলটি হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়েও যেতে পারে। আর হামলা যদি নাও করে বরং আপন শক্তি বলে ,শুধু কাফেলাকে মুক্ত করে নিয়ে যায়,তবুও মুসলমানরা নিবীর্য হয়ে পড়বে। অতঃপর তাদেরকে জব্দ করতে আশ-পাশের গোত্রগুলোকে আর কোন বেগ পেতে হবে না। কুরাইশদের ইঙ্গিতে তারা মুসলমানদের কে নানাভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করবে। এদিকে মদিনার ইহুদী ,মুনাফিক এবং মুশরিকগণও মাথা তুলে দাঁড়াবে। ফলে মুসলমানদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে। এসব কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সা:) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বর্তমানে যতটুকু শক্তিই সঞ্চয় করা সম্ভব ,তা নিয়েই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং মুসলমানদের কে আপন বাহুবল দ্বারা টিকে থাকার অধিকার প্রমাণ করতে হবে।

মুসলমানদের প্রস্তুতি

এই সিদ্ধান্তের পর নবী করীম (সা:) মহাজির ও আনসার গণকে জমায়েত করে তাদের সামনে সমগ্র পরিসি'তি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরলেনঃ'একদিকে মদিনার উত্তর প্রান্তে রয়েছে ব্যবসায়ী কাফেলা আর অন্য দিকে দক্ষিণ দিক থেকে আসছে কুরাইশদের সৈন্য-সামন্ত । আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, এর যেকোন একটি তোমরা লাভ করবে। বলো,তোমরা এর কোনটি মুকাবেলা করতে চাও? জবাবে বহু সাহাবী কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানোর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু নবী করীম (সা:) এর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী । তাই তিনি তার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন। এরপর মুহাজির দের ভেতর থেকে মিকদাদ বিন আমর(রা:) নামক জনৈক্য সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেনঃ'হে আল্লাহর রাসূল ! প্রভু আপনাকে যেদিকে আদেশ

amarboi.org

amarboi.org

করেছেন সেদিকেই চলুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আমরা বনী ইসরাঈলের মতো বলতে চাইনা - যাও তুমি এবং তোমার খোদা গিয়ে লড়াই করো, আমরা এখানে বসে থাকবো। ৪০

কিন্তু এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আনসারদের থেকেও মতামত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল । এজন্যে হযরত (সা:) তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে উল্লিখিত প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন । এরপর হযরত সা'দ বিন মা'আজ (রা:) দাঁড়িয়ে বললেন। হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছি। সর্বোপরি আমরা আপনার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা-ই কার্যে পরিণত করুন। যে মহান সত্ত্বা আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তার কসম , আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে গিয়ে ও ঝাঁপ দেন, তবুও আমরা আপনার সাথে থাকবো এবং এ ব্যাপারে আমাদের একটি লোকও পিছু হঠবে না । আমরা যে শপথ নিয়েছি , যুদ্ধকালে তা হরফে হরফে পালন করবো। সাচ্চা আত্মোৎসর্গীর ন্যায় আমরা শত্রুদের মুকাবেলা করবো। কাজেই আল্লাহ খুবই শিগগিরই আমাদের দ্বারা আপনাকে এমন জিনিস দেখাবেন, যা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। অতএব , আল্লাহর রহমত ও বরকতের ওপর ভরসা করে আপনি আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলুন।

এই বক্তৃতার পর স্থির করা হলো যে, কাফেলার পরিবর্তে সৈন্যদেরই মুকাবেলা করা হবে। কিন্তু এটা কোনো মামুলি সিদ্ধান্ত ছিল না। কারণ কুরাইশদের তুলনায় মুসলমানদের সংগঠন ছিল নেহাত দুর্বল । এর মধ্যে ঘোড়া ছিল মাত্র দু'-তিন জনের কাছে। উট ছিল মাত্র সত্তরটির মতো। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও ছিল অপ্রতুল । মাত্র ষাট ব্যক্তির কাছে ছিল লৌহবর্ম । এ কারণে মাত্র কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাদবাকী সবারই মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তাদের অবস্থা দেখে মনে হতে লাগলো, যেনো জেনে-শুনে তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতে এই দৃশ্যই ফুটে উঠেছেঃ " (হে নবী !) এই লোকগুলো তো আপন বাড়ি ঘর থেকে তেমনি বের হওয়া উচিত ছিল ,তোমার প্রভু যেমন তোমায় সত্য সহকারে তোমার গৃহ থেকে বের করে এনেছেন ; কিন্তু মুসলমানদের একটি দলের কাছে এ ছিল অত্যন্ত অপছন্দনীয় । তারা সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পরও সে সম্পর্কে তোমার সঙ্গে তর্ক করছিল; তাদেরকে যেন দৃশমান মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । (সেই সময়ের কথা) স্মরণ করো ,যখন আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন,(আবু সুফিয়ান ও আবু জেহেলের) দুই দলের মধ্যে থেকে যেকোন একটি তোমাদের করায়ত্ত হবে। আর তোমরা চেয়েছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল(অর্থাৎ নিরস্ত্র)দলটিকে বশীভূত করতে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তিনি আপন বিধানের দ্বারা সত্যকে অজেয় করে রাখবেন এবং কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করে দিবেন, যেন সত্য সত্য হয়েই থাকে এবং মিথ্যা মিথ্যাই থেকে যায় -অপরাধীদের কাছে এটা যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।"

মদিনা থেকে মুসলমানদের যাত্রা

যুদ্ধ সম্ভার ও রসদ পত্রের এই দৈন্য সত্ত্বেও দ্বিতীয় হিজরীর ১২ রমজান নবী করীম (সা:) আল্লাহর ওপর ভরসা করে মাত্র তিনশ'র মতো মুসলমান নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। তারা সোজা দক্ষিণ কোণে পা বাড়ালেন; কারণ কুরাইশদের বাহিনীটি ঐ দিক থেকে আসছিল। ১৬ রমজান তারা বদরের নিকটে পৌঁছলেন। এটি মদিনা থেকে কিঞ্চিত দিক ৮০মাইল দক্ষিন -পশ্চিম অবস্থিত একটি প্রান্তর । এখানে পৌঁছার পর জানা গেল যে, কুরাইশ বাহিনী প্রান্তরের অপর সীমান্তে এসে পৌঁছেছে। তাই হযরত(সা:) এর নির্দেশে এখানে ছাউনি ফেলা হলো।

কুরাইশদের বাহিনীটি অত্যন্ত জাঁকালো সাজ-সজ্জা সহকারে বের হয়েছিল । এদের দলে এক সহস্রাধিক সৈন্য ছিলো,সর্দার ছিলো প্রায় একশোর মতো। সৈন্যদের জন্যে রসদ-পত্রেরও খুব উত্তম আয়োজন ছিল। উতবা বিন রাবিয়া ছিল সিপাহসালার ।

বদরের কাছে কাছে পৌঁছে কুরাইশ সৈন্যরা জানতে পারলো যে, তাদের বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের আয়ত্ত্বের বাইরে রয়েছে ।এতে জাররাহ ও আদী গোত্রের প্রধানগণ বললো যে, এখন আর আমাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই । কিন্তু আবু জেহেল তাতে সায় দিলেন না। ফলে জাররাহ ও আদী গোত্রের লোকেরা মক্কায় ফিরে গেল এবং বাকী সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হলো।

amarboi.org

amarboi.org

যুদ্ধক্ষেত্রের যে অংশটি কুরাইশদের দখলে ছিল , উপযোগিতার দিক দিয়ে তা ছিল খুবই উত্তম তাদের জমিন ছিল অত্যন্ত মজবুত। পক্ষান্তরে মুসলমানরা যেখানে ছাউনি ফেলেছিল,তা ছিল লবণাক্ত ভূমি। সৈন্যদের পা তাতে দেবে যাচ্ছিল। অন্যান্য দিক দিয়েও তাদের অসুবিধা ছিল প্রচুর। এই পরিস্থিতিতে রাতভর সমস্ত সৈন্য বিশ্রাম গ্রহণ করলো;কিন্তু নবী করীম (সা:)সারারাত ইবাদাত -বন্দেগীতে মশগুল রইলেন। ১৭রমজান ফজরের পর তিনি মুসলিম সৈন্যদের সামনে জিহাদ সম্পর্কে এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দিলেন। অতঃপর যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করা হলো। এ বছরই মুসলমানদের প্রতি রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় ,এই পয়লা রোজার মধ্যেই মুসলমানদের তিনগুন বেশি সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হতে হলো। কি কঠোর পরীক্ষা!

সে রাতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত স্বরুপ দুটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। প্রথমত ,মুসলিম সৈন্যগণ অত্যন্ত প্রশান্তি ও সুনিদ্রার ভেতর দিয়ে রাত যাপন করলো। প্রত্যুষে তারা সতেজ বল-বীর্য নিয়ে ঘুম থেকে জাগলো দ্বিতীয়ত, রাতে খুব বৃষ্টিপাত হলো। তার ফলে লবণাক্ত জমি শক্ত হয়ে গেলো। এবং মুসলমানদের পক্ষে ময়দান খুব উপযোগী হলো। পক্ষান্তরে এই বৃষ্টির ফলে কুরাইশদের অধিকৃত অংশ কর্দমাক্ত হয়ে গেল এবং তাতে সৈন্যদের পা দেবে যেতে লাগলো ।পরন্ত মুসলমানদের অধিকৃত অংশের নীচু ভূমিতে পানি জমে গেল এবং তাতে তাদের ওযু-গোসল ইত্যাদির প্রচুর সুযোগ হলো। এসব কারণে মুসলমানদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি ও শংকাবোধ দূর হয়ে গেল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে তারা শত্রু সৈন্যদের মুকাবেলার জন্যে প্রস্তত হলো।

ময়দানে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যদল মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো, তখন এক অদ্ভূত দৃশ্যের অবতারণা হলো। একদিকে ছিল আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারী তার বন্দেগী ও আনুগত্য স্বীকারকারী মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান, যাদের কাছে সাধারুণ যুদ্ধ সরঞ্জাম পর্যন্ত ছিল না। অন্যদিকে ছিল অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ-পত্রে সুসজ্জিত এক সহস্রাধিক কাফির সৈন্য,যারা এসেছে তওহীদের আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে। যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে নবী কারীম(সা:) খোদার দরবারে হাত তুললেন এবং অতীব বিনয় নম্রতার সাথে বললেনঃ'হে খোদা এই কুরাইশরা চরম ঔদ্ধত্য ও অহমিকা নিয়ে এসেছে তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে । অতএব আমায় যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছিলে ,এখন সে সাহায্য প্রেরণ করো। হে খোদা ! আজ এই মুষ্টিমেয় দলটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়ায় তোমার বন্দেগী করার আর কেউ থাকবে না। '

এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল মুহাজিরদেরকে । এদের প্রতিপক্ষ ছিল আপন ভাই,পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। কারো বাপ , কারো চাচা, কারো মামা আর কারো ভাই ছিল তার তলোয়ারের লক্ষ্যবস্তু এবং নিজ হাতে তাদের হত্যা করতে হয়েছিল এইসব কলিজার টুকরা কে । এই কঠিন পরীক্ষায় কেবল তারাই টিকে থাকতে পেরেছিল , যারা সাচ্চা দিলে আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলঃ যে সব সম্বন্ধকে তিনি বজায় রাখতে বলেছেন,তারা শুধু তাই বজায় রাখবে আর যেগুলোকে তিনি ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন - তা যতোই প্রিয় হোক না কেন - তারা ছিন্ন করে ফেলবে ।

কিন্তু সেই সঙ্গে আনসারদের পরীক্ষাও কোনো দিক দিয়ে সহজ ছিল না। এ যাবত আরবের কাফির এবং মক্কার মুশরিকদের চোখে তাদের 'অপরাধ' ছিল এটুকু যে, তারা তাদের দুশমন অর্থাৎ মুসলমানদের কে আশ্রয় দান করেছে। কিন্তু এবার তারা প্রকাশ্যভাবেই ইসলামের সমর্থনে কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা তাদের জনপদটির (মদিনা) বিরুদ্ধে গোটা আরবদেরকেই দুশমন বানিয়ে নিয়েছে। অথচ মদিনার জনসংখ্যা তখন সাকুল্যে এক হাজারের বেশি ছিল না । এতো বড় দুঃসাহস তারা এজন্যেই করতে পেরেছিল যে, তাদের হৃদয় আল্লাহর ও রাসূলের মুহাব্বত এবং আখিরাতের প্রতি অবিচল ঈমানে পরিপূর্ণ হয়েছিল। নতুবা আপন ধন-দৌলত স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে এভাবে সমগ্র আরব ভূমির শত্রুতার ন্যায় কঠিন বিপদের মুখে কে নিক্ষেপ করতে পারে ?

কুরাইশদের পরাজয়

বস্তত ঈমানের এই স্তরে উন্নীত হবার পরই বান্দার জন্যে আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়ে থাকে । বদর যুদ্ধেও তাই আল্লাহ তাআলা এই সহায়-সম্বলহীন ৩১৩ জন মুসলমানকে সাহায্য দান করেন। এর ফলে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সহস্রাধিক সুসজ্জিত সৈন্য অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো এবং তাদের সমস্ত শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। এই যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের প্রায় ৭০ ব্যক্তি নিহত হলো এবং সম সংখ্যক লোক বন্দী হলো।নিহতদের মধ্যে তাদের বড় বড় নামজাদা

amarboi.org

amarboi.org

সর্দারগণ প্রায় সবাই ছিল। এদের মধ্যে শায়বা, উতবা, আবু জেহেল, জামআহ , আস, উমাইয়া প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব নামজাদা সর্দারের মৃত্যুর ফলে কুরাইশদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। মুসলমানদের পক্ষে প্রায় ৬ জন মুহাজির এবং ৮ জন আনসার শহীদ হলেন।

যুদ্ধে যারা বন্দী হলো, তাদের কে দু'-দু' চার জন করে সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হলো এবং নবী করীম (সা:) তাদের কে সদাচরণ করার নির্দেশ দান করলেন। ফলে সাহাবীগণ তাদের কে এমনি আরামে রাখলেন যে, বহুতর ক্ষেত্রে তারা নিজেরা কষ্ট স্বীকার করলেও বন্দীদের কষ্ট দেন নি। এই সদাচরণের ফলে তাদের হৃদয়ে ইসলামের জন্যে অনেক নম্রতার সৃষ্টি হলো। আর এটাই ছিল আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য । পরে এইসব বন্দীর অনেকেই ফিদয়ার(মুক্তিপণ) বিনিময়ে মুক্তি লাভ করে। যারা গরীব অথচ শিক্ষিত ছিল, তাদেরকে দশ-দশটি শিশুকে লেখাপড়া শেখানোর বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়।

বদর যুদ্ধের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া

ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে বদর যুদ্ধ ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ । প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দাওয়াত অগ্রাহ্য করার দরুন মক্কার কাফের দের জন্যে যে খোদায়ী আযাব নির্ধারিত হয়েছিল , এ যুদ্ধ ছিল তারই প্রথম নিদর্শন। তাছাড়া ইসলাম ও কুফরের মধ্যে মূলত কার টিকে থাকবার অধিকার রয়েছে এবং ভবিষ্যতের হাওয়ার গতিই বা কোন দিকে মোড় নেবে, এ যুদ্ধ তা স্পষ্টত জানিয়ে দিল। এ কারণেই একে ইসলামী ইতিহাসের পয়লা যুদ্ধ বলা হয়। কুরআন পাকের সূরা আনফালে এই যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে দুনিয়ার রাজা- বাদশাহ বা জেনারেলগণ কোন যুদ্ধ জয়ের পর যে ধরণের পর্যালোচনা করে থাকে , এ পর্যালোচনা তা থেকে সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র ।

এ পর্যালোচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর ওপর একটু বিস্তৃত ভাবে দৃষ্টিপাত করলে ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অত্যন্ত সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

বদর যুদ্ধের পর্যালোচনা এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষণ

১.পূবেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের আগে যুদ্ধ ছিল আরবদের একটি প্রিয় 'হবি'। যুদ্ধে যে মাল-পত্র (গনিমত) হস্তগত হতো, তার প্রতি ছিল তাদের দুর্নিবার মোহ। এমনকি কখনো কখনো ঐ মাল-পত্রের আকর্ষণই তাদের যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ধন-সম্পদের চেয়ে অনেক উন্নত সে উদ্দেশ্যকে মুসলমানদের হৃদয়-মূলে বদ্ধমূল করে নেয়া অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এ দিক দিয়ে বদর যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্যে একটি পরীক্ষামূলক যুদ্ধ। মুসলমানদের হৃদয়-মূলে ইসলামী যুদ্ধের নিয়ম-নীতি ও নৈতিক আদর্শ পুরোপুরি বদ্ধমূল হয়েছে, না অনৈসলামী যুদ্ধের ধ্যান-ধারণা তাদের হৃদয়ে এখনো প্রভাব বিস্তার করে আছে, এই যুদ্ধ ছিল তারই পরীক্ষামাত্র।

বদর যুদ্ধে কাফিরদের মালমাত্তা যাদের হস্তগত হয়েছিল , তারা পুরনো রীতি অনুযায়ী তাকে তাদের আপন সম্পত্তি বলেই মনে করে বসলো। ফলে যারা কাফিরদের পেছনে ধাওয়া করা কিংবা হযরত(সা:) এর নিরাপত্তার কাজে ব্যস্ত ছিল,তারা কিছুই পেল না। এভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হলো। ইসলামী আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার এটাই ছিল উপযুক্ত সময়। তাই সর্ব প্রথম তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলা হলো যে, গনীমতের মাল প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কোন পারিশ্রমিক নয়। এ হচ্ছে আপন পারিশ্রমিকের বাইরে মালিকের তরফ থেকে দেয়া একটি বাড়তি অবদান বা পুরস্কার বিশেষ(আনফাল)। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার যথার্থ প্রতিদান তো তিনি আখেরাতেই দান করবেন। এখানে যা কিছু পাওয়া যায়, তা কারো ব্যক্তিগত স্বত্ত্ব (হক) নয়, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার একটি বাড়তি অবদান মাত্র। কাজেই এই অবদান সম্পর্কে কারোর স্বত্ত্বাধিকার দাবির প্রশ্নই উঠে না। এর স্বত্ত্বাধিকার হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসূলের। তারা যেভাবে চান, সেভাবেই এর বিলি-বণ্টন করা হবে। এর পর সামনে অগ্রসর হয়ে এই বিলি-বণ্টনের নীতিমালাও বাতলে দেয়া হলো। এভাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত এক বিরাট প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা হলো। মুসলমানদের কে চূড়ান্ত ভাবে বলে দেয়া হলো যে, তারা দুনিয়ার ফায়দা হাসিলের জন্যে কখনো অস্ত্র ধারণ করতে পারে না,বরং দুনিয়ার নৈতিক বিকৃতিকে সংশোধন করা এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে গায়রুল্লাহর গোলামী থেকে মুক্ত করার অপরিহার্য প্রয়োজনেই তাদের শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। তারা যখন দেখবে যে, বিরুদ্ধ শক্তি তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছে এবং দাওয়াত

amarboi.org

amarboi.org

ও তাবলীগের মাধ্যমে সংশোধন প্রচেষ্টাকে অসম্ভব করে তুলেছে ,ঠিক তখনি এরুপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে কাজেই তারা যে সংস্কার সংকল্প নিয়েছে, তাদের দৃষ্টি শুধু সেদিকেই নিবদ্ধ থাকা উচিত এবং এই লক্ষ্য অর্জনের পথে কোনরুপ অন্তরায় হতে পারে, এমন কোন পার্থিব স্বার্থের দিকেই তাদের ফিরে তাকানো উচিত নয়।

২.ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আমীর বা নেতার আনুগত্য হচ্ছে দেহের ভেতর রুহের সমতুল্য। তাই নেতৃত আদর্শের পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল আনুগত্যের জন্যে মনকে প্রস'ত করার নিমিত্ত বারবার মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। ৪১আলোচ্য যুদ্ধের গনীমতের মাল সম্পর্কেও তাই সর্বপ্রথম লোকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের দাবি জানানো হলো এবং তাদেরকে বলে দেয়া হলো যে,এসব কিছুই আল্লাহ এবং তার রাসূলের স্বত্ত্বা। এ ব্যাপারে তারা যা ফয়সালা করেন, তাতেই সবার রাযী থাকতে হবে।

৩. সাধারণ আন্দোলনগুলোর প্রকৃতি এই যে, সেগুলো আপন কর্মী ও অনুবর্তীদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্যে তাদের কৃতিত্বের কথা নানাভাবে উল্লেখ করে থাকে। এভাবে খ্যাতি-যশ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে উস্কিয়ে দিয়ে লোকদের কে ত্যাগ তিতিক্ষার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বস্তত এ কারণেই বড় বড় যুদ্ধ বা বিজয় অভিযানের পর এইসব আন্দোলন তার আত্মোৎসর্গী কর্মীদের মধ্যে বড়ো বড়ো খেতাব পদক ইনাম ইত্যাদি বিতরণ এবং নানাভাবে তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে একদিকে তারা আপন কৃতিত্বের বদলা পেয়ে সন্তোষ লাভ করে এবং ভবিষ্যতে আরো অধিক ত্যাগ স্বীকারের জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়, অন্যদিকে অপর লোকদের মনেও তাদেরই মতো উন্নত মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত । মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম সৈন্য কতৃক এক সহস্রাধিক কাফের সৈন্যকে পরাজিত করা এবং এক প্রকার বিনা সাজ-সরঞ্জামে কয়েকগুণ বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে নির্মূল করা সত্ত্বেও তাদের কে বলে দেয়া হলোঃতারা যেন এ ঘটনাকে নিজেদের বাহাদুরি বা কৃতিত্ব বলে মনে না করে। কারণ তাদের এ বিজয় শুধু আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ মাত্র। কেবল তারই দয়া এবং করুণার ফলে এতো বড়ো শত্রু বাহিনীকে তারা পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই তাদের কখনো আপন শক্তি -সামর্থের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়; বরং সর্বদা আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং তারই করুণা ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে ময়দানে অবতরণ করার ভেতরে নিহিত রয়েছে তাদের আসল শক্তি। যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে হযরত (সা:) এক মুঠো বালু হাতে নিয়ে 'শাহাদাতুল ওজুহ' (চেহারা আচ্ছন্ন হয়ে যাক) বলে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এরপরই মুসলমান সেনারা একযোগে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের কে ধরাশয়ী করে। অন্য লোক হলে এই ঘটনাকে নিজের 'কেরামত ' বা অলৌকিক কীর্তি বলে ইচ্ছামত গর্ব করতে পারতো এবং একে ভিত্তি করে তার অনুগামীরা ও নানারুপ কিস্সা-কাহিনীর সৃষ্টি করতো। কিন্তু কুরআন পাকে খোদ আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বলে দিলেনঃ 'তাদেরকে (কাফিরদেরকে) তোমরা হত্যা করো নি, বরং তাদের হত্যা করেছেন আল্লাহ। ' এমনকি তিনি হযরত (সা:) কে পর্যন্ত বলে দিলেন যে, '(বালু) তুমি ছুঁড়োনি,বরং ছুঁড়েছেন আল্লাহ এবং মুমিনদের কে একটি উত্তম পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ করা হয়েছে।'(সূরা আনফাল ,আয়াতঃ১৮)। এভাবে মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হলো যে,প্রকৃত পক্ষে সমস্ত কাজের চাবিকাঠি রয়েছে আল্লাহর হাতে এবং যা কিছু ঘটে তার নির্দেশ ও ইচ্ছানুক্রমেই ঘটে থাকে। মুমিনদের কাজ হচ্ছে আল্লাহর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা এর ভেতরই নিহিত রয়েছে তাদের জন্যে সাফল্য।

৪.ইসলামী আন্দোলনে জিহাদ হচ্ছে চূড়ান্ত পরীক্ষা , যার মাধ্যমে আন্দোলনের অনুবর্তীদের পূর্ণ যাচাই হয়ে যায়। যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং মুমিনদের পক্ষে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে ময়দানে অবতরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তখন সেখান থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে নেমে ময়দান থেকে পলায়ন করার অর্থ এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে,

ক.মুমিন যে উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করতে নেমেছে, তার চেয়ে তার নিজের প্রাণ অধিকতর প্রিয় কিংবা

খ.জীবন ও মৃত্যু যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ এবং তার হুকুম না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু আসতেই পারে না আর হুকুম যখন এসে যায় ,তখন মৃত্যু এক মুহূর্ত ও বিলম্বিত হতে পারে না - তার এই ঈমানই অত্যন্ত দুর্বল অথবা

গ.তার হৃদয়ে আল্লাহর সন'ষ্টি এবং আখিরাতের সাফল্যে ছাড়াও অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা লালিত হচ্ছে এবং প্রকৃত পক্ষে সে খোদার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করতে পারেনি। যে , ঈমানের ভেতর এর কোনো একটি

amarboi.org

amarboi.org

জিনিসও ঠাঁই নিয়েছে , তাকে কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ ঈমান বলা যায় না। এ কারণেই ইসলামের এই প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধোপলক্ষে মুসলমানদের কে সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেয়া হলো যে, যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপসরণ করা মুমিনদের কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত (সা:) ইরশাদ করেন, তিনটি গুনাহের মুকাবেলায় মানুষের কোন নেকীই ফলপ্রসূ হতে পারে নাঃ এক ,খোদার সাথে শিরক,দুই ,পিতামাতার অধিকার হরণ এবং তিন ,আল্লাহর পথে চালিত যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা।

৫. যখন পার্থিব সম্পর্ক -সম্বন্ধের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সঙ্গত সীমা অতিক্রম করে যায় ,তখন আল্লাহর পথে অগ্রসর হতেও তার শৈথিল্য এসে যায় । ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই হচ্ছে এ পথের প্রধান প্রতিবন্ধক । তাই এই উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্ততির সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে ও মুসলমানদের অবহিত করলেন। তিনি বললেনঃ ‘‘জেনে রাখো,তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের পরীক্ষায় উপকরণ মাত্র ; আল্লাহর কাছে প্রতিফল দেবার জন্যে অনেক কিছুই রয়েছে।’’

(সূরা আনফাল,আয়াতঃ২৮) বস্তত ,মুমিন তার ধন-সম্পদের সদ্ব্যবহার করে কিনা এবং সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ হেতু আল্লাহর পথে জীবন পণ করতে তার হৃদয়ে কিছুমাত্র সংকীর্ণতা আসে কিনা অথবা সম্পদের মোহে সত্যের জিহাদে সে শৈথিল্য দেখায় কিনা, ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ শুধু তা-ই পরীক্ষা করে থাকেন। অনুরুপ ভাবে সন্তান-সন্ততি হচ্ছে মানুষের পরীক্ষার দ্বিতীয় পত্র। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে -প্রথমত সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর বন্দেগী এবং তার আনুগত্যের পথে নিয়োজিত করার পূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুমিনকে তাদের প্রতি সঠিক কর্তব্য পালন করতে হবে। দ্বিতীয়ত ,মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ জাগিয়ে দিয়েছেন , তার আধিক্যহেতু আল্লাহর পথে পা বাড়াতে গিয়ে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয়, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে এই মহা পরীক্ষার জন্যে প্রতিটি মুমিনের তৈরি থাকা উচিত।

৬. ধৈর্য যে কোন আন্দোলনেরই প্রাণবস্ত । দেহের জন্যে আত্মা যতোখানি প্রয়োজনীয় ,ইসলামী আন্দোলনের জন্যে এই গুণটি ততোখানিই আবশ্যক। মক্কার মুসলমানরা যে দুরবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছিল ,সেখানেও এই গুণটি বেশি করে অর্জন করার জন্যে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে শুধু একতরফা জুলুম-পীড়ন সহ্য করা ছাড়া মুসলমানদের আর কিছুই করণীয় ছিল না। কিন্তু এখন আন্দোলন দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করার দরুণ খোদ মুসলমানদের দ্বারাই অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ হবার আশংকা দেখা দিল। কাজেই এই পরিবর্তিত অবস্থায়ও এ গুণটি বেশি পরিমাণে অর্জন করার জন্যে তাগিদ দেয়া হলো। বলা হলোঃ

‘‘হে ঈমানদারগণ ! যখন কোন দলের সঙ্গে তোমাদের মুকাবেলা হয়,তখন তোমরা সঠিক পথে থেকো এবং আল্লাহ কে বেশি পরিমাণে স্মরণ করো। আশা করা যায় তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে। আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর বিবাদ করো না। (বিবাদ করলে)তাহলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের অবস্থার অবনতি ঘটবে। সবর বা ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করো; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আনফাল ,আয়াত : ৪৫ ও ৪৬)

এখানে ধৈর্যের (সবরের)তাৎপর্য হচ্ছে এইঃ

১.আপন প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগকে সংযত রাখতে হবে।
২.তাড়াহুড়া,ভয়-ভীতি ও উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে হবে।
৩.কোন প্রলোভন বা অসঙ্গত উৎসাহকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।
৪.শান্ত মন সুচিন্তিত ফয়সালার ভিত্তিতে সকল কাজ সম্পাদন করতে হবে।
৫.বিপদ-মুসিবত সামনে এলে দৃঢ় পদে তার মুকাবেলা করতে হবে।
৬.উত্তেজনা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন অন্যায় কাজ করা যাবে না।
৭.বিপদ-মুসিবতের কারণে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে আতঙ্ক বা অস্থিরতার কারণে মনোবল হারানো যাবে না।
৮.লক্ষ্য অর্জনের আগ্রহাতিশয্যে কোনো অসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা যাবে না।

amarboi.org

amarboi.org

৯.পার্থিব স্বার্থ ও প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজের কামনা-বাসনাকে আচ্ছন্ন করা এবং সে সবের মুকাবেলায় দুর্বলতা প্রকাশ করে কোনো স্বার্থের হাতছানিতে আকৃষ্ট হওয়া যাবে না ।

এখন এই পরিবর্তিত অবস্থায় মুমিনদের আপন ধৈর্যের পরীক্ষা অন্যভাবেও দেয়ার প্রয়োজন ছিল। মানুষের ওপর উদ্দেশ্য-প্রীতির প্রাধান্য কখনো কখনো এতোটা চেপে বসে যে, তার মুকাবেলায় সে হক ও ইনসাফের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতে পারে না। সে মনে করে যে, উদ্দেশ্যের খাতিরে এরুপ করায় কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন সর্বতো ভাবে একটি সত্য ভিত্তিক আন্দোলন বিধায় স্বীয় অনুগামীকে সে কখনো হক ও ইনসাফের সীমা অতিক্রম করতে অনুমতি দেয় না। তাই কুফর ও ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বের সময় অন্যান্য নৈতিক ও শিক্ষামূলক নির্দেশাবলীর সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে রাজনৈতিক চুক্তির ব্যাপারেও মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ হক ইনসাফভিত্তিক নির্দেশাবলী প্রদান করা হলো। এইসব নির্দেশাবলীর সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কখনো জয়-পরাজয় কিংবা পার্থিব স্বার্থের হাতছানিতে চুক্তিভঙ্গ না করে , বরং আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে যেনো চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে । এর ফলে তার আপন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য থেকেও যদি বঞ্চিত হতে হয়,তবুও যেনো সে পিছপা না হয়।

বদর যুদ্ধের পর কুরআন পাকে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করা হয়, এ হচ্ছে তার কয়েকটি উল্লেখ বৈশিষ্ট্য । দুনিয়ার অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় ইসলামী আন্দোলন যে কতোখানি উন্নত ও শ্রেষ্ট এবং অনুবর্তীদের কে সে কি ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে ,এ থেকে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

ওহুদ যুদ্ধ

পটভূমি

বদর যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করলো বটে, কিন্তু যুদ্ধের মাধ্যমে তারা যেনো ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়লো। এই প্রথম যুদ্ধেই তারা দৃঢ়তার সঙ্গে কাফিরদের মুকাবেলা করেছিল এবং কাফিরদেরকেও শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে পিছু হটতে হয়েছিল। এ ঘটনা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমগ্র আরব জনগোষ্ঠীকে প্রচণ্ড ভাবে উত্তেজিত করে দিলো। যারা এই নয়া আন্দোলনের দুশমন ছিল , তারা এ ঘটনার পর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তদুপরি মক্কার যে সব কুরাইশ সর্দার এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তাদের রক্তের বদলা নেবার জন্যে অসংখ্য চিত্ত অস্থির হয়ে উঠলো। আরবে যেকোন এক ব্যক্তির রক্তই পুরুষানুক্রমে যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। আর এখানে তো এমন অনেক ব্যক্তিই নিহত হয়েছিল ,যাদের রক্তমূল্য অসংখ্য যুদ্ধে ও আদায় হতে পারতো না। তাই চারদিকে ঝড়ের আলামত দেখা যেতে লাগলো। ইহুদীদের যে সব গোত্র ইতঃপূর্বে মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছিলো, তারা চুক্তির কোন মর্যাদা রক্ষা করলো না। এমন কি তারা খোদা,নবুয়্যাত আখিরাত এবং কিতাবের প্রতি ঈমান পোষণের দাবি করার ফলে যেখানে মুসলমানদের সাথে অধিকতর নৈকট্য থাকা উচিত ছিলো,সেখানে মুশরিক কুরাইশদের প্রতিই তাদের সমস্ত সহানুভূতি উপচে পড়তে লাগলো। তারা খোলাখুলিভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে কুরাইশদে কে উত্তেজিত করতে শুরু করলো।বিশেষত কাব বিন আশরাফ নামক বনী নাযির গোত্রের জনৈক্য সরদার এ ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও অন্ধ শত্রুতায় লিপ্ত হলো। এ থেকে স্পষ্টত অনুমিত হলো যে, ইহুদীরা না পড়োশী হিসেবে কোন কর্তব্য পালন করবে আর না হযরত (সা:) এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে।

এর ফলে মদিনার এই ক্ষুদ্র জনপদটি চারদিক দিয়েই বিপদ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো। অভ্যন্তরীন দিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা ছিল এমনিতেই দুর্বল ,তদুপরি যুদ্ধের ফলে তাদেরকে আরো বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো।

মক্কার মুশরিকদের অন্তরে এমনিতেই মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল । তাদের বড়ো বড়ো সর্দারগণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে ইতোমধ্যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল। প্রত্যেক গোত্রের মনেই ক্রোধ ও উত্তেজনা

amarboi.org

amarboi.org

কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছিল। এমনি অবস্থায় ইহুদীগণ কর্তৃক মক্কাবাসীকে যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করারচেষ্টা আগুনে তেল ছিটানোর কাজ করলো। ফলে বদর যুদ্ধের পর একটি বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মদিনায় এই মর্মে খবর পৌঁছলো যে, মক্কার মুশরিকগণ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কুরাইশদের অগ্রগতি

এই প্রেক্ষাপটে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের প্রথম সপ্তাহে হযরত (সা:) কয়েকজন লোককে সঠিক খবর খবর সংগ্রহের জন্যে মদিনার বাইরে প্রেরণ করলেন। তারা ফিরে এসে খবর দিল যে, কুরাইশ বাহিনী মদিনার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। এমনকি তাদের ঘোড়গুলো মদিনার একটি চারণ ভূমি পর্যন্ত সাফ করে ফেলেছে। এবার নবী করীস (সা:) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কুরাইশ বাহিনীর মুকাবেলা কি মদিনায় বসে করা হবে , না বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে ? কোন কোন সাহাবী এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, মুকাবেলা মদিনায় বসেই করতে হবে। কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পান নি অথচ শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত এমন কতিপয় যুবক দৃঢ়তার সাথে বললেনঃ 'না, বাইরের ময়দানে গিয়েই তাদের মুকাবেলা করতে হবে। ' অবশেষে তাদের এই দৃঢ়তা দেখে নবী করীম (সা:) মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মুনাফিকদের ধোকাবাজি

কুরাইশগণ মদিনার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তাদের ছাউনি ফেললো। তার একদিন পর হযরত (সা:) জুম'আর নামাজ বাদ এক হাজার সাহাবী নিয়ে মদিনা থেকে রওয়ানা করলেন। এদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লাহ বিন উবাইও ছিল। এ লোকটি দৃশ্যত মুসলমান হলেও কার্যত ছিল মুনাফিক ।এর প্রভাবাধীন আরো বহু মুনাফিক মুসলমানদের সঙ্গে যাত্রা করেছিল। কিছুদূর গিয়ে আবদুল্লাহ বিন উবাই তিন'শ লোক নিয়ে হঠাৎ 'যুদ্ধ হবে না' বলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এখন শুধু সাত শ সাহাবী বাকী রইলেন। এমনি নাজুক অবস্থায় মুনাফিকদের এই আচরণ ছিল গুরুতর মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের শামিল । কিন্তু যে সব মুসলমানের হৃদয় আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস এবং সত্যের পথে শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ ছিল, এ ঘটনায় তাদের ওপর কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হলো না। তাই তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হলেন।

যুব সমাজের উদ্দীপনা

এ সময় হযরত (সা:) তার সঙ্গী- সাথীদের অবস্থা একবার যাচাই করে নিলেন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক তরুণদের ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এদের মধ্যে রাফে ' ও সামারাহ নামক দুটি কিশোর বালকও ছিল। কিশোরদের কে যখন সেনাবাহিনী থেকে আলাদা করে দেয়া হচ্ছিল , তখন রাফে তার পায়ের অগ্রভাগের ওপর ভর করে দাঁড়ালো। যেনো লম্বায় তাকে কিছু উঁচু দেখায় , এবং তাকে সঙ্গে নেয়া হয়। তার এই কৌশল ফলপ্রসূও প্রমাণিত হলো। কিন্তু সামারাহ সেনাবাহিনীতে থাকবার অনুমতি না পেয়ে বললোঃ 'রাফেকে যখন রেখে দেয়া হয়েছে , তখন আমাকেও থাকবার অনুমতি দেয়া উচিত । কারণ আমি তাকে কুস্তি প্রতিযোগিতায়া পরাজিত করতে পারি । ' তার এ দাবির যথার্থতা প্রমাণের জন্যে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হলো। অবশেষে সে রাফেকে পরাজিত করলো এবং তাকেও সেনাবাহিনীতে নিয়ে নেয়া হলো। এ একটি সামান্য ঘটনামাত্র । কিন্তু এতেই আন্দাজ করা চলে যে, মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার কতখানি অদম্য আগ্রহ ছিল।

সৈন্যদের প্রশিক্ষণ

ওহুদ পাহাড় মদীনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত (স) এমনভাবে তার সৈন্যদের মোতায়েন করলেন যে, পাহাড় পিছন দিকে থাকলো আর কুরাইশ সৈন্যরা রইলো সামনের দিকে। পিছন দিকে পাহাড়ের মাঝ বরাবর একটি সুড়ঙ্গ পথ ছিলো এবং সে দিক থেকেও হামলার কিছুটা আশাংকা ছিলো। হযরত (স) সেখানে আবদুল্লাহ বিন জুবাইরকে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজসহ মোতায়েন করলেন। তাকে এই র্মমে নির্দেশ দিলেন যে, এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে কাউকে আসতে দেয়া যাবে না এবং তুমিও এখান থেকে কোন অবস্থায় নড়বে না। এমন কি যদি দেখো যে, পাখিরা আমাদের গোশ্ত ছিঁড়ে নিয়ে খাচ্ছে, তবুও তুমি নিজের স্থান ত্যাগ করবে না

amarboi.org

amarboi.org

কুরাইদের সাজ-সজ্জা

এবার কুরাইশরা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-সজ্জা করে এসেছিলো। প্রায় তিন হাজার সৈন্য ও প্রচুর সামান্তপত্র তাদের সঙ্গে ছিলো। তখনকার দিনে যে যুদ্ধে মেয়েরা যোগ দান করতো, তাতে আরবরা জীবনপণ করে লড়াই করতো। তারা মনে করতো, যুদ্ধে যদি পরাজয় হয় তো মেয়েদের বেইজ্জত হবে। এ যুদ্ধেও কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে অনেক মহিলা এসেছিল। এদের মধ্যে আপন পুত্র ও প্রিয়জন মারা গেছে, এমন অনেকেই ছিলো। এতে কেউ কেউ প্রিয়জনদের হত্যাকারীদের রক্তপান করে তবেই নিঃশ্বাস ফেলবে-এমন প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত করেছিলো।

যুদ্ধের সূচনা

কুরাইশরা তাদের সৈন্যদেরকে খুব ভালোমতো প্রশিক্ষণ দিয়েছিলো। যুদ্ধের সূচনা-পর্বে কুরাইশ মহিলারা দফ বাজিয়ে আবেগ ও উদ্দীপনাময় কবিতা আবৃতি করতে লাগলো। তারা যোদ্ধদেরকে বদর যুদ্ধে নিহতদের রক্তের বদলা নেবার জন্যে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় উৎসাহ যোগালো। এরপর শুরু হলো যুদ্ধ। প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের দিকেই পাল্লা ভারী রইলো এবং কুরাইশ পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হলো।তাদের সৈন্য দের মধ্যে হতাশা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল । এদিকে সুড়ঙ্গ পথের প্রহরায় নিযুক্ত সৈন্যরা যখন দেখলো যে, মুসলমানরা মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়েছে এবং দুশমনরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে.তখন তারাও গনীমতের মাল সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের নেতা হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর বারবার তাদেরকে বিরত রাখতে চাইলেনএবং হযরত (সা:) এর কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।কিন্তু কতিপয় লোক ছাড়া কেউ তার কথা শুনলো না।

পশ্চাদিক থেকে কুরাইশদের হামলা

খালিদ বিন অলীদ তখন কাফির সৈন্যদের একজন অধিনায়ক। সে এই সুবর্ণ সুযোগ কে পুরোপুরি কাজে লাগানো এবং পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে সুড়ঙ্গ -পথে মুসলমানদের ওপর হামলা করলো।হযরত আবদুল্লাহ এবং তার ক'জন সঙ্গী শেষ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ পথের প্রহরায় ছিলেন,তাদের অধিকাংশই এই হামলার মুকাবেলা করলেন।কিন্তু কাফের দের এই প্রচণ্ড হামলাকে তারা প্রতিহত করতে পারলেন না। তারা শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর দুশমনরা একে একে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওদিকে যে সব পলায়নপর কাফির দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিল , তারাও আবার ফিরে এলো।এবার দুদিক দিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা শুরু হলো।এই অভাবিত পরিস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্যে এমন আতঙ্কের সঞ্চার হলো যে, যুদ্ধের মোড়ই সম্পূর্ণ ঘুরে গেলো। মুসলমানেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। এমনকি আতঙ্কের মধ্যেই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, নবী করীম(সা:) শহীদ হয়ে গেছেন। এই খবরে সাহাবীদের মধ্যে বাকী উদ্যমটুকুও নষ্ট হয়ে গেলো এবং অনেকে সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেললো।

আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়

এ সময় দশ-বারো জন সাহাবী নবী করীম(সা:) কে ঘিরে রেখেছিলেন। তিনি অবশ্য আহত হয়েছিলেন। সাহাবীরা তাকে একটি পাহাড়ের ওপর নিয়ে এলেন। অতঃপর অন্য মুসলমানরা ও জানতে পারলেন যে, নবী করীম (সা:) সুস্থ ও নিরাপদ আছেন।তাই তারা আবার দলে দলে তার কাছে একত্রিত হতে লাগলেন। কিন্তু এ সময় কি কারণে যেন কাফিরদের মনোযোগ হঠাৎ অন্যদিকে নিবদ্ধ হলো এবং নিজেদের বিজয়কে পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত না পৌঁছিয়েই তারা ময়দান ছেড়ে চলে গেল।

তারা যখন কিছু্টা দূরে চলে গেল, তখন তাদের সম্বিত ফিরে এলো। তারা পরস্পরকে বললোঃ এ আমরা কি ভুল করলাম ! মুসলমানদের সম্পূর্ণ খতম করে দেবার দুর্লভ সুযোগটিকে নষ্ট করে এমনিই চলে এলাম! এরপর তারা এক জায়গায় থেকে পরস্পর বলাবলি করলোঃ এবার তাহলে মদিনার ওপর আর একবার হামলা করা উচিত । কিন্তু শেষ পর্যন-আর তাদের সাহস হলো না। তারা মক্কায় ফিরে গেলো।

এদিকে নবী করীম (সা:) চিন্তিত ছিলেন যে,শত্রুরা না জানি আবার ফিরে এসে আবার হামলা করে বসে । তাই তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের কে দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দিলেন। এটা ছিল অত্যন্ত নাজুক সময় । কিন্তু যারা সাচ্চা মুমিন ছিল , তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে পুনরায় জান কুরবান করার জন্যে তৈরি হয়ে গেল । নবী করীম(সা:) হামরা-উল-আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। এ জায়গাটি মদিনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত । এখানে পৌঁছে জানা গেল যে, কুরাইশরা মক্কায় ফিরে গেছে। তাই তিনিও মুসলমানদের নিয়ে মদিনায় ফিরে এলেন।

amarboi.org

amarboi.org

এ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হলেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন আনসার । তাই মদিনায় ঘরে ঘরে শোকের বন্যা নেমে এলো। এ সময় হযরত (সা:) মুসলমানদের শোক প্রকাশের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত করলেন।তিনি বললেনঃ 'মাতম করা এবং ছাতি পিটিয়ে কান্না-কাটি করা মুসলমানদের পক্ষে মর্যাদা হানিকর । '

বিপর্যয়ের কারণ এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষণ

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটে , তার পেছনে মুনাফিকদের চালবাজি ও কলা কৌশলের প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই সঙ্গে মুসলমানদের নিজস্ব দুর্বলতাও কম দায়ী ছিল না । অবশ্য ইসলামী আন্দোলন যে ধরণের মেজাজ তৈরি করে এবং তার কর্মীদের যে রুপ প্রশিক্ষণ দিতে ইচ্ছুক , তার জন্যে তখনও পুরোপুরি সুযোগ পাওয়া যায় নি। আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার এ ছিল দ্বিতীয় সুযোগ মাত্র । তাই এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই কিছু কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পেলো। যেমনঃ সম্পদের মোহে কর্তব্য অবহেলা করা , নেতার হুকুম অমান্য করা ,দুশমনকে পুরোপুরি খতম করার আগে গনীমতের মালের দিকে মনোযোগ দেয়া ইত্যাদি। এ কারণেই যুদ্ধ শেষ হবার পর আল্লাহ তাআলা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে পর্যালোচনা করলেন। এ পর্যালোচনা ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যা কিছু দোষ-ত্রুটি বাকী ছিল , তার প্রতিটি দিককেই তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন এবং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীও প্রদান করলেন।সূরা আল ইমরানের শেষাংশে এই নির্দেশাবলীর কথা বিবৃত হয়েছে। এখানে তার কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। এ থেকে ইসলামী আন্দোলনে যুদ্ধের স্থান কোথায় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর ওপর কিভাবে আলোকপাত করতে হয়, তা আর একবার উপলব্ধি করা যাবে।

খোদা-নির্ভরতা

মুসলমানরা যখন যুদ্ধের জন্যে যাত্রা করেছিল ,তখন তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজারের মতো। পক্ষান্তরে দুশমনদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এরপরও কিছুদূর গিয়ে তিন শ' মুনাফিক আলাদা হয়ে গেল। এবার বাকী থাকলো শুধু সাত শ' মুসলমান। তদুপরি যুদ্ধের সামান্তপত্র ছিল কম এবং এক তৃতীয়াংশ সৈন্যও গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু লোকের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে লাগলো । এ সময় শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার সাহায্যের ওপর ভরসাই মুসলমানদেরকে দুশমনদের মুকাবেলায় এগিয়ে নিয়ে চললো। এ উপলক্ষে হযরত (সা:) মুসলমানদের কে যে সান্ত্বনা প্রদান করেন, আল্লাহ তা নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেনঃ ''স্মরণ করো, যখ,তোমাদের মধ্যকার দুটি দল নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শনের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্যে বর্তমান ছিলেন। আর মুমিনদের তো আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত । এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের শোকরী থেকে তোমাদের বেঁচে থাকা উচিত। আশা করা যায়, এবার তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। স্মরণ করো, যখন তুমি (হে নবী) মুমিনদের কে বলেছিলঃ তোমাদের জন্যে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমরা যাতে খুশি হও এবং তোমাদের হৃদয় নিশ্চিন্ত হয়, সে জন্যেই আল্লাহ তোমাদের কাছে একথা প্রকাশ করলেন। বিজয় বা সাহায্য যা কিছুই হোক , আল্লাহর কাছ থেকেই আসে । তিনি অত্যন্ত শক্তিমান, বিচক্ষণ । (আলে ইমরান আয়াতঃ১২২-১২৬)

এখানে মুসলমানদের কে শেষ বারের মতো বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, প্রকৃতপক্ষে বস্তগত শক্তির ওপর ভরসা করা মুসলমানদের কাজ নয়। তাদের শক্তির আসল উৎস হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার সাহায্যের ওপর ভরসা।

ধন-সম্পদের মোহ

ওহুদে মুসলমানদের বিপর্যয়ের আর একটি বড় কারণ হলো এই যে, মুসলমানরা যুদ্ধের ঠিক মাঝখানেই সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল এবং দুশমনকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার আগেই সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল । এমনকি , যারা সুড়ঙ্গ-পথের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল,তাদের মধ্যে পযর্ন্ত দুর্বলতা প্রকাশ পেল। এভাবে যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের হৃদয় থেকে ধনের মোহ দূরীভূত করার জন্যে আ সময়ই মোহ সৃষ্টির একটি বড় কারণকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। অর্থাৎ এ সময় সূদকে হারাম ঘোষণা করা হলো। যারা সূদী কারবার করে , তাদের হৃদয়ে ধনের

amarboi.org

amarboi.org

মোহ এমনি বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তা আর কোন মহৎ কাজের উপযোগী থাকে না।সূদের ফলেই এক শ্রেণীর মনে লালসা, কার্পণ্য , আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ধনের মোহ সৃষ্টি হয়। আর এক শ্রেণীর মধ্যে জাগ্রত হয় হিংসা দ্বেষ ও ক্রোধ-বিক্ষোভ।

সাফল্যের চাবিকাঠি

যদি মনোবলকে সমুন্নত রাখার জন্যে কোন ক্রিয়াশীল শক্তি বর্তমান না থাকে , তাহলে পরাজয়ের পর তা হ্রাস পেতে থাকবেই । ওহুদে মুসলমানদের যে পরাজয় ঘটেছিল , তাতে কিছু লোকের মনোবল ভেঙ্গে পড়ার আশংকা ছিল। কিন্তু এ সময় মুসলমানদের কে এই বলে আশ্বাস দেয়া হলো যে, '' তোমাদের না নিরুৎসাহ হওয়া উচিত আর না দুঃখ প্রকাশ করা উচিত । তোমাদেরই হবে, যদি তোমরা খাঁটি মুমিন হও, ঈমানের ওপর অবিচল থাকো এবং তার দাবি সমূহ পূর্ণ করতে থাকো। তোমাদের কাজ শুধু এটুকুই ; এরপর তোমাদের সমুন্নত করা এবং দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব আল্লাহর । এরপর রইলো তোমাদের এই সাময়িক দুঃখ- ক্লেশ ও পরাজয়ের প্রশ্ন। এটা শুধু তোমাদেরই ব্যাপার নয়, তোমাদের বিরুদ্ধ দলের ওপরও এরকম দুঃখ-মুসিবত এসে থাকে । তারা যখন মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়েও নিরুৎসাহিত হয়না, তখন তোমরা কেন সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে চিন্তা-ভাবনা করো ?তোমরা তো জান্নাতের প্রত্যাশী । তোমরা কি মনে করো, এমনিই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ? অথচ তোমাদের ভেতর কে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছে আর কে তার জন্যে প্রতিকূল অবস্থায়ও ধৈর্য অবলম্বন করতে ইচ্ছুক, আল্লাহ তা এখন পর্যন্ত যাচাই-ই করেননি।(আল - ইমরানঃআয়াত১৩৯-১৪২)

ইসলামী আন্দোলনের প্রাণবস্ত

পৃথিবীর যেকোন আন্দোলনেই তার প্রাণবস্ত কিংবা চালিকা-শক্তিরুপে একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব বর্তমান থাকে। কিন্তু আদর্শবাদী আন্দোলনের উন্নতি বা স্থায়িত্ব কোন ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং যে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে এ আন্দোলন উত্থিত হয়, তার দৃঢ়তা ও সত্যতার ওপরই এর সবকিছু নির্ভর করে। ইসলামী আন্দোলনের জন্যে নবীদের ব্যক্তিত্ব কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ , তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও এটি একটি আদর্শবাদী আন্দোলন এবং এর উন্নতি ও স্থায়িত্ব সম্পূর্ণত ইসলামের উপস্থাপিত নীতিমালার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে মুসলমানদের এ কথা জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন হলো যে, নবীর মহান ব্যক্তিত্ব তাদের ভেতর বর্তমান থাকলেই কেবল তারা আল্লাহর দ্বীনের ঝাণ্ডা সমুন্নত করবে এবং নবীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলে অমনি তারা এ পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পথ অবলম্বন করবে, এরুপ ধারণা যেনো তাদের মনের কোণেও ঠাঁই পায়। ইতঃপূর্বে ওহুদের ময়দানে যখন এই মর্মে গুজব প্রচারিত হলো যে, হযরত (সা:) শহীদ হয়ে গেছেন, তখন কিছু মুসলমানের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। তারা ভেবেছিল : হযরতের ছায়াই যখন চলে গেল, তখন আর যুদ্ধ করে কি হবে! এই ভুল ধারণা দূর করার জন্যেই এই সময় মুসলমানদের বুঝিয়ে দেয়া হলোঃ ''দেখো,মুহাম্মদ (সা:) একজন রাসূল বৈ কিছুই নন। তার আগেও অনেক রাসূল চলে গেছেন। এখন তিনি যদি মরে যান কিংবা নিহত হন, তাহলে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে ? মনে রেখো, যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করবে সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করবে না । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে জীবন যাপন করবে, তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।''(আল ইমরানঃআয়াত১৪৪)

আরো বলা হলোঃ 'তোমরা যে দ্বীনকে বুঝে-শুনে গ্রহণ করেছো, তার ওপর অবিচল থাকার এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তোমাদের মধ্যে হামেশা নবীর উপস্থিত মাত্র ।এর ওপর অবিচল থাকলে তোমরা নিজেরাই সুফল পাবে। এ দ্বীনের আসল শক্তি হচ্ছে এর উপস্থাপিত সত্যতা। এর সমুন্নতি না তোমাদের শক্তি -সামর্থের ওপর আর না কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল।'

amarboi.org

amarboi.org

দুর্বলতার উৎস-১

মানুষের সমস্ত দুর্বলতার উৎস হচ্ছে মৃত্যু-ভয়।তাই এ সময় মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো যে, তোমাদের মৃত্যু-ভয়ে পলায়ন করা নিতান্তই অর্থহীন। কারণ মৃত্যুর জন্যে নির্ধারিত সময় না আসা পর্যন্ত কোন প্রাণীরই মৃত্যু হতে পারে না। অন্য কথায় , আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগে না কেউ মরতে পারে আর না তারপর এক মুহূর্তও কেউ বেঁচে থাকতে পারে। অতএব, তোমাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই ; বরং জীবনের যেটুকু অবকাশ পাওয়া গেছে, তা কি দুনিয়াদারিতে ব্যয়িত হচ্ছে না আখিরাতের কাজে ,তা-ই শুধু চিন্তা করা উচিত। কারণ যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়াদারির জন্যে তার শ্রম-মেহনত নিয়োজিত করে, তার যা কিছু প্রাপ্য তা দুনিয়ায়ই পেয়ে থাকে।আর যে ব্যক্তি আখিরাতের কল্যাণের জন্যে কাজ করে ,আল্লাহ তাকে আখিরাতেই প্রতিফল দান করবেন।কাজেই যারা আল্লাহর দ্বীন কবুল করার ,এর ওপর কায়েম থাকার এবং একে হারাম করবার চেষ্টা-সাধনার সুযোগ পেয়েছে, তাদের পক্ষে এই মহা মূল্যবান নিয়ামতটিরই কদর করা এবং এর জন্যেই নিজেদের সবকিছু নিয়োজিত করা উচিত । এর ফলাফল অবশ্যই তাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হবে; আখিরাতের স্থায়ী সাফল্য তারা অর্জন করবে। আর এই নিয়ামতের যারা শোকর আদায় করবে, আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম নিয়ামত দ্বারা কৃতার্থ করবেন। তারা আপন মালিকের কাছ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত হবে।

ওহুদের বিপর্যয়ের পর

আগেই বলা হয়েছে যে, আরবের দু-একটি গোত্র ছাড়া বাদবাকী সমস্ত গোত্রই এই নবোত্থিত ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী ছিলো। কারণ, এ আন্দোলন তাদের পৈত্রিক ধর্ম ও রসম-রেওয়াজের ওপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানছিলো। সেই সঙ্গে মানুষ নৈতিক দিক থেকে উন্নত হোক এবং জুয়া, ব্যভিচার, মদ্যপান, লুটতরাজ ইত্যাকার প্রচলিত দুষ্কৃতি পরিত্যাগ করুক, এ-ও ছিলো এ আন্দোলনের দাবি। তাই বদর যুদ্ধের আগে এই নয়া আন্দোলনকে ধ্বংস করার বিষয়ে অনেক গোত্রই চিন্তা-ভাবনা করছিলো। কিন্তু বদরে কুরাইরশরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার ফলে তারা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়লো এবং এর পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের পর পুনরায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। এবার আরবের বহু গোত্রই ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালো। এ ধরণের কয়েকটি গোত্রের ভূমিকা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

বিভিন্ন গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা

১. চতুর্থ হিজরীর মুহাররম মাসে কাতান এলাকার জুফায়দ নামক একটি গোত্র মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করলো। হযরত (স) এদের মুকাবিলার জন্যে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে হযরত আবু সালামাকে প্রেরণ করলেন। শেষ পর্যন্ত আক্রমণকারীরা পালিয়ে গেলো।

২. এরপর ঐ মাসেই লেহইয়ান নামক কুহিস্থান আ'রনার একটি গোত্র মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত করলো। তাদের মুকাবিলার জন্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ আনীস (রা)-কে প্রেরণ করা হলো। অবশেষে তাদের সর্দার সুফিয়ান নিহত হলো এবং আক্রমণকারীরা ফিরে গেলো।

৩. একই বছর সফর মাসে কালাব গোত্রের প্রধান আবু বারাআ হযরত (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললোঃ 'আমার সঙ্গে কতিপয় লোক পাঠিয়ে দিন; আমার কওমের লোকেরা ইসলামের দাওয়াত শুনতে চায়।' হযরত (স) তার সঙ্গে সত্তর জন সাহাবী পাঠিয়ে দিলেন। এদের অনেকেই ছিলেন সুফ্ফার৪২ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ঐ ২ গোত্রের শাসনকর্তা আ'মের বিন্ তুফাইল এদেরকে ঘেরাও করে হত্যা করলো। এই ঘটনায় হযরত (স) যারপরনাই মনোকষ্ট পেলেন। তিনি সমগ্র মাসব্যাপী ফজরের নামাযের পর ঐ জালিমদের জন্য বদদোয়া করলেন। এই সত্তর জন সাহাবীর মধ্যে মাত্র হযরত আ'মর বিন উমাইয়া নামক একজন সাহাবীকে আ'মের এই বলে মুক্তি দিলো যে, 'আমার মা একটি গোলাম মুক্ত করার মান্নত করেছিলো; যা এই মান্নত হিসেবে তোকেই আমি মুক্তি দিলাম।'

amarboi.org

amarboi.org

হযরত আম'র বিন উমাইয়া যখন ফিরে আসছিলেন তখন আ'মের গোত্রের দুজন লোকের সঙ্গে তাঁর পথে দেখা হলো। তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন। মনে মনে ভাবলেন, আ'মের গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার কিছু প্রতিশোধ তো গ্রহণ করা হলো। কিন্তু হযরত (স) এ ঘটনার কথা জানতে পেরে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কারণ এই গোত্রের লোকদের তিনি ইতোমধ্যে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং এ ঘটনা ছিল সেই প্রতিশ্রুতির খেলাফ। তাই হযরত (স) এ দু'জন লোকের হত্যার ক্ষতিপূরণ দানের কথা ঘোষণা করলেন।

এভাবে আরো দু'টি গোত্র বিশ্বসঘাতকতা করলো। হযরত (স) তাদের কথা অনুযায়ী দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে দশজন সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ঐ জালিমরা বিশ্বাসঘাতকতা করলো। এর মধ্যে সাতজন সাহাবী কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হলেন। বাকী তিনজন বন্দী হলেন। এদের মধ্যে হযরত খুবাইব (র) এবং হযরত জায়েদ (রা) ও ছিলেন। দুশমনরা এদেরকে মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দিলো। হযরত খুবাইব (সা) ওহুদের যুদ্ধে হারেস বিন আ'মের নামক এক ব্যক্তিকে হত্য করেছিলেন। হারেসের পুত্রগণ পিতৃহত্যার বদলা নেবার জন্যে হযরত খুবাইব (রা)-কে কিনে নিলো। কয়েকদিন পর কাফিরদের হাতে তিনি শহীদ হলেন। অনুরূপভাবে সুফিয়ান বিন্ উমাইয়া নামক এক এক ব্যক্তি হযরত জায়েদ (রা)-কে নিয়ে হত্যা করলো।

এভাবে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের নিয়মিত সংঘর্ষ চলছিলো। এতে বিরুদ্ধবাদীরাই একতরফাভাবে নির্মমতার পরিচয় দিচ্ছিলো আর মুসলমানরা তাদের উৎপীড়ন সয়ে যাচ্ছিলো। এই সময় ইহুদীদের সঙ্গেও সম্পর্কের অবনতি মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

ইহুদী আলেম ও পীরদের বিরোধিতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনায় আসার পর হযরত (স) ইহুদী গোত্রগুলোর সঙ্গে নানারূপ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং তাদের জান-মালের কোনো ক্ষতি না করার ও তাদেরকে সর্বপ্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তথাপি ইসলামী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান উন্নতিতে ইহুদী আলেম ও পীরগণ বিশেষভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চিলো। এর অবশ্য কতকগুলো কারণও ছিলো। নিম্নে তার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যাচ্ছে।

১. ধর্মীয় দিক থেকে এ পর্যন্ত ইহুদীদের এক প্রকার অহমিকা ছিলো। খোদাপরস্তি ও দ্বীনদারির দিক দিয়ে সবাই তাদেরকে শ্রদ্ধার পাত্র বলে গণ্য করতো। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের প্রসারের ফলে তাদের এই ভ্রান্ত ধার্মিকতা ও পেশাদারী খোদাপরস্তির মুখোশ খসে পড়লো। সত্যিকার ধার্মিকতা কাকে বলে এবং যথার্থ খোদাপরস্তির তাৎপর্য কি, হযরত (স) -এর বক্তব্য শুনে লোকেরা তা জানতে পরলো। ফলে ইহুদী আলেম ও পীরদের 'ধর্ম ব্যবসায়ে' মন্দাভাব দেখা দিলো।

২. কুরআন শরীফে ইহুদি জনগোষ্ঠী, বিশেষভাবে তাদের আলেম ও ধার্মিক শ্রেণীর লোকদের নৈতিকতা ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে খোলাখুলি সমালোচনামূলক আয়াত নাযিল হচ্ছিলো। যেমন : 'তারা মিথ্যা কথা শ্রবণকারী এবং হারাম মাল ভক্ষণকারী' (সূরা মায়েদা : ৪২), 'তুমি এদের অধিকাংশকেই দেখবে পাপাচার ও সীমালংঘনের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছে' (সূরা মায়েদা : ৬২), 'এরা সূদখোর, অথচ এদের জন্যে সূদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো', 'এরা লোকদের ধন-মাল খেয়ে ফেলে' (সূরা নিসা : আয়াত ১৬১) ইত্যাদি। এছাড়া বাকারা, মায়েদা, আলে-ইমরান প্রভৃতি সূরায় এ ধরনের আরো বহু মন্তব্য বিধৃত হয়েছে। এসব মন্তব্য শুনে মাত্র কতিপয় সত্যসন্ধ লোক ছাড়া তাদের বেশির ভাগ লোকই অত্যন- ক্ষুব্ধ হলো এবং অন্ধভাবে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় লেগে গেলো।

৩. ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে তারা স্পষ্টত আশংকাবোধ করছিলো যে, একদিন না একদিন এর সামনে তাদের মাথা নত করতে হবেই। এসব কারণেই ইহুদীরা ইসলামী আন্দোলনের ঘোরতর দুশমন বনে গেলো।

amarboi.org

amarboi.org

বনী কায়নুকার যুদ্ধ

বদরের মুসলমানদের জয়লাভের পরই ইহুদীদের সর্বপ্রথম চৈতন্যোদয় হলো। তারা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করলো যে, ইসলাম একটি অপরাজেয় শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে। তাই বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরই- দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে- ইহুদীদের বনী কায়নুকা গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো এবং হযরত (স) - এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভেঙে দিলো। এই যুদ্ধের একটি মুখ্য কারণ ছিলো এইঃ এক ইহুদী জনৈক মুসলিম মহিলার শ্লীলতাহানি করে। এ ঘটনায় উক্ত মহিলার স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে একজন ইহুদীকে মেরে ফেলে। এরপর ইহুদীরা একজন মুসলমানকে হত্যা করে। হযরত (স) বিষয়টির আপোষ-রফার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইহুদীরা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বললো : 'আমরা বদরে পরাজিত কুরাইশ নই। আমাদের সঙ্গে যখন বেধে গেছেই, তখন যুদ্ধ কাকে বলে তা আমরা দেখিয়ে দেবো।'

এভাবে চুক্তির অমর্যাদা করে ইহুদীরা যখন যুদ্ধের হুংকার ছাড়লো, তখন হযরত (স)-ও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। ইহুদীরা একটি কিল্লার মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলো। কিল্লাটি পনেরো দিন অপরাধের পর স্থির করা হলো যে, ইহুদীদের নির্বাসিত করা হবে। ফলে সাত শ' ইহুদীকে নির্বাসিত করা হলো।

কা'ব বিন আশরাফের হত্যা

কা'ব বিন আশরাফ ছিলো ইহুদীদের একজন খ্যাতনামা কবি। সে যুগে কবিদের অত্যন্ত প্রভাব ছিলো। তাই বদর যুদ্ধের পর এই লোকটি এমন উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা রচনা করতে লাগলো যে, মক্কায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে উঠলো। বদর যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে সে অত্যন্ত দরদপূর্ণ মার্সিয়া রচনা করলো এবং মক্কায় গিয়ে তা লোকদের শুনাতে লাগলো। অতঃপর সে মদীনায় এসে হযরত (স)-কে হত্যা করার নানারূপ আপত্তিকর কবিতা রচনা করলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করতে লাগলো। এমন কি, একবার একটি নিমন্ত্রণের ভাব করে সে হযরত (স)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লোকটি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কে হযরত (স) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। অবশেষে তাঁর সম্মতিক্রমে তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা) কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করেন।৪৩

বনু নযীরের নির্বাসন

বনু নযীর গোত্রের ইহুদীগণ কয়েকটি ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। তারাও হযরত (স)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কয়েকবার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। এ উদ্দেশ্যে মক্কার কুরাইশরাও তাদেরকে উস্কানি দিলো। তাদের এই আচরণ যখন সীমা অতিক্রম করে গেলো, তখন হযরত (স) তাদের কিল্লা অবরোধ করে ফেললেন। এই অবরোধ ১৫ দিন পর্যন্ত অব্যাহত রইলো। অবশেষে তারা এই মর্মে সন্ধি করলো যে, উটের পিঠে চাপিয়ে যতটুকু সম্ভব, ততোটুকু মাল-পত্র নিয়ে তারা মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। এই সন্ধি অনুযায়ী তাদের বহু সর্দার খায়বর চলে গেলো। তারা নিজেদের সঙ্গে বহু সামান্তপত্র নিয়ে গেলো। যে সব সামান তারা নিতে পারেনি তা-ই শুধু ফেলে গেলো।

এবার মুসলমানদের উভয় দুশমন অর্থাৎ মুশরিক আরব (বিশেষত মক্কার কুরাইশ) এবং ইহুদীগণ মিলে ইসলামকে ধ্বংস করার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলো। অবশেষে তারা সবাই মিলে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল এবং এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলো। প্রথম দিকে হযরত (স) এই প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে তাদের মুকাবিলার জন্যে মুসলমানদের একটি কাহিনী নিয়ে কিছু দূর অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্তু দুশমানরা মুকাবিলা না করে পালিয়ে গেলো। এভাবে পঞ্চম হিজরীর মুহররম মাসে একবার তিনি 'জাতুরাকা' এবং রবিউল আউয়াল মাসে আর একবার 'দমমাতুল জুনদাল' পর্যন্ত অভিযান চালালেন।

.

amarboi.org

amarboi.org

খন্দকের যুদ্ধ

মদীনা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বনু নযীর গোত্রের লোকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা আশপাশের গোত্রগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললো। মক্কায় গিয়ে কুরাইশদেরকে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলো এবং এই মর্মে প্রস্তাব দিলো যে, সবাই মিলে এক সংগে হামলা করলে এই নয়া আন্দোলনকে খুব সহজে ধ্বংস করে দেয়া যাবে। কুরাইশরা এরূপ প্রস্তাবের জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। অবশেষে ইহুদী ও কুরাইশদের সমবায়ে প্রায় দশ হাজার লোকের এক বিরাট বাহিনী গঠিত হলো।

হযরত (স) মদীনা আক্রমণের এই বিপুল আয়োজন সম্পর্কে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারেসীর (রা) পরামর্শ দিলেন যে, এতো বড়ো বাহিনীর সঙ্গে খোলা ময়দানে মুকাবিলা করা সমীচীন হবে না। আমাদের সৈন্যদেরকে মদীনার নিরাপদ স্থানেই থাকতে হবে এবং দুশমনরা যাতে সরাসরি হামলা করতে না পারে, সেজন্যে নগরীর চারদিকে পরিখা (খন্দক) খনন করতে হবে। ৪৪ এই অভিমতটি সবার মনোপুত হলো এবং পরিখা খননের প্রস্তুতি চলতে লাগলো।

খন্দকের প্রস্তুতি

মদীনার তিন দিক ঘর-বাড়ি ও খেজুর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত আর একদিক মাত্র উন্মুক্ত ছিলো। হযরত (স) তিন হাজার সাহাবী নিয়ে সে উন্মুক্ত দিকেই পরিখা খননের আদেশ দিলেন। পঞ্চম হিজরীর ৮ জিলকদ এই খনন কার্য শুরু হলো। হযরত (স) নিজে পরিখার খনন কাজ উদ্বোধন করলেন এবং প্রতি দশজন লোকের মধ্যে দশ গজ ভূমি বন্টন করে দিলেন। পরিখার প্রস্ত পাঁচ গজ এবং গভীরতা পাঁচ গজ। বিশ দিনে তিন হাজার মুসলমান এ বিরাট পরিখা খনন করে ফেললেন। পরিখা খননকালে হযরত (স) সকল লোকের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত রইলেন। ঘটনাক্রমে এক জায়গায় একটি বিরাটাকার পাথর সামনে পড়লে। সেটাকে কোনো প্রকারেই ভাঙা যাচ্ছিলো না। হযরত (স) সেখানে গিয়ে এরূপ জোরে কোদাল মারলেন যে, পাথরটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। এ ঘটনাও নবী করীম (স)-এর একটা বিশিষ্ট মু'জিজা।

কাফিরদের হামলা

কাফিরদের সৈন্য বাহিনী তিন দলে বিভক্ত হয়ে তিন দিক থেকে মদীনার ওপর হামলা করলো। এই হামলা ছিলো অত্যন্ত প্রচণ্ড ও ভয়াবহ। কুরআন পাকের সূরা আহযাব এর ১০ এবং ১১ নং আয়াতে নিম্নোক্ত ভাষায় এই হামলার চিত্র আঁকা হয়েছেঃ

যখন দুশমনরা ওপর (পূর্ব) ও নীচের (পশ্চিম) দিক থেকে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, যখন চক্ষু ফেটে যাবার উপক্রম হলো এবং কলিজা মুখের কাছে আসতে লাগলো আর তোমরা খোদা সম্পর্কে নানারূপ সন্দেহ করতে লাগলে, ঠিক তখন মুমিনদের পরীক্ষার সময় এলো বেং তীব্রভাবে ভূ-কম্পন সৃষ্টি হলো।

এটা ছিলো বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়। একদিকে প্রচণ্ড শীতকাল, খাদ্য-দ্রব্যের অভাব, উপর্যুপরি কয়েক বেলা অনশন, রাতের নিদ্রা আর দিনের বিশ্রাম উধাও, প্রতিটি মুহূর্ত জীবনের ভয়, মালমাত্তা ও সন্তানাদি দুশমনের আঘাতের মুখে আর অন্যদিকে বেশুমার শত্রুসৈন্য । এমনিতরো সংকটাবস্থায় যাদের ঈমান ছিলো সাচ্চা ও সুদৃঢ়, কেবল তারাই সত্যের পথে অবিচল থাকতে পারছিলো। দুর্বল ঈমানদার ও মুনাফিকগণ এ পরিস্থিতির আদৌ মুকাবিলা করতে পারছিলো না; বরং মুসলমানদের সমাজ-সংগঠনে যে সব মুনাফিক অনুপ্রবেশ করেছিলো, তারা এ সময় খোলাখুলিভাবে আত্নপ্রকাশ করলো। তারা বলতে শুরু করলো : 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের কাছে বিজয় ও সাহায্যের যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ধোকা।' (আহযাব:আয়াত ১২) । এর পাশাপাশি তারা নিজেদের জান বাঁচানোর জন্যে নানারূপ বাহানা তালাশ করতে লাগলো এবং : 'হে মদীনাবাসী! ফিরে চলো, আজ আর তোমাদের রক্ষা নেই।' তারা নবী করীম (স) -এ সামনে এসে বলতে শুরু করলোঃ 'আমাদেরকে ঘর-বাড়িতে থেকে আত্নরক্ষা করার অনুমতি দিন; আমাদের বাড়ি-ঘর সম্পূর্ণ অরক্ষিত।' (আহযাব : আয়াত ১৪)।

কিন্তু যাদের ভেতর যথার্থ ঈমান ছিলো এবং যারা ঈমানের দাবিতে ছিলো সত্যবাদী, এ সময় তাদের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা কাফিরদের সৈন্য-সামন্ত দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো :

amarboi.org

amarboi.org

'আল্লাহ এবং রাসূল তো আমাদের সঙ্গে এরই (অবস্থার) ওয়াদা করেছিলেন। পরন্ত এ অবস্থা দেখে তাদের ভেতর ঈমানের ভাবধারা আরো সতেজ হয়ে উঠলো এবং অধিকতর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার জন্যে তারা প্রস্তুত হলো। এই কঠিন অবস্থা তাদের ভেতরে অনু পরিমাণও পরিবর্তন ঘটাতে পারলো না। (সূরা আহযাব : ২২ ও ২৩ আয়াত)

দুশমনরা প্রায় এক মাসকাল মদীনা অবরোধ করে রইলো। এই অবরোধ এতো কঠিন ছিল যে, মুসলমানদেরকে একাধিক্রমে তিন-চার বেলা পর্যন্ত অনশনে কাটাতে হলো। এভাবে অবরোধ অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক রূপ পরিগ্রহ করলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবরোধকারীরা কিছুতেই পরিখা পার হতে পারলো না। এ কারণে তারা অপর পারেই অবস্থান করতে লাগলো। হযরত (স) তাঁর সৈন্যদেরকে পরিখার বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করলেন। কাফিররা বাহির থেকে পাথর ও তীর ছুঁড়তে লাগলো। এদিক থেকেও তার প্রত্যুত্তর দেয়া হলো। এরই ভেতর বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি হামলাও চলতে লাগলো। কখনো কখনো কাফিরদের আক্রমণ এতো তীব্রতর রূপ ধারণ করতে লাগলো যে, তাদেরকে পরিখার এপার থেকে প্রতিহত করার জন্যে পূর্ণ দৃঢ়তর সাথে মুকাবিলা করতে হলো। এমন কি এর ফলে দু-একবার নামায পর্যন্ত কাযা হয়ে গেলো।

আল্লাহর সাহায্য

অবরোধ যতো দীর্ঘায়িত হলো, হানাদাদের উৎসাহও ততোটা হ্রাস পেতে লাগলো। দশ-বারো হাজার লোকের খানাপিনার ব্যবস্থা করা মোটেই সহজ কাজ ছিলো না। তদুপরি ছিলো প্রচণ্ড শীত। এরই মধ্যে একদিন এমনি প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইলো যে, কাফিরদে সমস্ত ছাউনি উড়ে গেলো। তাদের সৈন্য-সামন্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো। তাদের ওপর যেন খোদার মূর্তিমান আযাব নেমে এলো। আর বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্যে রহমত এবং কাফিরদের জন্যে আযাব হিসেবেই এ ঝড় প্রেরণ করেছিলেন। এই ঘটনাকে আল্লাহ তাঁর একটি অনুগ্রহরূপে আখ্যায়িত করে বলেছেনঃ

'হে মুমিনগণ! খোদার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমদের ওপর সম্মিলিত বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আর আমি তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বইয়ে দিলাম এবং এমন সৈন্য (ফেরেশতা) পাঠালাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি। (সূরা আহযাব : আয়াত ৯)

তাই কাফিরগণ এ পরিসি'তির মুকাবিলা করতে পারলো না। তাদের মেরুদণ্ড অচিরেই ভেঙে পড়লো। অবস্থা বেগতিক দেখে ইহুদীরা আগেই কেটে পড়েছিলো। এখন বাকী রইলো শুধু কুরাইশরা। তাই তাদেরও ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। এভাবে শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর অদৃশ্য সাহায্যে মদীনার আকাশে ঘনীভূত ঘনঘটা আপনা-আপনি কেটে গেলো। কুরআন মজীদে এই যুদ্ধের কাহিনী যে ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্যে যে সব উপাদান রয়েছে, তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর ভরসা

মুমিনের প্রত্যয় হচ্ছে এই যে, প্রকৃত শক্তি আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। বিশ্বজাহানে যা কিছু ঘটে, তা শুধু তাঁরই অভিপ্রায় ও হুকুম অনুসারে ঘটে থাকে। মুমিন তার কোনো সাফল্যকেই আপন চেষ্ট-সাধনা বা নিজস্ব শক্তির ফল মনে করে না; বরং তাকে মনে করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ (ফযল)। দৃষ্টন্ত স্বরূপ বলা যায়ঃ খন্দক যুদ্ধের সময় দশ-বারো হাজার কাফির সৈন্য তিন হাজার মুসলমানের কোনোই ক্ষতি করতে পারলো না; বরং তাদেরকে দিশেহার হয়ে ফিরে যেতে হলো। এই পরিস্থিতিকে কিছু মুসলমান হয়তো নিজেদের চেষ্টা-তদবিরের (পরিখা খননের) ফল মনে করতে পরতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই দুর্বলতা থেকে বাঁচানোর জন্যে পূর্বাহ্নে ইরশাদ করলেনঃ 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের ওপর সম্মিলিত বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এবং আমরা তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দিলাম আর এমন সৈন্য পাঠালাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি'। (আহযাবঃ ৯)

বস্তত ইসলামী আন্দোলনের অনুবর্তীদের জন্যে এরূপ নৈতিক প্রশিক্ষণই একান্ত প্রয়োজন। তাদের প্রতি মুহূর্ত এটা স্মরণরাখা আবশ্যক যে, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যতো বড়োই হোক না কেন, তারা শুধু আল্লাহর অনুগ্রহের ওপরই ভরসা করবে এবং তাঁকেই সমস্ত কাজের নিয়ামক মনে করে দ্বীন-ইসলামের জন্যে সর্বাত্নক চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে।

amarboi.org

amarboi.org

ঈমানের দাবি যাচাই

মানুষের ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়। তখন সে নিজে যেমন নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি অপরেও আন্দাজ করতে পারে যে, এই পথে সে কতোখানি অবিচল থাকতে সক্ষম। স্বাভাবিক অবস্থায় বহু লোক সম্পর্কেই এটা অনুমান করা যায় না যে , উদ্দেশ্যের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা এ জীবন পণ করার সংকল্পে তারা বাস্তবিকই কতোটা প্রস্তুত, বরং কখনো কখনো তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে একটা ধোকায় পড়ে থাকে। কিন্তু যখন কোনো সংকটকাল আসে, তখন আসল ও মেকীর পার্থক্যটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। খন্দক যুদ্ধ এই কাজটিই করেছে। মদীনার মুসলমানদের দলে এক বিরাট সংখ্যক মুনাফিক ও মেকী ঈমানদার ঢুকে পড়েলিলো। তাদের সত্যিকার পরিচয়টা সাধারণ মুসলমানদের সামনে উদঘাটন করার প্রয়োজন ছিলো। তাই এই সংকটের মাধ্যমে তাদের মুখোসটি খসে পড়লো। ক্রমাগত পরিখা খনন করা, খানাপিনা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে রাত-দিন একাকার করে দেয়া, একটি বিরাট বাহিনীর মুকাবিলার জন্যে জীবন হাতে নিয়ে তৈরী থাকা, সর্বোপরি কুড়ি-বাইশ দিন পর্যন্ত ক্রমাগত ভীতি ও শংকার মধ্যে রাতের ঘুম ও দিনের বিশ্রাম হারাম করে দেয়া কোনো সহজ কাজ ছিলোনা। তাদের অনেকেই বরং বলতে লাগলো : 'রাসূল আমাদের কাছে বিজয় ও সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন; কিন্তু এখন তো দেখছি হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, আল্লাহ ও রাসূল আমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন তা নিছক একটি ধোকা মাত্র।' (আহযাব)। কিছু লোক আবার নানারকম বাহানা তালাশ করে ফিরছিলো। তারা আপন ঘর-বাড়ির হেফাজতের বাহানায় ময়দান থেকে সরে পড়লো। পক্ষান্তরে আল্লাহর যে সব বান্দাহ সাচ্চা ঈমানের অধিকারী ছিলো, তারা এ অবস্থায় স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করলো। তারা শত্রুসৈন্যদেরকে এগিয়ে আসতে দেখেই বলতে লাগলো : 'ঠিক ঠিক এমনি অবস্থার কথাই আল্লাহ এবং রাসূল আমাদেরকে আগে জানিয়েছিলেন, আল্লাহ ও রাসূল তো এরই ওয়াদা করেছিলেন আমাদের কাছে। আল্লাহ ও রাসূল তো সত্য কথাই বলেছেন। এই অবস্থায় তাদের ভেতর ঈমানের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেলো এবং তারা অধিকতর আনুগত্য ও ফর্মাবরদারির জন্যে প্রস্তুত হলো।' (আহযাব)

দুর্বলতার উৎস-২

জান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা হচ্ছে মানুষের সবচাইতে বড়ো দুর্বলতা; বরং বলা চলে, সমস্ত দুর্বলতার মূল উৎস। আল্লাহর সত্ত্বা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে ইসলাম যে ধরণের ঈমান আনার দাবি জানায়, তাতে মূলগতভাবে এই আকীদা শামিল রয়েছে যে, জীবন-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। অপর কোনো শক্তি মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে পারে না। এমনি প্রত্যয় এবং এমনি ঈমানই হচ্ছে শক্তির মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি যতোটা দুর্বল হবে, মুসলমানের প্রতিটি কাজে ততোটা দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে। তাই এই দুর্বলতাকে দূর করার জন্যে সুস্পষ্টভবে জানিয়ে দেয়া হলোঃ 'হে নবী! তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যার ভয়ে পালাতে চাও তো পালিয়ে দেখ; এরূপ পলায়নে তোমাদের কোনোই ফায়দা হবে না। তাদেরকে আরো বলে দিন যে, (তারা চিন্তা করে দেখুব) আল্লাহ যদি তাদের কোনো ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তাদেরকে আর কে বাঁচাতে পারে? আর যদি আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন তাদের কোনো উপকার করার, তাহলে তাঁকে আর কে প্রতিরোধ করতে পারে? (তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে না পাবে পৃষ্ঠপোষক আর না পাবে মদদগার।' (আহযাব : আয়াত ১৭)

রাসূলের অনুকরণীয় আদর্শ

এই যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেই মুসলমানদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হলো যে, রাসূল (স) -এর জীবন হচ্ছে তোমাদের জন্যে অনুকরণীয় আদর্শ। তবে যারা আল্লাহ তা'আলার দীদার এবং আখিরাতের প্রাপ্য পুরস্কারের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে খুব বেশি পরিমাণ স্মরণ করে, এ আদর্শ থেকে কেবল তারাই ফায়দা হাসিল করতে পারে। এ প্রসঙ্গে ইসলামপন্থীদের মনোবল বজায় রাখা এবং চরম সংকটকালে তাদের অন্তরকে সুদৃঢ় রাখার জন্যে পূর্ণ ধৈর্য-স্থৈর্য, কঠোর সংকল্প ও খোদা-নির্ভরতার কিছু নমুনা পেশ করা হলো। যারা আল্লাহর দ্বীনকে বাস্তবে কায়েম কতে ইচ্ছুক এবং এ উদ্দেশ্যেই এ পথের অগ্রপথিক, খোদার সেইসব বান্দার জন্যে এ নমুনা কিয়ামত পর্যন্ত অনুকরণযোগ্য হয়ে থাকবে। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ নমুনা তাদের সামনে রাখা উচিত। কারণ এ-ই হচ্ছে তাদের জন্যে প্রকৃত আলোকবর্তিকা।

amarboi.org

amarboi.org

বনু কুরায়জার ধ্বংস

ইতঃপূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, হযরত (স) মদীনায় আসার পর ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন। প্রথম দিকে কিছুদিন ইহুদীরা সে সব চুক্তির ওপর অটল থাকলেও অত্যল্প দিনের মধ্যেই তারা বেপরোয়া ভাবে চুক্তি ভঙ্গ করতে লাগলো। এর ফলে তাদের বনু নযীর গোত্রকে মদীনার থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়েছিলো; কিন্তু বনু কুরায়জা আবার চুক্তি সম্পাদন করেলো এবং হযরত (স) তাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে আপন কিল্লায় থাকার অনুমতি দিলেন।

কিন্তু খন্দক যুদ্ধের সময় ইহুদী গোত্রসমূহ বনু কুরায়জাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিলো এবং তারাও এ যুদ্ধে শত্রু পক্ষে যোগদান করলো। তারা হযরত (স)-এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কোনোই মর্যাদা রাখলো না। তাই খন্দকের ঘনঘটা কেটে যাবার পরই হযরত (স) সর্বপ্রথম বনু কুরায়জার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং তাদেরকে এ বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে যথোচিত শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের অপরাধ ছিলো বনু নযীরের অপরাধের চেয়েও মারাত্নক। কেননা তারা এরূপ এক সংকটাবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা করলো, যখন গোটা আরব জনগোষ্ঠী মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এবং দৃশ্যত তাদের টিকে থাকবার আর কোনো উপায় ছিলো না। তারা মুসলমানদের সাথে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চুক্তি নির্মমভাবে লংঘন করে তারা মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করার উদ্দেশ্যে শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলালো। এভাবে নিজেদের আচরণ দ্বারাই বনু কুরাইয়জা এটা প্রমাণ করে দিয়েছিলো যে, তারা মুসলমানদেতর পক্ষে প্রকাশ্য শত্রুর চেয়েও বেশি মারাত্নক ।

তাই যুদ্ধের পর হযরত (স) তাদের কিল্লা অবরোধ করলেন। অবরোধ প্রায় এক মাসকাল অব্যাহত থাকলো। অবশেষেষ বাধ্য হয়ে তারা আত্নসমর্পণ করলো। অতঃপর তাদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতের বিধি মুতাবেক এই মর্মে ফয়সালা করা হলো যে, তাদের সমস্ত যুদ্ধোপযোগী লোককে হত্যা করা হবে এবং বাকী লোকদের বন্দী করে রাখা হবে। এছাড়া তাদের সমস্ত মালপত্র বাজেয়াপ্ত করা হবে। এই ফয়সালা অনুসারে প্রায় চারশ লোককে হত্যা করা হলো। এর মধ্যে একজন মহিলাও ছিলো। তার অপরাধ ছিলো এই যে, সে কিল্লার প্রাচীরের ওপর থেকে পাথর ফেলে একজন মুসলমানকে হত্যা করেছিলো।

amarboi.org

amarboi.org

হুদাইবিয়া সন্ধির পটভূমি

কা'বা ছিলো ইসলামের মূল কেন্দ্র। এটি আল্লাহর নির্দেমানুক্রমে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) নির্মাণ করেছিলেন। মুসলমানরা ইসলামের এই কেন্দ্রস্থল থেকে বেরোবার পর ছয়টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিলো। পরন্ত হজ্জ ইসলামের অন্যতম মৌল স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও তারা এটি পালন করতে পারছিলো না। তাই কা'বা শরীফ জিয়ারত ও হজ্জ উদযাপন করার জন্যে মুসলমানদের মনে তীব্র বাসনা জাগলো।

কা' বা জিয়ারতের জন্যে সফর

আরবরা সাধারণত তামাম বছরব্যাপী যুদ্ধে মেতে থাকতো। কিন্তু হজ্জ উপলক্ষে লোকেরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে কা'বা পর্যন্ত যাতায়াত করতে এবং নিশ্চিন্তে আল্লাহর ঘরের জিয়ারত সম্পন্ন করতে পারে, এজন্যে চার মাসকাল তারা যুদ্ধ বন্ধ রাখতো। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত (স) কা'বা জিয়ারতের সিদ্ধান্ত নিলেন। এহেন সৌভাগ্য লাভের জন্যে বহু আনসার ও মুহাজির প্রতীক্ষা করছিলো। তাই চৌদ্দ শ' মুসলমান হযরত (স)-এর সহগামী হলেন। যুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা কুরবানীর প্রাথমিক রীতিসমূহ পালন করলেন। এভাবে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, মুসলমানদের উদ্দেশ্য শুধু কা'বা শরীফ জিয়ারত করা, কোনোরূপ যুদ্ধ বা আক্রমণের অভিসন্ধি নেই। তবুও কুরাইশদের অভিপ্রায় জেনে আসবার জন্যে হযরত (স) এক ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করলেন। সে এই মর্মে খবর নিয়ে এলো যে, কুরাইশরা সমস্ত গোত্রকে একত্রিত করে মুহাম্মদ (স)-এর মক্কায় প্রবেশকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন কি, তারা মক্কার বাইরে এক জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করতেও শুরু করেছে এবং মুকাবিলার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে।

কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনা

এই সংবাদ জানার পরও হযরত (স) সামনে অগ্রসর হলেন এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করলেন। এ জায়গাটি মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত।৪৫ এখানকার খোজায়া গোত্রের প্রধান হযরত (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললো : 'কুরাইশরা লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।' হযরত (স) বললেন : 'তাদেরকে গিয়ে বলো যে, আমরা শুধু হজ্জের নিয়্যাতে এসেছি, লড়াই করার জন্য নয়। কাজেই আমাদেরকে কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও জিয়ারত করার সুযোগ দেয়া উচিত।' কুরাইশদের কাছে যখন এই পয়গাম গিয়ে পৌঁছলো, তখন কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলে উঠলো : 'মুহাম্মদের পয়গাম শোনার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।' কিন্তু চিন্তাশীল লোকদের ভেতর থেকে ওরওয়া নামক এক ব্যক্তি বললো : 'না, তোমরা আমার উপর নির্ভর করো; আমি গিয়ে মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে কথা বলছি।'

ওরওয়া হযরত (স)-এর খেদমতে হাযির হলো বটে, কিন্তু কোনো বিষয়েই মীমাংসা হলো না। ইতোমধ্যে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্যে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলো এবং তারা মুসলমানদের হাতে বন্দীও হলো; কিন্তু হযরত (স) তাঁর স্বভাবসুলভ করুণার বলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। এর পর সন্ধির আলোচনা চালানোর জন্যে হযরত উসমান (রা) মক্কায় চলে গেলেন; কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদেরকে কা'বা জিয়ারত করার সুযোগ দিতে কিছুতেই রাযী হলো না; বরঞ্চ তারা হযরত উসমান (রা)-কে আটক করে রাখলো।

রিযওয়ানের শপথ

এই পর্যায়ে মুসলমানদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছলো যে, হযরত উসমান (রা) নিহত হয়েছেন। এই খবর মুসলমানদেরকে সাংঘাতিকভাবে অস্থির করে তুললো। হযরত (স) খবরটি শুনে বললেন : 'আমাদেরকে অবশ্যই উসমান (সা)-এর রক্তের বদলা নিতে হবে।' একথা বলেই তিনি একটি বাবলা গাছের নীচে বসে পড়লেন। তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করলেন : 'আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো, তবু লড়াই থেকে পিছু হটবো না। কুরাইশদের কাছ থেকে আমরা হযরত উসমান (রা)-এর রক্তের বদলা নেবোই।' এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মুসলমানদের মধ্যে এক আশ্চর্য উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো। তারা শাহাদাতের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হলেন। এরই নাম হচ্ছে 'রিযওয়ানের শপথ'। কুরআন পাকেও এই শপথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে সব ভাগ্যবান ব্যক্তি এ সময় হযরত (স)-এর পবিত্র হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে পুরস্কৃত করার কথা বলেছেন।

amarboi.org

amarboi.org

হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলী

মুসলমানদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা কুরাইশদের কাছেও গিয়ে পৌঁছলো। সেই সঙ্গে এ-ও জানা গেলো যে, হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার খবর সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে কুরাইশরা সন্ধি করতে প্রস্তুত হলো এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে সুহাইল বিন্ আমরকে দূত বানিয়ে পাঠালো। তার সঙ্গে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলোচনা হলো এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধির শর্তাবলী স্থিরিকৃত হলো। সন্ধিপত্র লেখার জন্যে হযরত আলী (রা)-কে ডাকা হলো। সন্ধিপত্রে যখন লেখা হলো 'এই সন্ধি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর তরফ থেকে তখন কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল প্রতিবাদ জানিয়ে বললো : 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি লেখা যাবে না; এ ব্যাপারে আমাদের আপত্তি আছে।' একথায় সাহাবীদের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। সন্ধিপত্র লেখক হযরত আলী (রা) কিছুতেই এটা মানতে রাযী হলেন না। কিন্তু হযরত (স) নানাদিক বিবেচনা করে সুহাইলের দাবি মেনে নিলেন এবং নিজের পবিত্র হাতে 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি কেটে দিয়ে বললেন : 'তোমরা না মানো, তাতে কি? কিন্তু খোদার কসম, আমি তাঁর রাসূল।' এরপর নিম্নোক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলোঃ

১. মুসলমানরা এ বছর হজ্জ না করেই ফিরে যাবে।
২. তারা আগামী বছর আসবে এবং মাত্র তিন দিন থেকে চলে যাবে।
৩. কেউ অস্ত্রপাতি নিয়ে আসবে না। শুধু তলোয়ার সঙ্গে রাখতে পারবে: কিন্তু তাও কোষবদ্ধ থাকবে, বাইরে বের করা যাবে না।
৪. মক্কায় সে সব মুসলমান অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। আর কোনো মুসলমান মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তাকেও বাধা দেয়া যাবে না।
৫. কাফির বা মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোনো মুসলমান মক্কায় গেলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।
৬. আরবের গোত্রগুলো মুসলমান বা কাফির যে কোনো পক্ষের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।
৭. এ সন্ধি-চুক্তি দশ বছরকাল বহাল থাকবে।
দৃশ্যত এই শর্তাবলী ছিলো মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী আর মুসলমানরা যে চাপে পড়েই এ সন্ধি করেছিলো, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছিলো।

হযরত আবু জান্দালের ঘটনা

সন্ধিপত্র যখন লিখিত হচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনাচক্রে সুহাইলের পুত্র হযরত আবু জান্দাল (সা) মক্কা থেকে পালিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শৃংখলিত অবস্থায় মুসলমানদের সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং সবাইকে নিজের দুর্গতির কথা শোনালেন। তাঁকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কি কি ধরণের শাস্তি দেয়া হয়েছে, তা-ও সবিস্তারে খুলে বললেন। অবশেষে তিনি হযরত (স)-এর কাছে আবেদন জানালেন : 'হুযুর আমাকে কাফিরদের কবল থেকেকে মুক্ত করে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন ।' একথা শুনে সুহাইল বলে উঠলো : 'দেখুন, সন্ধির শর্ত নিয়ে যেতে পারেন না।' এটা ছিলো বাস্তবিকই এক নাজুক সময়। কারণ, আবু জান্দাল ইসলাম গ্রহণ করে নির্যাতন ভোগ করছিলেন এবং বারবার ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন : 'হে মুসলিম ভাইগণ! তোমরা কি আমাকে আবার কাফিরদের হাতে তুলে দিতে চাও?' সমস্ত মুসলমান এই পরিস্তিতিতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলো। হযরত উমর (রা) তো রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ পর্যন্ত বললেন যে, 'আপনি যখন আল্লাহর সত্য নবী, তখন আর আমরা এ অপমান কেন সইব? হযরত (স) তাকে বললেন : 'আমি খোদার পয়গাম্বর, তাঁর হুকুমের নাফরমানী আমি করতে পারিন না। খোদা-ই আমায় সাহায্য করবেন।'

মোটকথা, সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হলো। সন্ধির শর্ত মুতাবেক আবু জান্দালকে ফিরে যেতে হলো। এভাবে ইসলামের পথে জীবন উৎসর্গকারীরা রাসূলের আনুগত্যের এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। একদিকে ছিলো দৃশ্যত ইসলামের অবমাননা ও হযরত আবু জান্দালের শোচনীয় দুর্গতি আর অন্যদিকে ছিলো রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিরংকুশ আনুগত্যের প্রশ্ন।

হযরত (স) আবু জান্দালকে বললেন : 'আবু জান্দাল! ধৈয্য ও সংযমের সাথে কাজ করো। খোদা তোমার এবং অন্যান্য মজলুমের জন্যে কোনো রাস্তা বের করে দিবেনই। সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে। কাজেই আমরা তাদের তাদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারি না।' তাই আবু জান্দালকে সেই শৃংখলিত অবস্থায়ই ফিরে যেতে হলো।

amarboi.org

amarboi.org

হুদাইবিয়া সন্ধির প্রভাব

সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হবার পর হযরত (স) সেখানেই কুরবানী করার জন্যে লোকদেরকে হুকুম দিলেন। সর্বপ্রথম তিনি নিজেই কুরবানী করলেন। সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর হযরত (স) তিন দিন সেখানে অবস্থান করলেন। ফিরবার পথে সূরা ফাতাহ নাযিল হলো। তাতে এই সন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে এতে 'ফাতহুম মুবীন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হলো। যে সন্ধি-চুক্তি মুসলমানরা চাপে পড়ে সম্পাদন করলো, তাকে আবার 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যা দেয়া দৃশ্যত একটি বেখাপ্পা ব্যাপার ছিলো। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্টত প্রমাণ করে দিলো যে, ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবয়ার সন্ধি ছিলো একটি বিরাট বিজয়ের সূচনা মাত্র। এর বিস্তৃত বিবরণ হচ্ছে নিম্নরূপ :

এতদিন মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পুরোপুরি একটা যুদ্ধংদেহী অবস্থা বিরাজ করছিলো। উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার কোনোই সুযোগ ছিলো না। এই সন্ধি-চুক্তি সেই চরম অবস্থার অবসান ঘটিয়ে রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলো। এরপর মুসলমান ও অমুসলমানরা নির্বাধে মদীনায় আসতে লাগলো। এভাবে তারা এই নতুন ইসলামী সংগঠনের লোকদেরকে অতি নিকট থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পেলো। এর পরিণতিতে তারা বিস্ময়কর রকমে প্রভাবিত হতে লাগলো। যে সব লোকের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্রোধ ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়েছিলো, তাদেরকে তারা নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে আপন লোকদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত মানের দেখতে পেলো। তারা আরো প্রত্যক্ষ করলো, আল্লাহর যে সব বান্দাহর বিরুদ্ধে তারা এদ্দিন যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করে আসছে, তাদের মনে কোনে ঘৃণা বা শত্রুতা নেই; বরং তাদের যা কিছুই ঘৃণা, তা শুধু বিশ্বাস ও গলদ আচার-পদ্ধতির বিরুদ্ধে। তারা (মুসলমানরা) যা কিছুই বলে,তার প্রতিটি কথা সহানুভূতি ও মানবিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ। এতো যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও তারা বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সহানুভূতি সদাচরণের বেলায় কোনো ত্রুটি করে না।

পরন্ত এরূপ মেলামেশার ফলে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের সন্দেহ ও আপত্তিগুলো সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা করাও প্রচুর সুযোগ হলো। এতে করে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমরা কতোখানি ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত ছিলো, তা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলো। মোটকথা, এই পরিস্থিতি এমনি এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো যে, অমুসলিমদের হৃদয় স্বভাবতঃই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। এর ফলে সন্ধির-চুক্তির মাত্র দেড়-দুই বছরের মধ্যে এতো লোক ইসলাম গ্রহণ করলো যে, ইতঃপূর্বে কখনো তা ঘটেনি। এরই মধ্যে কুরাইশদের কতিপয় নামজাদা সর্দার ও যোদ্ধা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলালো। হযরত খালিদ বিন্ অলিদ (রা) এবং হযরত আমর বিন্ আস (রা) এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর ফলে ইসলামের প্রভাব-বলয় এতোটা বিস্তৃত হলো এবং তার শক্তিও এতোটা প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করলো যে, পুরনো জাহিলিয়াত স্পষ্টত মৃত্যু-লক্ষণ দেখতে লাগলো। কাফির নেতৃবৃন্দ এই পরিস্থিতি অনুধাবণ করে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলো। তারা স্পষ্টত বুঝতে পারলো, ইসলামের মুকাবিলায় তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই অনতিবিলম্বে সন্ধি-চুক্তি ভেঙে দেয়ার এবং এর ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে প্রতিরোধ করার জন্যে আর একবার ইসলামী আন্দোলনের সাথে ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ তারা খুঁজে পেলো না। এই চুক্তি ভঙ্গের কথা পরে মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে আলোচিত হবে।

amarboi.org

amarboi.org

সম্রাটদের নামে পত্রাবলী

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে হযরত (স) ইসলামের দাওয়াত প্রচারের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। একদিন তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন : 'হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা আমাকে তামাম দুনিয়ার জন্যে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন (আমার বাণী সারা দুনিয়ার জন্যে প্রযোজ্য এবং এটা সবার জন্যে রহমত স্বরূপ)। দেখো, ঈসার হাওয়ারীদের (সঙ্গী-সাথী) ন্যায় তোমরা মতানৈক্য করো না। যাও, আমার পক্ষ থেকে সবার কাছে সত্যের আহবান পৌঁছিয়ে দাও।'

এ সময়, অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরীর শেষ কিংবা সপ্তম হিজরীর শুরুতে তিনি বড়ো বড়ো রাজা-বাদশার নামে আমন্ত্রণ-পত্র লেখেন।৪৬ এসব পত্র নিয়ে বিনন্ন সাহাবীকে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। ইতিহাসে যে সব আমন্ত্রণ-পত্রের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. রোম সম্রাট (কাইসার) হিরাক্লিয়াসের নামে পত্র - ওহিয়া কালবী (রা) নিয়ে যান।
২. পারস্য সম্রাট (কিসরা) খসরু পারভেজের নামে পত্র-হযরত আবদুল্লাহ বিন্ খাজাফা সাহমী (রা) নিয়ে যান।
৩. মিশরের শাসক আজীজের নামে পত্র-হযরত হাতিম বিন্ আবী বালতায়া (রা) নিয়ে যান।
৪. আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নামে পত্র- হযরত উমর বিন্ উমাইয়া (রা) নিয়ে যান।৪৭

রোম সম্রাটের নামে

রোম সম্রাটের কাছে যে পত্র প্রেরিত হয়, তা নিম্নরূপঃ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের প্রধান শাসক হিরাক্লিয়াসের নামে।

'যে ব্যক্তি সত্যাপথ (হেদায়েত) অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহবান জানাচ্ছি।'

'আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ফর্মাবর্দারী কবুল করো, তুমি শান্তিতে থাকবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। কিন্তু তুমি যদি আল্লাহর ফর্মবর্দারী থেকে বিমুখ হও তাহলে তোমার দেশবাসীর (অপরাধের) জন্যে তুমি দায়ী হবে। (কারণ তোমার অস্বীকৃতির কারণেই তাদের কাছে ইসলামের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছতে পারবে না।'

'হে আহলি কিতাব ! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান; তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবো না, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের মধ্যেও কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজের প্রভু বানাবো না। কিন্তু তোমরা যদি এ কথা মানতে অস্বীকৃত হও, তাহলে (আমরা স্পষ্টত বলে দিচ্ছি যে,) তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম (অর্থাৎ আমরা শুধু খোদারই আনুগত্য ও বন্দেগী করে যাবে।'

amarboi.org

amarboi.org

আবু সুফিয়ানের সাথে কথাবার্তা

হযরত ওহিয়া কালবী (রা) এই পত্রগুলি বসরায় অবস্থানরত কাইসারের প্রতিনিধি হারি গাস্‌সালীর নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। গাস্‌সালী তখন কাইসারের অধীনে সিরিয়া শাসন করতো। সে পত্রখানি কাইসারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। কাইসাস পত্র পেয়েই আরবের কোনো অধিবাসীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। ঐ সময় বাণিজ্য উপলক্ষে আবু সুফিয়ান উক্ত এলাকায় অবস্থান করছিলো। কাইসারের কর্মচারীরা তাকেই দরবারে উপস্থিত করলো। তার সঙ্গে কাইসারের নিম্নরূপ কথাবার্তা হলো :

কাইসার ; নবুয়্যাতের দাবিদার লোকটির খান্দান কিরূপ?
আবু সুফি : সে শরীফ খান্দানের লোক।
কাইসার : এ খান্দানের কেউ আর কেউ নবুয়্যতের দাবি করেছিলো?
আবু সুফি : কক্ষনো নয়।
কাইসার : এই খান্দানে কেউ কখনো বাদশাহ ছিলো কি?
আবু সুফি : না।
কাইসার : যারা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা কি গরীব না ধনবান?
আবু সুফি : গরীব শ্রেণীর লোক।
কাইসার : তার অনুগামীর সংখ্যা বাড়ছে না হ্রাস পাচ্ছেঃ
আবু সুফি : ক্রমশ বেড়ে চলেছে।
কাইসার : তোমরা কি তাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখেছো?
আবু সুফি : কক্ষনো নয়।
কাইসার : সে কি চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে থাকে?
আবু সুফি : এ পর্যন্ত সে কোনো চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনি। তবে তার সাথে একটি নতুন চুক্তি (হুদাইবিয়া সন্ধি) সম্পাদিত হয়েছে। এখন সে চুক্তির উপর অটল থাকে কিনা , দেখা যাবে।
কাইসার : তোমরা তার সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করেছো?
আবু সুফি : হ্যাঁ, করেছি।
কাইসার : যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে?
আবু সুফি : কখনো আমরা জিতেছি, কখনো তার জয় হয়েছে।
কাইসার : সে লোকদের কি শিক্ষা দিয়ে থাকে?
আবু সুফি : সে বলে, কেবল এক খোদার বন্দেগী করো। অপর কাউকে তার সঙ্গে শরীক করো না। নামায পড়ো। পুত-পবিত্র থাকো। সত্য কথা বলো। একে অপরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো ইত্যাদি।

এই কথাবার্তার পর কাইসার বললোঃ ‘পয়গাম্বর হামেশাই ভালো খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। যদি এ লোকটির খান্দানের প্রভাব বলে বিবেচনা করা যেতো-বলা যেতো, রাজত্বের লিপ্সায়ই হয়তো সে এই কৌশল অবলম্বন করেছে। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। আর যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, লোকদের ব্যাপারে সে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি, তখন সে খোদার ব্যাপারে এতো বড় মিথ্যা খাড়া করেছে (যে খোদা তাঁকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন), এটা কি করে বলা যায়? তাছাড়া পয়গাম্বরদের প্রথম দিককার অনুসারীরা স্বভাবতঃই গরীব শ্রেণীর লোক হয়ে থাকে। সত্য ধর্মও হামেশা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরন্ত এ-ও সত্য যে, পয়গাম্বররা কখনো কাউকে ধোঁকা দেন না, কারো সঙ্গে ফেরেববাজীও করেন না। সর্বোপরি, তোমরা এও বলছো যে, সে নামায-রোযা, পাক-পবিত্রতা, খোদা-নির্ভরতা ইত্যাদির উপদেশ দিয়ে থাকে। এ সব যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁর আধিপত্য একদিন নিশ্চিত রূপে আমার রাজত্য পর্যন্ত পৌঁছবেই। আমি জানতাম যে, একজন পয়গাম্বর আসবেন; কিন্তু তিনি যে আরবেই জন্ম নেবেন, এটা আমার ধারণা ছিলো না। আমি যদি সেখানে যেতে পারতাম তো নিজেই তাঁর পা ধুয়ে দিতাম।’

কাইসারের এসব অভিমত শুনে তাঁর দরবারের পাদ্রী ও আলেমরা ভীষণ খাপ্পা হলো। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশংকা পর্যন্ত দেখা দিলো। এই আশংকার ফলেই কাইসারের হৃদয়ে যে সত্যের আলো জ্বলে উঠেছিলো, তা আবার নিভে গেলো। বাস্তবিকই সত্যকে গ্রহণ করার পথে ধন-মাল ও ক্ষমতার মোহই সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

amarboi.org

amarboi.org

পারস্য সম্রাটের নামে

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নামে নিম্নোক্ত পত্র লেখা হলো :

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের তরফ থেকে পারস্যের প্রধান শাসক কিসরা সমীপে।

'যে ব্যক্তি সত্যপথ (হেদায়েত) অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সমস্ত মানুষের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত পয়গাম্বর, যেনো প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে (আল্লাহর নাফরমানীর) মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে পারি। তুমিও আল্লাহর আনুগত্য ও ফর্মাবর্দারী কবুল করো। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে। নচেত অগ্নিপূজকদের পাপের জন্যে তুমি দায়ী হবে।'

খসরু পারভেজ ছিলো প্রবল প্রতাবান্বিত সম্রাট। তার কাছে প্রথম খোদার নাম, তারপর পত্র-প্রেরকের নাম এবং তারপর সম্রাটের নাম লেখা, তাও আবার নিতান্ত সাদাসিধা ভাবে,তদুপরি দরবারে প্রচলিত কায়দা-কানুন, লিখন-পদ্ধতি ও সম্বোধন রীতির ছাপ পর্যন্ত নেই- পত্র লেখার এ ধরণটাই ছিলো অসহ্য। খসরু পারভেজ এই পত্র দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং বললো : 'আমার গোলাম হয়ে আমায় এমনিভাবে পত্র লেখার স্পর্ধা! একথা বলেই সে পত্রখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো এবং এই নবুয়্যাতের দাবিদারকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে তার সামনে হাযির করার জন্যে তার ইয়েমেনস' গভর্নরকে নির্দেশ পাঠালো।৪৮

ইয়েমেনের গভর্নর হযরত (স)-কে ডেকে নেবার জন্যে তাঁর খেদমতে দুজন কর্মচারী পাঠিয়ে দিলো। এরই মধ্যে খসরু পারভেজের পুত্র তাকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসন দখল করে বসলো। গভর্নর কর্তৃক প্রেরিত কর্মচারীদ্বয় যখন হযরত (স)-এর খেদমতে পৌঁছলো,তখর এ সম্পর্কে তারা কিছুতেই অবহিত ছিলো না। হযরত (স) আল্লাহর নির্দেশক্রমে এ কথা জানতে পারলেন। তিনি কর্মচারীদ্বয়কে এ ঘটনা অবহিত করে বললেন : ''তোমরা ফিরে যাও এবং গভর্নরকে গিয়ে বলো, ইসলামের কর্তৃত্ব শীগগীরই খসরু পারভেজের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছবে।' কর্মচারীদ্বয় ইয়েমেনে ফিরে গিয়ে জানতে পারলো, খসরু পারভেজ সত্য সত্যই নিহত হয়েছে।

আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী ও মিসরের আজীজের নামে

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছেও প্রায় অনুরূপ বিষয়-সম্বলিত পত্র প্রেরণ করা হলো। তার জবাবে তিনি লিখলেন : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি খোদার সাচ্চা পয়গাম্বর।' নাজ্জাশী হযরত জাফরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, একথা ইতঃপূর্বে 'আবিসিনিয়ায় হিজরত' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

মিশরের আজীজ যদিও চিঠি পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন নি।, কিন্তু তিনি পত্র-বাহককে খুব সম্মান করেন এবং উপঢৌকন দিয়ে ফেরত পাঠান।

amarboi.org

amarboi.org

ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা

মদীনা থেকে বনু নযীর গোত্রের লোকদেরকে বহিস্কৃত করার পর তারা খায়বরে এসে বসতি স্থাপন করলো। খায়বর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় দু'শ মাইল উত্ত-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ইহুদীরা কয়েকটি বড়ো সুদৃঢ় কিল্লা নির্মাণ করেছিলো।

খায়বর তখন ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধতার সবচাইতে বড়ো কেন্দ্র এবং ইসলামের পক্ষে একটি স্থায়ী বিপদে পরিণতি হয়েছিলো। খন্দক যুদ্ধের সময় মদীনার ওপর যে প্রচণ্ড হামলা চালান হয়েছিলো, তার মূল কারণ ছিলো এই খায়বরের ইহুদীরাই। সেই চক্রান্ত ব্যর্থক হবার পর ভিন্নতর পন্থায় ইসলামী আন্দোলনের মূলোৎপাটনের জন্যে তারা ক্রমাগত ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগালো। এই উদ্দেশ্যে তারা আরবের বিভিন্ন গোত্র বিশেষত কুরাইশদের সঙ্গে আঁতাত স্থাপন তো করলোই, সেই সঙ্গে মদীনার মুনাফিকদেরও উস্কাতে শুর করলো। তাদেরকে এই মর্মে বুঝানো হলো যে, তারা যদি মুসলমানদের ভেতরে থেকে এদের শিকড় কাটতে থাকে, তাহলে বাইরের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়া সহজতর হবে। ইহুদীদের এই সব চক্রান্তের খবর হযরত (স)-এর কাছেও যথারীতি পৌঁছতে লাগলো। তিনি ইহুদীদেরকে এ জঘন্য তৎপরতা থেকে বিরত হলো না। এমন কি তারা বিভিন্ন গোত্রের কাছ এই মর্মে প্রস্তাব পাঠালো যে, 'আমাদের সঙ্গে মিলে যদি তোমরা মদীনার ওপর হামলা করো, তাহলে তোমাদেরকে স্থায়ীভাবে আপন খেজুর বাগানের অর্ধেক ফসল দিতে থাকবো।' মোটকথা, ইহুদীদের চক্রান্তের ফলে বহু গোত্রের মন-মানস পরিবর্তিত হলো এবং তারা একযোগে মদীনার ওপর হামলা করার ব্যাপরে ঐক্যমত্যে পৌঁছলো।

আক্রমণাত্নক যুদ্ধ

এ যাবত মুসলমানরা যুদ্ধ করে আসছে শুধু আত্নরক্ষার খাতিরে। দুশমনরা তাদেরকে খতম করার জন্যে হামলা চালিয়েছে আর তাঁরা আত্নরক্ষার জন্যে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবংদুশমনরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পলায়ন করেছে। কিন্তু এই স্তরে এসে অবস্থার গতি অন্যদিকে মোড় নিলো। কুফরী শক্তির সুসংহত রূপ নেবার আগেই আক্রমণাত্নক হামলা চালিয়ে তাকে খতম করে দেবার প্রয়োজন দেখা দিলো। কারণ ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার জন্যে যেমন প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধেত্ম প্রয়োজন রয়োছে, তেমনি প্রয়োজন মতো আক্রমণাত্নক হামলা করারও দরকার আছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-পদ্ধতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই জীবন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম ও তাকে নিরাপদ করতে হলে কেবল অন-ইসলামী জিন্দেগী ও জীবন বিধানের অনুপর্তীদের হামলা থেকে আত্নরক্ষা করাই যথেষ্ট নয়; বরং এই জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে কখনো কখনো অন্যান্য বাতিল জীবন পদ্ধতিকে উৎখাত করার জন্যে আক্রমণাত্নক আঘাত হানারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

খন্দক যুদ্ধের পর ইসলামী আন্দোলন এই স্তরেই প্রবেশ করলো। এবার শুধু প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধই নয়; বরং এখন আক্রমণাত্নক মনোভাব নিয়ে বিপদাশংকা চিরতরে মুছে ফেলারই প্রয়োজন দেখা দিলো। তাই খন্দক যুদ্ধের সমআপ্তির পর হযরত আমরা শুধু তার মুকাবিলা করবো, এখন আর এটা চলবে না; বরং এখন আমরা নিজেরাই গিয়ে দুশমনদের ওপর হামলা করবো।৪৯

খায়বর আক্রমণ

এবার খায়বরের ইহূদীদের ক্রমবর্ধমান ফিতনাকে কার্যকর ভাবে প্রতিরোধ করার সময় এসে পড়লো! হযরত [স] খায়বরের ওপর হামলা চালানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এবং ইহুদীদের তরফ থেকে সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করলেন। এটা সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসের ঘটনা। এই হামলার জন্যে তিনি ষোলশ' সৈন্য সঙ্গে নিলেন। এর ভেতরে মাত্র দু'শ ছিলো অশ্ব ও উষ্ট্রারোহী, বাকী সব পদাতিক।

খায়বরে ছয়টি দুর্গ এবং তাতে বিশ হাজার ইহুদী সৈন্য মোহায়েন ছিলো। সেখানে পৌঁছে হযরত (স) নিশ্চিতরূপ জানতে পারলেন যে, ইহুদীরা সত্য সত্যই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত; তারা কোনো অবস্থায়ই কোনো সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করতে রাযী নয়। তিনি সাহাবীদের সামনে জিহাদ সম্পর্কে একটি উদ্দীপনাময় ভাষণ প্রদান করলেন এবং আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে তাদেরকে জীবন পণ করার উপদেশ দিলেন। পর দিন তিনি ইহুদীদের দুর্গগুলো অবরোধ করলেন। অবরোধকালে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হলো। প্রায় বিশ দিন অবরোধের পর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। এই যুদ্ধে ৯৩

amarboi.org

amarboi.org

জন ইহুদী নিহত এবং ১৫ জন মুসলমান শহীদ হলেন। হযরত আলী (রা)-এর হাতে মারহাব নামক ইহুদিদের এক বিরাট পাহলোয়ান নিহত হলো। ইহুদীরা তার বীর্যবত্তার জন্যে গর্ব করতো। তার মৃত্যু তাই এ যুদ্ধের এক বিরাট উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো।

বিজয়ের পর ইহুদীগণ আবেদন জানালো, তাদের কাছে যে সব জমি-জমা রয়েছে, তা তাদেরকেই ছেড়ে দেয়া হলে মুসলানদেরকে তারা অর্ধেক ফসল দিতে থাকবে। তাদের এই আবেদন হযরত (স) মঞ্জুর করলেন। পরবর্তী বছরগুলোতে এই ফসল আদায়ের ব্যাপরে মুসলিম কর্মচারীগণ ইহুদীদের সঙ্গে অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করেন। তাঁরা ফসলকে দু'ভাগে বিভক্ত করতেন এবং কৃষকদের যে ভাগ ইচ্ছা পছন্দ করে নেবার অধিকার দিতেন। এভাবে ফসল আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদের অন্তরও তাঁরা জয় করে নিলেন।

মুসলিম সমাজের প্রশিক্ষণ

ওহুদ যুদ্ধের পর ইসলামী আন্দোলনের জন্যে বাইরের বিপদাশংকা কি পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিলো, খন্দক যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে তা সহজেই আন্দাজ করা চলে। এটি ছিলো অত্যন্ত সংঘাতের সময়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের আহবায়ক একজন জেনারেল হিসেবে যেমন দৃঢ়তার সাথে এসব ঘটনাবলী মুকাবিলা করছিলেন, তেমনি একজন সুদক্ষ নৈতিক শিক্ষক হিসেবেও তিনি আন্দোলনের অগ্রসেনাদের জন্যে যথোচিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছিলেন। তিনি এই নয়া ইসলামী সমাজের জন্যে প্রায়োজনীয় আইন-কানুন ও নিয়ম-বিধি শিক্ষা দেয়া হতো, তা এ সময়ে অবতীর্ণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা অর্থাৎ নিসা ও সূরা মায়েদা অধ্যয়ন করলেই স্পষ্টত অনুমান করা যায়।

সূরা নিসা চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরীর বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ সময়ে অবতীর্ণ হয়। এ সময় নবী করীম (স) এই নতুন ইসলামী সমাজকে পুরনো জাহিলী রীতিনীতি ও বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে কিভাবে নৈতিকতা, কৃষ্টি-সভ্যতা, সামাজিক ও অর্থনীতির নবতর ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন, এ থেকে তা সহজেই আন্দাজ করা চলে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক জীবনেও ইসলামী ধারায় শুধরে নেবার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় পথ নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার নীতি বাতলানো হলো; বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিযম-নীতি জানিয়ে দেয়া হলো; নারী-পুরুষের অধিকার-সীমা নির্দিষ্ট করে সমাজের নান ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা হলো, ইয়াতিম, মিসকীন ও দরিদ্র লোকদের অধিকারের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে তাগিদ করা হলো; সম্পদের উত্তরাধিকর সংক্রান- নীতিভঙ্গি নির্ধারণ করা হলো; পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বাতলে দেয়া হলো, শরাব পানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম-কানুন বলে দেয়া হলো। এভাবে খোদা ও তাঁর বান্দাদের সাথে একজন সৎ লোকের সম্পর্ক সম্বন্ধে মুসলমানদেরকে অবহিত করা হলো। সেই সঙ্গে আহলি কিতাবদের ভ্রান্ত আচরণ ও অসঙ্গত জীবন যাপন পদ্ধতির সমালোচনা করে তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরা হলো এবং মুসলমানদেরকে এ ধরণের ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সতর্ক করে দেয়া হলো।

বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের এ দিকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সংশোধন ছাড়া বাতিলের মুকাবিলায় তার সাফল্য অর্জন কখনোই সম্ভব নয়। অন্য কথায়, ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসেনাদের শুধু ব্যক্তিগত নৈতিকতার দিক থেকেই বাতিলপন্থীদের চেয়ে উন্নত হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং অন-ইসলামী সমাজের তুলনায় সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ একটি আদর্শ সমাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করাও তাদের কর্তব্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কোনো বিশেষ ধরণের উদ্যোগ-আয়োজনের প্রয়োজন নেই; বরং আন্দোলনের অগ্রসেনাদের মধ্যে খোদানির্ভরতা ও খোদাপ্রেমের গুণাবলী সৃষ্টি হতে থাকলে স্বভাবতই এরূপ ফলাফল প্রকাশ পেতে থাকে। এ কারণেই একজন নবীর সংস্কারক ও বিপ্লবাত্নক আন্দোলন অন্যান্য সমস্ত আন্দোলনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে থাকে। নবী সাধারণ লোকদের মধ্যে আদর্শ প্রচার করার জন্যে যতোটা অস্থির হয়ে থাকেন, তাঁর অনুবর্তীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংশোধনের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে থাকেন। ইসলামী আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব সূরা নিসা বক্তব্যেও প্রতিভাত হয়েছে। এই সূরায় নৈতিকতা, কৃষ্টি-সভ্যতা, সামাজিকতা ইত্যাদি বিষয়ে আইন-কানুন বর্ণনার পাশাপাশি দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং মুশরিক ও আহলি কিতাবদেরকে যথারীতি সত্য দ্বীনের দিকে আহবান জানানো হয়েছে।

সূরা মায়েদা হুদাইবিয়া সন্ধির পর প্রায় সপ্তম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা ঐ বছর 'উমরা' করতে পারে নি। তখন স্থির করা হয়েছিলো যে, হযরত (স) পরবর্তী বছর কা'বা জিয়ারত করতে আসবেন ।

amarboi.org

amarboi.org

তাই ঐ সময়ের পূর্বে কা'বা জিয়ারত সম্পর্কে বহু নিয়ম-কানুন বাতলে দেবার প্রয়োজন হলো। এ ছাড়া কাফিরদের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও মুসলমানরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কখনো যাতে সীমালংঘন না করে, সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো।

এ সূরাটি (সুলা মায়েদা) যখন অবতীর্ণ হয়, তখন পর্যন্ত মুসলমানদের অবস্থা অনেক বদলে গিয়েছিলো। ওহুদ যুদ্ধের পরবর্তীকালে মুসলমানরা যে রূপ চারদিক দিয়ে বিপদ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলো, এ সময়টা ঠিক সে রকম ছিলো না। এ সময় ইসলাম নিজেই একটি প্রচণ্ড শক্তির রূপ পরিগ্রহ করেছিলো এবং ইসলামী রাষ্ট্রও যথেষ্ট সমপ্রসারিত হয়েছিলো। মদীনার চারদিকে দে-দুশ' মাইলের মধ্যকার সমস্ত বিরোধী গোত্রের শক্তি এ সময় ভেঙে পড়েছিলো এবং খোদ মদীনা থেকে বিপজ্জনক ইহুদীগণ সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। কোথাও কিছু অবশিষ্ট থাকলে তারাও মদীনা সরকারের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলো। মোটকথা, এ সময় এ সত্য স্পষ্টত প্রতিভাত হয়ে উঠলো যে, ইসলাম শুধু কতিপয় আকীদা-বিশ্বাসেরই সমষ্টি নয়, যাকে প্রচলিত ভাষায় 'ধর্ম' বলা যায় এবং যার সম্পর্ক কেবল মানুষের মন-মগজের সঙ্গে বরং ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-পদ্ধতি, যার সম্পর্ক মানুষের মন-মগজ ছাড়াও তার পূর্ণ জীবনের সঙ্গে; সমাজ, রাষ্ট্র, যুদ্ধ, সন্ধি সব কিছুই তার অন্তর্ভুক্ত। পরন্ত এ সময় মুসলমানরা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। তারা যে জীবন পদ্ধতিকে (দ্বীন) বুঝে-শুনে গ্রহণ করেছিলো , তার ভিত্তিতে তারা নিজেরা নির্বোধ জীবন যাপন করতে পারছিলো। বাইরের অন্য কোনো জীবন পদ্ধতি বা আইন-কানুন তাদের গতিরোধ করতে পাছিলো না; বরং তারা এই দ্বীনের দিকে অন্যান্য লোকদেরকেও আহবান জানাতে সমর্থ হচ্ছিলো।

এ সময় মুসলমানদের নিজস্ব একটি কৃষ্টি-সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো এবং অন্যান্য কৃষ্টি-সভ্যতা থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হতে লাগলো। মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র, তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি, তাদের আচার-ব্যবহার-এক কথায় তাদের জীবনের সমগ্র কাঠামোই ইসলামী নীতির ছাঁচে ঢালাই হতে লাগলো। অন্যান্য জাতির মুকাবিলায় তারা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়ে উঠলো। তাদের নিজস্ব দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রচলিত হলো; নিজস্ব আদালত ও কোর্ট-কাচারী বসলো; লেনদেন ও বেচা-কেনার নিজস্ব পদ্ধতি চালু হলো; উত্তরাধিকার সম্পর্কে একটি স্থায়ী বিধান জারি হলো। এ ছাড়া বিবাহ ,তালাক, পর্দা এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়েও তাদের নিজস্ব আইন-কানুন চালু হলো। এমন কি তাদের উঠা-বসা, খানা-পিনা ও মেলামেশার নিয়ম-কানুন সম্পর্কেও সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ দেয়া হলো।

সূরা মায়েদার হজ্জ সংক্রান- নিয়মাবলী, খাদ্য-দ্রব্যে হারাম-হালালের বাচ-বিচার, অযু-গোসল ও তায়াম্মুমের নিয়মাবলী, শরাব ও জুয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা, সাক্ষ্য আইন সম্পর্কিত নির্দেশাবলী, বিচার ও ইনসাফের ওপর কয়েম থাকার তাগিদ ইত্যাদি সহ ইসলামী সমাজ গঠনের জন্যে অপরিহার্য বিষয়াদি বিবৃত হলো। তাই এর প্রতিটি বিষয়ের প্রতিই অতীব গুরুত্ব আরোপ করা হলো।

উমরা উদযাপন

হুদাইবিয়া সন্ধির একটি শর্ত ছিলো এই যে, মুসলমানরা পর বছর এসে উমরা উদযাপন করবে। তাই পর বছর অর্থৎ সপ্তম হিজরী সালে হযরত (স) মুসলমানদের এক বিরাট কাফেলা নিয়ে কা'বা জিয়ারতের মনস্ত করলেন। এ উপলক্ষে সাহাবীদের মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের আনন্দ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হলো। এ দৃশ্য কাফির কুরাইশদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষের চাপা আগুন আবার জ্বালিয়ে দিলো। এমন কি তাদের ইচ্ছা মাফিক সম্পাদিত সন্ধি-চুক্তিকে এখন নিজেদের কাছেই অর্থহীন বলে মনে হতে লাগলো।

amarboi.org

amarboi.org

মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ

হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তিতে আরব গোত্রগুলোকে এই অধিকার দেয়া হয়েছিলো যে, তারা মুসলমান এবং কাফিরদের মধ্যে যে কোনো পক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। এই শর্তানুযায়ী বনু খোজা'আ গোত্র মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো আর বনু বকর গোত্র মৈত্রী স্থাপন করলো কুরাইশদের সঙ্গে। এভাবে প্রায় দেড় বছর এই সন্ধি-চুক্তি পূর্ণভাবে পালিত হলো। কিন্তু তারপরই এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। ইতঃপূর্বে খোজা'আ ও বকর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বেশ কিছুকাল যাবত লড়াই চলে আসছিলো ; এদের মধ্যে হঠাৎ একদিন বনু বকর গোত্র খোজা'আদেরকে আক্রমণ করে বসলো এবং এ ব্যাপারে কুরাইশগণ বনু বকরকে সাহায্য প্রদান করলো। কারণ খোজা'আ গোত্র তাদের মর্জীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় কুরাইশরা আগে থেকেই তাদের ওপর খাপ্পা ছিলো। এভাবে উভয় পক্ষ মিলে খোজা'আ গোত্রের লোকদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতে শুরু করলো। এমন কি তারা কা'বা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করেও রেহাই পেলো না; বরং সেখানেরও তাদের রক্তপাত করা হলো।

খোজা'আগণ বাধ্য হয়ে হযরত (স)-কে তাদের দুরাবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলো এবং তাঁর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তারা সাহায্য প্রার্থনা করলো। হযরত (স) খোজা'আদের এই মজলুমী অবস্থার কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি এই নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বিরত থাকার এবং নিম্নোক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করার আহবান জানিয়ে কুরাইশদের কাছে একজন দূত প্রেরণ করলেন :

১. খোজা'আদের যে সব লোক নিহত হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অথবা
২. বনু বকরের সাথে কুরাইশদের সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে কিংবা
৩. হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

দূত মারফত এই পয়গাম শুনে কোরতা বিন্ উমর নামক জনৈক কুরাইশ বললো : 'আমরা তৃতীয় শর্তটাই সমর্থন করি।' কিন্তু দূত চলে যাবার পর তাদের খুব আফসোস হলো এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি পুনর্বহাল করার জন্যে নিজেদের পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ানকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করলো। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি, বিশেষত কুরাইশদের এতদিনকার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত (স) তাদের এই নয়া প্রস্তাব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলেন না। তিনি আবু সুফিয়ানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি

কা'বাগ্রহ ছিলো খালেস তওহীদের কেন্দ্রস্থল। নির্ভেজাল খোদার বন্দেগীর জন্যে এটি হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এ যাবতকাল তা মুশরিকদের অধিকারে থেকে শিরকের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র-স্থলে পরিণত হয়েছিলো। হযরত মুহাম্মদ (স) প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রচারিত দ্বীনের আহবায়ক এবং খালেস তওহীদের অনুবর্তী ছিলেন। এ কারণে তওহীদের এই পবিত্র কেন্দ্রস্থলকে শিরকের সমস্ত নাপাকী ও নোংরামি থেকে অবিলম্বে মুক্ত করার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু এতদিন এ অবস্থা অনুকূলে ছিলো না। হযরত (স) এবার অনুমান করতে পারলেন যে, অল্লাহর এই পবিত্র ঘরকে শুধু তাঁরই ইবাদতের জন্যে নির্ধারিত করা এবং মূর্তিপূজার সমস্ত অপবিত্রতা থেকে একে মুক্ত করার উপযুক্ত সময় এসেছে। তাই তিনি চুক্তিবদ্ধ সমস্ত গোত্রের কাছে এ সম্পর্কে পয়গাম পাঠালেন। অন্য দিকে এই প্রস্তুতির কথা যাতে মক্কাবাসীরা জানতে না পারে, সেজন্যে তিনি কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করলেন। প্রস্তুতি কার্য সম্পন্ন হলে অষ্টম হিজরীর ১০ রমযান প্রায় দশ হাজার আত্মোৎসর্গী সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে হযরত (স) মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে অন্যান্য আরব গোত্রও এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলো।

amarboi.org

amarboi.org

আবু সুফিয়ানের গ্রেফতারী

মুসলিম সৈন্যবাহিনী মক্কার সন্নিকটে পৌঁছলে কুরাইশ-প্রধান আবু সুফিয়ান গোপনে তাদের সংখ্যা-শক্তি আন্দাজ করতে এলো। এমনি অবস্থায় হঠাৎ তাকে গ্রেফতার করে হযরত (স)-এর খেদমতে হাযির করা হলো। এ সেই আবু সুফিয়ান, ইসলামের দুশমনি ও বিরুদ্ধতায় যার ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। এই ব্যক্তিই বারবার মদীনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিলো এবং একাধিকবার হযরত (স)-কে হত্যা করার গোপন চক্রান্ত পর্যন্ত ফেঁদেছিলো। এই সব গুরুতর অপরাধের কারণে আবু সুফিয়ানকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা উচিত ছিলো। কিন্তু হযরত (স) তার প্রতি করুণার দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন : 'যাও, আজ আর তোমাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি সমস্ত ক্ষমা প্রদর্শনকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ক্ষমা প্রদর্শনকারী।'

আবু সুফিয়ানের সঙ্গে এই আচরণ ছিলো সম্পূর্ণ অভিনব। রাহমাতুল্লিল আলামীন-এর এই অপূর্ব ঔদার্য আবু সুফিয়ানের হৃদয় -নেত্রকে উন্মীলিত করে দিলো। সে বুঝতে পারলো, মক্কায় সৈন্য নিয়ে আসার পেছনে এই মহানুভব ব্যক্তির হৃদয়ে না প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা আছে আর না আছে দুনিয়াবী রাজা-বাদশাদের ন্যায় কোনো স্পর্ধা-অহংকার। এ কারণেই তাকে মুক্তিদান করা সত্ত্বেও সে মক্কায় ফিরে গেলো না; বরং ইসলাম গ্রহণ করে হযরত (স)-এর আত্মোৎসর্গী দলেরই অন্তর্ভুক্ত হলো।

মক্কায় প্রবেশ

এবার হযরত (স) খালিদ বিন অলীদ (রা)-কে আদেশ দিলেন : 'তুমি পিছন দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করো, কিন্তু কাউকে হত্যা করো না। অবশ্য কেউ যদি তোমার ওপর অস্ত্র উত্তোলন করে, তাহলে আত্মরক্ষার জন্যে তুমি ও অস্ত্র ধারন করো।' এই বলে হযরত (স) নিজে সামনের দিক থেকে শহরে প্রবেশ করলেন। হযরত খালিদ-এর সৈন্যদের ওপর কতিপয় কুরাইশ গোত্র তীর বর্ষণ করলো এবং তার প্রত্যুৎত্তর দিতে হলো। ফলে ১৩ জন হামলাকারী নিহত হলো এবং বাকী সবাই পালিয়ে গেলো। হযরত (স) এই পাল্টা হামলার কথা জানতে পেরে হযরত খালিদ-এর কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে বললেন : 'খোদার ফয়সালা এ রকমই ছিলো।' পক্ষান্তরে হযরত (স) কোনোরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁর সৈন্যদের হাতে একটি লোকও নিহত হলো না।

মক্কায় সাধরণ ক্ষমা

হযরত (স) মক্কায় প্রবেশ করে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বললেন না, বরং তিনি এই মর্মে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেনঃ

১. যারা আপন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে থাকবে,তারা নিরাপদ।
২. যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারও নিরাপদ এবং
৩. যারা কা'বাগৃহে আশ্রয় নেবে, তারাও নিরাপদ।

কিন্তু এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা থেকে এমন ছয়-সাত ব্যক্তি ব্যতিক্রম ছিলো, ইসলামের বিরুদ্ধতায় ও মানবতা বিরোধী অপরাধে যাদের ভূমিকা ছিলো অসাধারণ এবং যাদের হত্যা করার প্রয়োজন ছিলো অপরিহার্য।

নবী করীম (স) কি অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন, তাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পতাকা ছিলো সাদা ও কালো রঙের। মাথায় ছিলো লৌহ শিরস্ত্রাণ এবং তার ওপর ছিলো কালো পাগড়ী বাঁধা। তিনি উচ্চ:স্বরে সূরা ফাতাহ (ইন্না ফাতাহনা) তিলাওয়াত করছিলেন। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা সমীপে তাঁর এমনি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পাচ্ছিলো যে, সওয়ারী উটের পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ার দরুন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল যেনো উটের কুঁজ স্পর্শ করছিলো।৫০

amarboi.org

amarboi.org

কা' বা গৃহে প্রবেশ

হযরত (স) কা'বা মসজিদে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মর্তিগুলোকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তখন কাবাগৃহে ৩৬০ টি মূর্তি বর্তমান ছিলো। তার দেয়ালে ছিলো নানারূপ চিত্র অংকিত। এর সবই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো। এভাবে আল্লাহর পবিত্র ঘরকে শিরকের নোংরামি ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা হলো। এরপর হযরত (স) তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন, কা'বা গৃহ তওয়াফ করলেন এবং 'মাকামে ইবরাহীম'-এ গিয়ে নামায আদায় করলেন। এই ছিল তার বিজয় উৎসব। এ উৎসব দেখে মক্কাবাসীদের হৃদয়-চক্ষু খুলে গেলো। তারা দেখতে পেলো, এতোবড়ো একটি বিজয় উৎসবে বিজয়ীরা না প্রকাশ করলো কোনো শান-শওকত আর না কোনো গর্ব-অহংকার, বরং অত্যন্ত বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে তারা খোদার সামনে অবনমিত হচ্ছে এবং তাঁর প্রশংসা ও জয়ধ্বনি উচ্চারণ করছে। এই দৃশ্য দেখে কে না বলে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাদশাহী কিংবা রাজত্ব জয় নয়, এ অন্য কিছু।

বিজয়ের পর ভাষণ

মক্কা বিজয় সম্পন্ন হবার পর হযরত (স) এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এর কিছু অংশ হাদীস শরীফে বিধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন :

' এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ (ইলাহ) নেই; কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং সমস্ত শত্রবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। জেনে রেখো; সমস্ত গর্ব-অহংকার, সমস্ত পুরনো হত্যা ও রক্তের বদলা এবং তামাম রক্তমূল্য আমার পায়ের নীচে। কেবল কা'বার তত্ত্বাবধান এবং হাজীদের পানি সরবরাহ এর থেকে ব্যতিক্রম। হে কুরাইশগণ! জাহিলী আভিজাত্য ও বংশ-মর্যাদার ওপর গর্ব প্রকাশকে অল্লাহ নাকচ করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ এক আদমের সন্তান আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

অতঃপর তিনি কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেনঃ

'লোক সকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে পয়দা করেছি এবং তোমাদেরকে নানান গোত্র ও খান্দানে বিভক্ত করে দিয়েছি, যেনো তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। কিন্তু খোদার কাছে সম্মানিত হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে অধিকতর পরহেজগার। আল্লাহ মহাবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।'

এর সাথে অন্য কতিপয় জরুরী মসলাও শিক্ষা দেন।

ইসলামের শ্রেষ্ঠতম বিজয়ী তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ের পর যে ভাষণ দান করেন, এই হচ্ছে তার নমুনা। এতে না আছে তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিঘাংসা, না আছে কোনো বিদ্বেষ। এতে না আছে তাঁর আপন কৃতিত্বের কোনো উল্লেখ আর না তাঁর আত্মোৎসর্গী সহকর্মীদের কোনো প্রশংসা, বরং প্রশংসা যা কিছু, তা শুধু আল্লাহরই জন্যে আর যা কিছু ঘটেছে তা শুধু তাঁরই করুণার ফলমাত্র।৫১

আরব দেশে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হতো। বংশের কোনো ব্যক্তি কারো হাতে নিহত হলে ঐ বংশের স্মরণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে তা শামিল করা হতো। এমনকি ভবিষ্যত বংশধররা পর্যন্ত হত্যাকারীর বংশ থেকে নিহত ব্যক্তিদের রক্তের বদলা না নিয়ে স্বস্তি লাভ করতো না। তাই এ উপলক্ষে হযরত (স) এ ধরনের যাবতীয় রক্তের বদলাকে বাতিল করে দিলেন এবং বলা যায়, তিনি আরববাসীদেরকে সত্যিকর অর্থে এক অনাবিল শান্তি ও স্বস্তিময় জীবন প্রদান করলেন। আরবে বংশ ও গোত্র নিয়ে গৌরব করার এক বহু পুরনো ব্যাধি বর্তমান ছিলো। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে এ ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি সম্পূর্ণ অবৈধ। ইসলামে পার্থক্য সৃষ্টির একমাত্র বৈধ মাপকাঠি হচ্ছে খোদায়ী বিধানের আনুগত্যের প্রশ্ন। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের যতো অনুগত হবে, তাঁর সন্তোষ-অসন্তোষকে ভয় করবে, সে ততোই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বলে গণ্য হবে। ইসলামে বংশগত শরাফতের কোনে স্থান নেই। বংশ বা খান্দানের সৃষ্টি কেবল পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে। আল্লাহর রাসূল তাই এই ব্যাধিটিরও মূলোৎপাটন করে দিলেন এবং মানুষের জন্যে এমন এম সাম্যের বাণী ঘোষণা করলেন, আজ পর্যন্ত যা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মই মানুষকে দিতে পারে নি।

amarboi.org

amarboi.org

শত্রুর হৃদয় জয়

হযরত (স) যে জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেখানে বড়ো বড়ো কুরাইশ নেতা, উপস্থিত ছিলো। যে সব ব্যক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে জীবন পণ করেছিলো, সেখানে তারাও হাযির ছিলো। যাদের অকথ্য উৎপীড়নে মুসলমানরা একদিন নিজেদের ঘর-বাড়ি পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো, তারাও সেখানে ছিলো। যারা হযরত (স)-কে গালি-গালাজ করতো, তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো, তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করতো, প্রতি মুহূর্ত তাঁকে হত্যা করার চিন্তা করতো, তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলো। যে পাষণ্ড হযরত (স) -এর আপন চাচার কলিজা বের করে চিবিয়েছিলো, সেও সেখানে হাযির ছিলো। যারা এক খোদার বন্দেগী করার অপরাধে বেশুমার মুসলমানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলো, তারাও সেখানে ছিলো। হযরত (স) এদের সবার দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : 'বলো তো, আজ তোমাদের সঙ্গে আমি কিরূপ আচরণ করবো?' হযরত (স) কিভাবে মক্কায় পদার্পন করেছেন এবং এ পর্যন্ত কিরূপ ব্যবহার করেছেন, লোকেরা তা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলো। তাই তারা সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো :

'আপনি আমাদের সম্ভ্রান্ত ভ্রাতা ও সম্ভ্রান্ত- ভ্রাতুষ্পুত্র।'
একথা শুনেই হযরত (স) ঘোষণা করলেন :
'যাও, আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই; তোমরা সবাই মুক্ত।'

যারা মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর দখল করে নিয়েছিলো, হযরত (স) তাও তাদেরকে প্রত্যর্পন করার ব্যবস্থা করলেন না' বরং মুহাজিরদেরকে নিজেদের দাবি পরিত্যাগ করার উপদেশ দিলেন।

হযরত (স)-এর এই বিস্ময়কর আচরণে মুগ্ধ হয়ে বড়ো বড়ো কুরাইশ নেতা তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লো। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করলো : 'আপনি সত্যি আল্লাহর নবী, কোনো দেশজয়ী বাদশাহ নন। আপনি যে দাওয়াত পেশ করেন, তা ই সত্য।'

এই ছিল মক্কা বিজয়ের দৃশ্য। এ বিজয় কোনো দেশ, সম্পদ বা ধন-রত্ন দখল নয়, এ ছিলো মানুষের হৃদয় - রাজ্য অধিকার আর এটাই ছিলো সবচেয়ে বড়ো জয়।

amarboi.org

amarboi.org

হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের প্রভাব

হযরত (স)-এর দয়া সুলভ আচরণ এং মুসলমানদের সাথে মেলামেশার ফলে একদিকে মক্কায় দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো, অন্যদিকে তামাম আরব গোত্রের ওপর বিজয়ের এর বিরাট প্রভাব পড়লো। তারা বুঝতে পারলো, ইসলামের প্রতি আহবানকারী বাস্তবিকই ধন-দৌলত বা রাজত্বের কোনো কাঙাল নন; বরং তিনি আল্লাহরই পয়গাম্বর। পরন্ত এ সময়ে ইসলাম ও তার বৈশিষ্ট্য কোনো চোরা-গুপ্তা জিনিস ছিলো না; বরং ইসলামী আদর্শের স্বরূপটা প্রায় গোটা আরব দেশই জেনে ফেলেছিলো। যাদের হৃদয়ে বুঝবার শক্তি ছিলো, তারা বুঝে নিয়েছিলো যে, এই হচ্ছে আসল সত্য। তাই মক্কা বিজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরবের দূর-দূরাঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এসে ইসলাম কবুল করতে লাগলো। এতদসত্ত্বেও যে সব লোকের অন্তরে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্তমান ছিলো, তারা এ দৃশ্য দেখে যারপর নাই অস্তির হয়ে উঠলো। তাদের ভেতরে বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এদিক দিয়ে হুনাইনের অধিবাসী হাওয়াজেন ও সাকীফ নামক দুটি গোত্র অত্যন্ত অগ্রবর্তী ছিলো। তারা এমনিতেও খুব যুদ্ধবাজ লোক ছিলো; তদুপরি ইসলামের অগ্রগতি দেখে তারা আরো অস্তির হয়ে পড়লো। তারা স্পষ্টত বুঝতে পারলো, মক্কার পর এবার তাদের পালা। তাই উভয় গোত্রের প্রধানদ্বয় একত্র হয়ে পরামর্শ করলো এবং এই সিদ্ধান্ত নিলো যে, পরিস্তিতি যা-ই হোক না কেন, দৃঢ়তার সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে হবে। কারণ ক্রমবর্ধমান বিপদকে প্রতিরোধ করতে না পারলে তাদের কল্যাণ নেই। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা মালিক ইবনে আওফ নাযারী নামক তাদের জনৈক সর্দারকে বাদশাহ মনোনীত করলো এবং মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্যে সর্বাত্নক প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। এ ব্যাপারে তারা আরো বহু গোত্রকে নিজেদের সঙ্গী বানিয়ে নিলো।

হুনাইনের যুদ্ধ

এ প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে নবী করীম (স)-ও সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই ক্রমবর্ধমান ফিতনাকে সময় থাকতেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অষ্টম হিজরীর ১০ শাওয়াল প্রায় বারো হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে হযরত (স) দুশমনের মুকাবিলার জন্যে রওয়ানা হলেন। ঐ সময় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো বিপুল আর তাদের যুদ্ধ-সরঞ্জামও ছিলো প্রচুর। এটা দেখেই তাদের মনে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মালো যে, দুশমনরা তাদের মুকাবিলা করতে কিছুতেই সমর্থ হবে না; বরং অচিরেই তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এমন কি, কোনো কোনো মুসলমানের মুখ থেকে এ উক্তি পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লো : 'আজ আর আমাদের ওপর কে জয়লাভ করতে পারে কিন্তু এরূপ ধারণা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কিছুমাত্রও সামঞ্জস্যশীল ছিল না। কারণ তাদের কখনো আপন শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভরসা করা উচিত নয়। তাদের শক্তি হওয়া উচিত শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণা। কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

'হুনাইনের দিনকে স্মরণ করো, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যতে তুষ্ট ছিলে; কিন্তু তাতে তোমাদের কোনো কাজ হয়নি; বরং জমিন প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের ওপর নিজের তরফ থেকে সান্ত্বনা ও প্রশান্তির ভাবধারা নাযিল করলেন এবং তোমরা দেখতে পাওনি এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শাস্তি দিলেন। কাফিরদের জন্যে এমনি শাস্তিই নির্ধারিত।' (সূরা তাওবাঃ ২৫,২৬)

হুনাইন হচ্ছে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। এখানেই এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা সামনে আসা মাত্র দুশমনরা আশ-পাশের পাহাড় থেকে এলোপাথাড়ি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। এ পরিস্থিতির জন্যে মুসলমানরা মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। এর ফলে তাদের সৈন্যদলে বিশৃংখলা দেখা দিলো এবং কিছুক্ষণের জন্যে তারা ময়দান ত্যাগ করলো। অনেক বেদুইন গোত্র ময়দান থেকে পালিয়ে গেলো। এদের মধ্যে সবেমাত্র ঈমান এনেছে এবং পূর্ণ প্রশিক্ষণ পায়নি এমন অনেক নও-মুসলিমও ছিলো। এই বিশৃংখল পরিস্থিতিতে হযরত (স) অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রশান্ত চিত্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দুশমনদের মুকাবিলা করা ও ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার জন্যে মুসলমানদের প্রতি ক্রমাগত আহবান জানাতে লাগলেন। তাঁর এই অপূর্ব ধৈর্য-স্থৈর্য এবং তাঁর চারপাশে বহু সাহাবীর অকৃত্রিম দৃড়তা দেখে

amarboi.org

amarboi.org

মুসলিম সৈন্যরা পুনরায় ময়দানে আসতে শুরু করলো এবং নবতর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীদের এই ধৈর্য ও দৃঢ়তাকেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ সান্ত্বনা ও প্রশান্তির লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো এবং মুসলমানরা পুরোপুরি জয়লাভ করলো। কাফিরদের প্রায় ৭০ ব্যক্তি নিহত এবং সহস্রাধিক লোক বন্দী হলো।

দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন ও কল্যাণ কামনা

কাফিরদের বাকি সৈন্যদের পালিয়ে গিয়ে তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কারণ তায়েফকে একটি নিরাপদ স্থান মনে করা হতো। হযরত (স) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং তায়েফ অবরোধ করলেন। তয়েফে একটি মশহুর ও মজবুত দুর্গ ছিলো। এর ভেতরেই কাফিরগণ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। অবরোধ প্রায় বিশ দিন অব্যাহত রইলো। হযরত (স) যখন ভালোমতো বুঝতে পারলেন যে, দুশমনদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে এবং এখন আর তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার কোনো আশংকা নেই, তখন তিনি অবরোধ তুলে নিলেন এবং তাদের জন্যে দোআ করলেন : 'হে আল্লাহ! সাকীফ গোত্রকে সুপথ প্রদর্শন করো এবং তাদেরকে আমার কাছে হাযির হবার তাওফিক দাও।' কেবল দ্বীন-ইসলামের জন্যে সংগ্রামকারী খোদার নবী ছাড়া কে এমনি পরিস্থিতিতে একখানি দয়ার্দ্র হৃদয় ও স্নেহশীল হতে পারে এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে কল্যাণ কামনা করতে পারে?

amarboi.org

amarboi.org

তাবুক যুদ্ধ

রোম সাম্রাজ্যের সথে সংঘর্ষ

তখন আরব দেশের উত্তরে ছিলো বিশাল রোম সাম্রাজ্য। মক্কা বিজয়ের আগে থেকেই এই সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। নবী করীম (স) সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী গোত্রসমূহের নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন। এই গোত্রগুলোর অধিকাংশই ছিলো খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। এই গোত্রগুলোর অধিকাংশই ছিলো খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা মুসলিম প্রতিনিধি দলের পনেরো ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললো। শুধু প্রতিনিধি দলের নেতা কা'ব বিন উমর গিফারী প্রাণ নিয়ে ফিলে এলেন। ঐ সময় হযরত (স) বসরার গভর্নর শেরজিলের নামেও ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে এক পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত গভর্নরও রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্ত বলে হযরত (স)-এর প্রতিনিধি হযরত হারিস বিন আমীরকে হত্যা করলো। এই সব কারণে সিরিয়ার সীমান্ত এলাকাবর্তী মুসলমানদেরকে একেবারে দুর্বল ভেবে কেউ যাতে উত্যক্ত করতে সাহসী না হয়, সে জন্যে হযরত (স) অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে তিন হাজার মুসলমানের এক বাহিনী প্রেরণ করলেন। এই বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়েই শেরজিল প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মুকাবিলার জন্যে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু মুসলমানরা এ সংবাদ জানতে পেরেও সামনে এগুতে লাগলো। রোম সম্রাট তখন হাম্‌স নামক স্থানে অবস্থান করছিলো। কিন্তু মুসলমানরা তা সত্ত্বেও যথারীতি অগ্রসর হতে লাগলো। অবশেষে 'মুতা' নামক স্থানে এই পদক্ষেপের ফলে বিপুল সংখ্যক রোমক সৈন্যের মুকাবিলায় এই নগণ্য সংখ্যক মুসলিম সৈন্যের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু আল্লাহর ফযলে রোমকদের এতোবড়ো বাহিনীও মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করতে পারলো না; বরং তারাই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। এই ঘটনায় আশপাশের সমগ্র গোত্রের ওপর মুসলমানদের মোটামুটি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এর ফলে দূর-দূরান্ত এলাকার গোত্রসমূহ পর্যন্ত ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করলো।

এর মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হলো এই যে, ফারওয়া বিন আমর আল -জাজামী নামক রোমক বাহিনীর একজন অধিনায়ক ইসলামের শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। এই ব্যক্তি তাঁর ঈমানদারীর কি বিরাট প্রমাণ দিয়েছিলেন, তাও লক্ষ্য করবার মতো। তাঁকে বন্দী করে দরবারে এনে রোম সম্রাট কাইসার বললো :

'ইসলাম ত্যাগ করে আপন পদে পুনর্বহাল হও, নতুব মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।' জবাবে তিনি পদমর্যাদার ওপর পদাঘাত হেনে বললেন : 'আখিরতের সাফল্যের বিনিময়ে দুনিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত নই।' অবশেষে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো। এই ঘটনার ফলে হাজার হাজার লোক ইসলামের নৈতিক শক্তি এবং তার যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলো। তারা বুঝতে পারলো যে, প্রবল সয়লাবের ন্যাগ অগ্রসরমান এই আন্দোলনের মুকাবিলা করা কোনো চাট্টিখানি কথা নয়।

কাইসারের পক্ষ থেকে হামলার প্রস্তুতি

পর বছরই রোম সম্রাট কাইসার মুসলমানদের কাছ থেকে মুতা' যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সিরীয় সীমান্তে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দিলো এবং তার অধীনস্থ আরব গোত্রসমূহের নিকট থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলো। এ প্রস্তুতির কথা নবী করীম (স) যথাযময়ে জানতে পারলেন। এ মুহূর্তটি ছিলো মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত সংকটজনক। এ সময়ে সামান্য মাত্র গাফলতি দেখালেও সমস্ত কাজ বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিলো। একদিকে মক্কা অভিযান ও হুনাইন যুদ্ধে পরাজিত আরব গোত্রগুলো মাথা তুলে দাঁড়াতো, অন্যদিকে শত্রু পক্ষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী মদীনার মুনাফিকরাও ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণে ইসলামী সমাজের মধ্যে ভয়ঙ্কর ফাসাদ সৃষ্টি করে দিতো। তার ফলে যুগপৎ আন্দোলন ও সংগঠনকে সামলানোই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়তো। এমনি সময়ে রোমক শক্তির সর্বাত্নক হামলার মুকাবিলা করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না। এমন কি, এই বিরাট হামলা মুকাবিলা করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না। এমন কি, এই বিরাট হামলার মুকাবিলা করতে না পেরে কুফরের কাছে ইসলামী আন্দোলনের পরাজিত হবার আশংকা পর্যন্ত ছিলো। এ সমস্ত কারণেই হযরত (স) তাঁর খোদা-প্রদত্ত অতুলনীয় দূরদৃষ্টির বলে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, এ সময় কাইসার বাহিনীর মুকাবিলা করাই সমীচীন। কারণ এ সময় আমাদের সামান্য মাত্র দুর্বলতা প্রকাশ পেলেও এতদিনের গড়া সমস্ত কাজ বানচাল হয়ে যেতে পারে।

amarboi.org

amarboi.org

মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত

কিন্তু এ সময় মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছিলো এক কঠিন পরীক্ষার শামিল। দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা, তদুপরি প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল। ক্ষেতের ফসল পাকতে প্রায় শুরু করেছিলো। যুদ্ধের সামান-পত্রও পুরো ছিলো না। সফর ছিলো দীর্ঘ পথের । সর্বোপরি মুকাবিলা ছিলো এক বিশাল বাহিনীর সঙ্গে। এতদসত্ত্বেও নবী করীম (স) পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে যুদ্ধের কথা ঘোষণা করলেন এবং কোথায় কি উদ্দেশ্যে যেতে হবে, তাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, এতদিন ইসলামী আন্দোলন শুধু খোলাখুলিভাবে বহিঃশত্রুর সঙ্গেই মুকাবিলা করে আসছিলো। আর মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধের পর বিরুদ্ধবাদীদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছিলো। কিন্তু এ যাবত ঘরোয়া শত্রু অর্থাৎ মুনাফিকদের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমাসুলভ আচরণই করা হচ্ছিলো। এর একটি কারণ ছিলো এই যে, একই সঙ্গে ঘরের ও বাইরের শত্রুদের সাথে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা এতদিন ইসলামী আন্দোলন হাসিল করতে পারেনি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মুনাফিকদের মধ্যে সবাই একই ধরনের লোক ছিলো না। তাদের মধ্যে কিছু লোকের হৃদয়ে হয় ঈমানের দুর্বলতা ছিলো, নতুবা কিছু কিছু ক্ষেতে তারা শোবা-সন্দেহ পোষণ করতো। এই ধরণের লোকদের আপন দুর্বলতা ও শোবা-সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যে একটা যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত সুযোগ দেবার প্রয়োজন ছিলো। অন্যদিকে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করার জন্যে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এমন সব দুশমনদেরকেও ভালমতো চিহ্নিত করে নেয়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। তাই এতদিন পর্যন্ত এই সব লোককে নরম - গরম সকল প্রকারেই বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে যাদের ভেতর সামান্য মাত্রও যোগ্যতা ছিলো, তারা সোজা পথে চলে এলো। কিন্তু এক্ষণে সে সুযোগটিও শেষ হয়ে গেলো। মুসলমানরা দেশের ভেতরকার বিরুদ্ধবাদীদের বহুলাংশে প্রভাবাধীন করে নিয়েছেন। এবার বিদেশী শক্তির সঙ্গে তাদের মুকাবিলা শুরু হতে যাচ্ছে। এমনি নাজুক অবস্থার কারণেরই ঘরোয়া শত্রুদের মাথা গুড়িয়ে দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। নচেত এরা বাইরে শত্রুদের সঙ্গে যোগ সাজশে কখন কি ক্ষতি করে বসে, কে জানে!

মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে কয়েকটি জিনিসের একান্ত প্রয়োজন ছিলো। যেমনঃ তাদের খোলাখুলিভাবে সামনে আসা, তাদের চেহারা থেকে ঈমান ও ইসলামের মুখোশ অপসারিত হওয়া, তাদের আসল পরিচয়টা গোটা ইসলামী সমাজের জেনে নেয়া, সর্বোপরি মুসলমানদের ব্যাপারে মুসলমান হিসেবে তাদের নাক গলানো এবং ইসলামী সমাজ সংগঠনে সাচ্চা মুসলমানদের ন্যায় মর্যাদা লাভের সুযোগ না থাকা। তাই তাবুক যুদ্ধের এই ঘোষণা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচনে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হলো। যারা ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী ছিলো, এ সময়ে তারা মনে-প্রাণে জিহাদের জন্যে তৈরি হয়ে গেলো। তারা অর্থ-কড়ি র প্রয়োজন হওয়ামাত্র যার কাছে যা ছিলো, সবই এনে হাযির করলো। এমন কি সওয়ারীর অভাবে হযরত (স)-এর সহযাত্রী হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কিছু লোক কেঁদে ফেললো। এভাবে এসলামী সমাজ সংগঠনে কে কে নিষ্ঠাবান ছিলো, তা সুস্পষ্টভাবে জানা গেলো।

পক্ষান্তরে যাদের হৃদয়ে ঈমানের নাম-নিশানা ছিলো না, যুদ্ধের ঘোষণা শুনেই যেনো তাদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো। তারা নানারূপ বাহানা ও অজুহাত তালাশ করতে লাগলো এবং যুদ্ধে যাবার জন্যে হযরত (স)-এর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো। এ সময়ও হযরত (স) তাদের সঙ্গে নম্র ব্যবহারই করলেন এবং এদের সবাইকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু এই মুনাফিকদের দল শুধু নিজেরাই যুদ্ধ হতে বিরত থেকে ক্ষান্ত হলো না; বরং এরা অন্যান্য লোকদেরও বিরত রাখার এবং নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করতে লাগলো।

এরা কখনো বলতে লাগলো, 'এতো প্রচণ্ড গরমে যুদ্ধে গিয়ে কি তোমরা প্রাণ হারাবে?' আবার কখনো বললো : 'এতো হচ্ছে জেনে-শুনে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা।' মোটকথা যুদ্ধের ঘোষণা এমন এক কষ্টিপাথরের কাজ করলো যে, সাচ্চা মুমিন আর মুনাফিকদের চেহারা স্পষ্টত পৃথক হয়ে গেলো। এর ফলে এই শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের মোক্ষম সুযোগ পাওয়া গেলো। এ ব্যাপারে হযরত (স) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

amarboi.org

amarboi.org

তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

অবশেষে নবম হিজরীর রজব মাসে হযরত (স) ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা হতে যাত্রা করলেন; এর মধ্যে মাত্র দশ হাজার ছিলো অশ্বারোহী। উটের সংখ্যা এতো কম ছিলো যে, একটি উটের পিঠে পালাক্রমে কয়েকজন করে সৈন্য সওয়ার হতে লাগলো। এরপর ছিলো গ্রীষ্মের প্রচন্ডতা এবং পানির অভাব। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাচ্চা মুমিনগণ এ সময় তাদের ঈমানের পরাকাষ্ঠা, নবীর আনুগত্য এবং আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গের যে আগ্রহ প্রদর্শন করলো, আল্লাহ তা মঞ্জুর করলেন এবং এর বিনিময়ে তিনি এমন ব্যবস্থা করে দিলেন যে মদীনা থেকে নবী করীম (স)-এর রওয়ানা করার উদ্দেশ্য বিনা যুদ্ধেই হাসিল হয়ে গেলো। নবী করীম (স) তাবুক পৌঁছেই জানতে পারলেন যে, রোম সম্রাট কাইসার সীমান্ত থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে; তাই যুদ্ধ করার মত সেখানে আর কেউ বর্তমান নেই।

ব্যাপারটা ঘটেছিলো এই রকম : রোম সম্রাট যখন জানতে পারলো যে, তার এতবড়ো জবরদস্ত প্রস্তুতির খবর পেয়েও মুসলমানরা নিঃশংক চিত্তে তাদের মুকাবিলার জন্যে মদীনা থেকে যাত্রা করেছে এবং ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন সে নিজের সৈন্য সরিয়ে নেয়াই সমীচীন মনে করলো। কারণ এর আগে মুতা' যুদ্ধের সময় এক লাখ সৈন্যের মুকাবিলায় মাত্র তিন হাজার মুসলমান কিরূপ শৌর্য-বীর্য দেখিয়েছিলো, সে অভিজ্ঞতা সম্রাটের মন থেকে মুছে যায়নি। না জানি এবারও পরাজিত হয়ে তার মান-ইজ্জতটুকু একেবারে খতম হয়ে যায়! তাই যখন সে জানতে পারলো, এবার তিন হাজার নয়, ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নবী করীম (স) আসছেন, তখন সে এ সয়লাবের মুকাবিলা না করারই সিদ্ধান্ত করলো।

তাবুকে অবস্থান

কাইসারের এভাবে ময়দান থেকে পশ্চাদপসারণ করাকেই নবী করীম (স) যথেষ্ট মনে করলেন। এরপর তার পশ্চাদ্ধাবনে কালক্ষেপণ করার চেয়ে তিনি ঐ এলাকায় নিজের প্রভাবকে মজবুত করাকে সমীচীন মনে করলেন। তিনি বিশ দিন সেখানে অবস্থান করলেন। এ সময়ে রোম সাম্রাজ্য ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং রোমকদের প্রভাবাধীন কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে তিনি নবীন ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ করে নিলেন। এভাবে যে সব আরব গোত্র এতদিন রোম সম্রাটের সমর্থক ছিলো, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সমর্থক ও সাহায্যকারী বনে গেলো।

মুনাফিকদের চালবাজি

হযরত (স) যখন তাবুক অভিযানে রওয়ানা করলেন, তখন ইসলামী সমাজ-সংগঠনে অনুপ্রবেশকারী কপট মুসলমানরা মদীনায় পড়ে রইলো। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো, মুসলমানরা এ অভিযান থেকে আর নিরাপদে ফিরে আসবে না। তাদের কিছু অংশ গ্রীষ্মের প্রচন্ডতা ও সফরকালীন মুসিবতে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তা না হলেও কাইসারের বিপুল সৈন্যেরা মুকাবিলায় তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই মুনাফিকদের দল মদীনায় একটি চক্রান্তের মসজিদও৫২ বানিয়ে নিয়েছিলো। সেখানে তারা নামাযের বাহানায় সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদাভাবে জমায়েত হতো এবং গোপন সলা-পরামর্শ করতো। তারা এই সংকটকালে ইসলামী আন্দোলনের ওপর চরম আঘাত হানবার জন্যে নানারূপ ষড়যন্ত্র উদ্ভাবন করতে লাগলো। এমন কি, তারা এই সিদ্ধান্ত পর্যন্ত করে বসলো যে, তাবুক যুদ্ধের ফলাফল জানবার পরই (যদিও এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিলো যে, মুসলমানদের পরাজয়ই হবে যুদ্ধের একমাত্র ফলাফল) আব্দুল্লাহ বিন্ উবাইকে মদীনার বাদশাহ নিযুক্ত করা হবে।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় ছিলো অন্য রকম। এবার ইসলামের পরাজয় সম্পর্কে মুনাফিক ও কাফিরদের সমস্ত আশা-ভরসাই চূড়ান্তভাবে বিলীন হওয়ার সেই প্রতীক্ষিত সময়টি ঘনিয়ে এলো। তাই তাবুকের এই বিনা -যুদ্ধে বিজয়ের কথা জানতে পেরে দুশমনদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে পড়লো। তাদের মনে হতে লাগলো, এবার তাদের আশা - ভরসার শেষ সম্বলটুকুও হাতছাড়া হয়ে গেলো। তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত (স)-এর সামনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো :

amarboi.org

amarboi.org

১. মুনাফিকদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ এবং তাদের গোপন চক্রান্ত থেকে ইসলামী আন্দোলনকে সুরক্ষিত করার পরোপুরি ব্যবস্থা করা;

২. মুমিন ও সত্যসন্ধ লোকদের প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের চরিত্র গঠন করে নবী করীম (স)-এর তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠা সৎ লোকদের এই দলটিকে সর্বতোভাবে নিখুঁত করে তোলা এবং 'সত্যের সাক্ষ্য' (শাহাদাতে হক) দানের যে দায়িত্ব শীগগীরই তাদের ওপর ন্যস্ত হতে যাচ্ছে, তা যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রস্তুত করে রাখা;

৩. যে সব মৌল নীতির ভিত্তিতে এই নয়া ইসলামী রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে, দারুল ইসলামের সেই সব নীতি সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা।

মুনাফিকদের সাথে আচরণ

তাবুক থেকে হযরত (স)-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যেই সূরা তাওবা নাযিল হলো। এতে মদীনায় ফিরেই হযরত (স)--কে কার্যকর করতে হবে, আল্লাহ তাঁকে এমনতরো কতিপয় নির্দেশ প্রদান করলেন। এ যাবত মুনাফিকদের ব্যাপারে জন বাঁচানোর জন্যে পেশকৃত অক্ষমতাকে মেনে নেয়া হয়েছিলো, তা সম্পূর্ণ বদলে ফেলার নির্দেশ দেয়া হলো। তারপর সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয় হলো : 'তাদের সঙ্গে এখন আর নমনীয় নয়, কঠোর ব্যবহার করতে হবে; তারা তাদের ঈমানের দাবিকে সত্য প্রমাণের জন্যে আর্থিক সাহায্য দিতে চাইলে তা গ্রহণ করা যাবে না; তাদের ভেতরকার কেউ মারা গেলে নবী করীম (স) তার জানাযা পড়াতে পারবেন না; সর্বোপরি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের কারণেও মুসলমানরা তাদের সঙ্গে আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে পারবে না।'

আবু আমেরের ষড়যন্ত্র

হযরত (স)-এর মদীনা আগমনের পূর্বে আবু আমের নামক জনৈক খ্রিষ্টান পাদ্রীর দরবেশী ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে মদীনায় খুব খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। একজন খোদাভক্ত জ্ঞানী হিসেবে লোকেরা তাকে খুব শ্রদ্ধা করতো। হযরত (স)-এর মদীনায় আসার পর এই দরবেশী ও খোদাভক্তির তাগিদেই তার উচিত ছিলো সত্যের আলো থেকে ফায়দা হাসিল করা এবং সবার আগে খোদা-ভক্তির নির্ভুল ধারণাকেক গ্রহণ করা। কিন্তু ইলম, কালাম ও তাকওয়ার অহমিকা এবং রেওয়াজী ও গতানুগতিক ধার্মিকতার মোহ যেমন মানুষকে সত্যের আলো গ্রহণ থেকে বিরত রাখে, তেমনি আবু আমেরের ওপরও ইসলামী দাওয়াতের প্রতিকূল প্রভাব পড়লো। ধার্মিকতার ব্যবসায়ে তার বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো। সে বুঝতে পারলো, তার ভণ্ড দরবেশী ও পীরবাদী ব্যবসা এই নয়া আন্দোলনের মুকাবিলায় টিকতে পারে না। এ কারণে সে ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো দুশমন হয়ে দাঁড়ালো।

প্রথমত সে আশা করেছিলো যে, এ-তো কেবল দুদিনের চমক মাত্র। এরূপ কঠোর খোদাভক্তি ও দ্বীনদারী কি করে টিকে থাকে? কিন্তু বদর যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় দেখেই তার টনক নড়ে উঠলো। তারপর থেকে সে কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রকে ইসলামে বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্যে আদা-পানি খেয়ে লাগলো। ওহুদের যুদ্ধ ও খন্দকের (আহযাবের) হামলার সময় মুসলমানদের সামনে এরই কিছু নমুনা প্রকাশ পেয়েছিলো। এমন কি, এই ঈসায়ী আহলি কিতাব মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাথে গোপন আঁতাত স্থাপন করতে এবং তওহীদের আলোকবর্তিকাকে নিভানোর জন্যে শিরকের প্রচার করতে এতটুকু লজ্জাবোধ করেনি। কিন্তু আল্লাহর এই ঘোষণা যখন প্রকাশ পেল যে, এ আলোকবর্তিতকাকে ফুৎকার দ্বারা নিভানো যাবে না এবং ইসলামই তামাম আরব উপদ্বীপে বিজয়ী দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তখন এই খোদাভক্ত দরবেশের (?) অস্থিরতা চরমে গিয়ে পৌঁছল। এপর অল্প দিনের মধ্যেই সে বিদেশে গিয়ে বিপদ - সংকেত বাজানো এবং এই ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে প্রতিরোধ করার নিমিত্তে কাইসারকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে রোম সফরে গেলো।

amarboi.org

amarboi.org

চক্রান্তের মসজিদ

আবু আমেরের এই সব চক্রান্তে মদীনার মুনাফিকরা তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলো। এরা আমেরের সাথে মিলে গোপনে পরামর্শ করে ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার পন্থা উদ্ভাবন করতো। তাই আবু আমেরের পরামর্শক্রমে মুনাফিকের দল নিজেদের জন্যে একটি পৃথক মসজিদ বানানোর সিদ্ধান্ত করলো।৫৩ ঐ মসজিদে তারা নামায পড়ার অজুহাতে জমায়েত হতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতো।

তখন মদীনায় দু'টি মসজিদ ছিলো। এর একটি ছিলো শহরের উপকণ্ঠে - কুবা নামক স্থানে আর অপরটি ছিলো শহরের মাঝখানে - মসজিদে নববী নামে যা পরিচিত। এ দুয়ের উপস্থিতিতে কোন তৃতীয় মসজিদের আদতেই প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু কতিপয় বৃদ্ধ ও অক্ষম লোকের ঐ দুই মসজিদে যেতে কষ্ট হয়, এই অজুহাত তুলে মুনাফিকরা একটি তৃতীয় মসজিদ নির্মাণ করলো। তারা কল্যাণ ও বরকতের সাথে এর উদ্বোধন করার নিমিত্ত এতে একবার নামায পড়ানোর জন্যে হযরত (স)-এর কাছে আবেদন জানালো। সে আবেদনের জবাবে হযরত (স) বললেনঃ 'বর্তমানে আমি তাবুক অভিযানের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত; ফিরে আসার পর দেখা যাবে।' কিন্তু ফিরবার সময় পথিমধ্যেই এই চক্রান্তের মসজিদে হযরত (স)-এর নামায পড়ানো নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করলেন। এতে স্পষ্টত বলে দেয়া হলো যে, প্রকৃতপক্ষে এ জায়গাটি হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার একটি গোপন আড্ডা; এ আপনর নামায পড়ানোর উপযোগী নয়। তাই হযরত (স) কতিপয় লোককে তাঁর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই উক্ত মসজিদ ধ্বংস করে ফেলার আদেশ দিলেন। এভাবে উক্ত চক্রান্তের মসজিদ ধ্বংস করে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মনীতিই ঘোষণা করা হলো। এরপর থেকে হযরত (স) এই কর্মনীতিই সর্বত্র অনুসরণ করলেন।

মুমিনদের প্রশিক্ষণ ও তার পূর্ণতা

এখান থেকে ইসলামী আন্দোলন একটি ব্যাপকতর সংগ্রামের পর্যায়ে প্রবেশ করলো। এবার আরবের এই মুষ্টিমেয় মুসলমানদের গোটা অমুসলিম দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীনের পয়গাম ছড়িয়ে দেয়ার অভিযানে বর্হিগত হবার সময় ঘনিয়ে এলো। এহেন অবস্থায় মুসলিমদের ভেতরকার কোনো মামুলি দুর্বলতাও বিরাট অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই, এ সময় মুমিনদের প্রশিক্ষণের পূর্ণতা বিধানের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দেয়া হলো। তাদের ঈমানী দুর্বলাতার প্রতিটি আলামতকে বেছে বেছে চিহ্নিত করা হলো এবং অবিলম্বে তা দূর করার তাগিদ দেয়া হলো।

তাবুক অভিযান কালে ঈমান ও ইসলামের মিথ্যা দাবিদার কিছু লোক যেমন পেছনে পড়েছিলো, তেমনি কিছু দুর্বল-চেতা মুমিনও মদীনায় থেকে গিয়েছিলো। এরা সাচ্চা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কোনো সাময়িক দুর্বলতা বা শৈথিল্যের কারণে এমনি গাফলতি করতে বাধ্য হয়েছিলো। এরূপ দুর্বলতা যাতে আর কখনো প্রকাশ না পায়, সে জন্যে এই শ্রেণীর লোদের সংশোধন করার নিমিত্তে এ সময় অত্যন্ত কঠোর নীতি গ্রহণ করা হলো। এ প্রসঙ্গে হযরত কা'ব বিন্ মালিক, হিলাল বিন্ উমাইয়া এবং মুরারা বিন্ রাবী (রা) এই তিনজন সাহাবীর কাহিনী অত্যন্ত শিক্ষামূলক। তখন মুসলিমদেরকে কি ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছিলো, এই কাহিনীর আলোকে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আন্দাজ করা যায়। এই সাহাবীত্রয় নিঃসন্দেহে সাচ্চা মুমিন ছিলেন এবং এর আগে তাঁদের ঈমানের আন্তরিকতাও প্রমাণিত হয়েছিলো; তবু নিছক শৈথিল্যের দরুন তাঁরা তাবুক অভিযানের সময় হযরত (স)-এর সহযাত্রী হতে পারেন নি। এ জন্যে তাঁদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করা হলো। নবী করীম (স) তাবুক থেকে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে কোনোরূপ সালাম-কালাম না করার জন্যে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন। চল্লিশ দিন পর তাঁদের স্ত্রীদেরকেও আলাদা থাকবার নির্দেশ দেয়া হলো। অতঃপর পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের তওবা কবুল করলেন এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করবার হুকুম দিলেন। এর ভিতর হযরত কা'ব বিন্ মালিকের কাহিনীটি সর্বাধিক শিক্ষামূলক বিধায় তাঁর জবানীতেই এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

হযরত কা'বের কাহিনী

'হযরত (স) যখন তাবুক অভিযানের উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে তৈরি করছিলেন, তখন আমিও তাঁর সঙ্গে চলার জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তারপর গাফলতি করতে লাগলামঃ 'এতো তাড়াহুড়া কেন, সময় যখন আসবে তখন তৈরি হতে বিলম্ব হবে না।' এইভাবে ব্যাপারটা পিছিয়ে যেতে লাগলো। এমন কি যখন রওয়ানা করার সময় এলো, তখন আমি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলাম। মনে মনে বললাম : সৈন্যরা চলে যাক, আমি দু একদিন পর রওয়ান করেও কাফেলার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে পারবো। মোটকথা, এমনি গাফলতির মধ্যেই সময় চলে গেলো; আমি ও আর যেতে পারলাম না।

amarboi.org

amarboi.org

অবশেষে যখন দেখতে পেলাম যে, যাদের সঙ্গে আমি পিছনে পড়ে রয়েছি, তারা হয় মুনাফিক নতুবা এমন দুর্বল যে, আল্লাহই তাদের অক্ষম করে রেখেছেন, তখন আমার হৃদয় অপরিসীম চাঞ্চল্যে উথলে উঠলো। নিজের সম্পর্কে আমার অত্যন্ত আফসোস হলো।

নবী করীম (স) অভিযান থেকে ফিরে এসেই অভ্যাস মতো মসজিদে গিয়ে দু রা'আত নামায পড়লেন। অতঃপর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্যে বসলেন। এবার মুনাফিকরা এসে তাদের ওজর পেশ করতে লাগলো। তারা কসম করে তাদের অক্ষমতা সম্পর্কে হযরত (স)-কে নিশ্চয়তা প্রদান করতে লাগলো। এরূপ লোকের সংখ্যা আশির চেয়ে কিছু বেশি ছিলো। হযরত (স) তাদের সমস্ত মনগড়া কথা শুনলেন এবং তাদের প্রকাশ্য ওজর কবুল করে তার গোপন রহস্য খোদার ওপর ছেড়ে দিলেন। এভাবে তাদেরকে মাফ করে দেয়া হলো।

এরপর এলো আমার পালা। আমি সামনে গিয়ে সালাম নিবেদন করলাম। হযরত (স) আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'বলো কি জিনিস তোমায় বিরত রেখেছিলো?' আমি বললাম : 'খোদার কসম, আমি যদি কোনো দুনিয়াদারের সামনে হাযির হতাম তো অবশ্যই কোনো-না-কোন মনগড়া কথা বলে তাকে রাযী করিয়ে নিতাম। কিন্তু আপনার সম্পর্কে তো এই ঈমানই পোষণ করি যে, এখন যদি কোনো বানোয়াট কথা বলে আপনাকে রাযী করিয়ে নিই, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই আমার প্রতি আপনাকে নারাজ করে দেবেন। কাজেই সত্য কথা বললে আপনি যদি অসন্তুষ্টও হন, তবুও আশা করবো, আল্লাহ আমার ক্ষামা জন্যে কোনো-না-কোন উপায় বের করে দেবেনই। সত্য কথা এই যে, আপনার কাছে উত্থাপন করার মতো কোনো ওজরই আমার নেই। আমি অভিযানে যেতে পুরোপুরি সমর্থ ছিলাম।'

এরপর হযরত (স) বললেন : 'এ লোকটি নিশ্চয়ই সত্য কথা বলেছে। আচ্ছা উঠে যাও এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।' আমি উঠে গিয়ে আপন গোত্রের লোকদের সঙ্গে বসলাম। অতঃপর আমার ন্যায় আরো দুই ব্যক্তি -মুরারা বিন রাবী এবং হিলাল বিন্ উমাইয়াও একইরূপে সত্য কথা বললো।

এরপর আমাদের সঙ্গে কারো কথাবার্তা না বলার জন্যে নবী করীম (স) নির্দেশ দিলেন। এর ফলে অপর দুই ব্যক্তি ঘরেই বসে রইলো। কিন্তু আমি বাইরে বের হতাম, জামা'আতের সঙ্গে নামায পড়তাম, বাজারে চলাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতো না। আমার মনে হতো, দুনিয়াটা যেন একেবারে বদলে গেছে, আমি একজন নবাগত, এখানে আমার কেউ পরিচিত নয়। মসজিদে নামায পড়তে গেলে নবী করীম (স)-কে সালাম করতাম এবং জবাবের জন্যে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ে কি-না, তা দেখবার জন্যে শুধু ইন্তেজার করতাম। হযরত (স) আমার প্রতি কিরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, নামাযের মধ্যে তা আড়চোখে দেখতাম। আম যতক্ষণ নামায পড়তাম, হযরত (স) আমার দিকে চেয়ে থাকতেন; যখনই সালাম ফিরাতাম, তখন আমার দিক থেকে তিনি দৃষ্টি সরিয়ে নিতেন।

একদিন আমি ভয়ে ভয়ে আমার চাচাত ভাই এবং বাল্যবন্ধু আবু কাতাদার কাছে গেলাম। তার বাগানের প্রাচীরের ওপর উঠে তাকে সালাম করলাম; কিন্তু আল্লাহর এই বান্দাহ সালামের জবাবটি পর্যন্ত দিলো না। আমি বললাম : আবু কাতদাহ' আমি তোমায় খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি খোদ এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসি না'? সে নিরুত্তর রইলো। আবার জিজ্ঞেস করলাম। এবারও সে নিরুত্তর রইলো। তৃতীয় বারে শুধু এটুকু বললো, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' এতে আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে এলো। আমি প্রাচীর থেকে নেমে এলাম।

এ সময় একদিন আমি বাজারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমনি সময় সিরিয়ার একটি লোক আমায় শাহ গাসবানের একটি খামে-পোরা চিঠি দিলো। আমি খুলে পড়লাম। তাতে লেখা ছিলো : আমরা শুনেছি, তোমাদের সাহেব তোমার ওপর ভীষণ উৎপীড়ন চালাচ্ছে। তুমি আমাদের কাছে এসো, আমরা তোমায় কদর করবো।' আমি বললাম, এ আর এক বিপদ দেখছিকক! তক্ষুণি চিঠিখানি চুলায় নিক্ষেপ করলাম।

চল্লিশ দিন এমনিভাবে অতিক্রম করার পর নবী করীম (স)-এর আদেশ এলো, 'আপন স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যাও।' আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে কি তালাক দিয়ে দেবো? জবাব পেলাম, 'না শুধু আলাদা থাকো।' আমি আমার স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ইন্তেজার করো।

amarboi.org

amarboi.org

পঞ্চাশতম দিন সকালে নামাযের পর আমি আপন গৃহের ছাদের ওপর বসেছিলাম এবং নিজের জীবনকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আমায় উপর্যুপরি ডেকে ডেকে বললো : 'মুবারক হোক কা'ব বিন মালিক।' আমি এ কথা শুনেই সিজদায় গেলাম। তারপর জানতে পারলাম, আমার জন্যে ক্ষমার হুকুম এসেছে। এরপর দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগলো এবং একজন অন্যজনের আগে এসে আমায় এই বলে মুবারকবাদ দিতে লাগলো যে, তোমার তওবা কবুল হয়েছে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখলাম, নবী করীম (স)-এর মুখমন্ডল খুশীতে ঝলমল করছে। আমি সালাম করতেই তিনি বললেন, 'তোমার মুবারক হোক, এই দিনটি তোমার জীবনের সবচেয়ে উত্তম দিন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ক্ষমা কি হযরত (স)-এর তরফ থেকে, না খোদার তরফ থেকে? তিনি বললেন, 'খোদার তরফ থেকে।' সেই সঙ্গে কুরআনের এই তওবা সংক্রান্ত আয়াতটি তিনি পড়ে শুনালেন।

আমি বললাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবার মধ্যে আমার সমস্ত ধন-সম্পদ খোদার পথে সদকা করে দেয়ার কথাও শামিল রয়েছে।' তিনি বললেন, 'কিছু রেখে দাও, এটা তোমার জন্যে উত্তম হবে।' আমি তাঁর নির্দেশ মতো খায়বরের অংশটি রেখে বাকী সব সদকা করে দিলাম। অতঃপর আমি আল্লাহর কাছে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করলাম : যে সত্যের বদলে আল্লাহ আময় ক্ষমা করে দিলেন, তার ওপর সরার জীবন আমি অবিচল থাকবো। তাই আজ পর্যন্ত আমি জেনে-শুনে কোনো অসত্য কথা বলিনি। আর আশা করি, ভবিষ্যতেও আল্লাহ এর থেকে আমায় রক্ষা করবেন।

ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য

এই কাহিনী থেকে সাহাবায়ে কিরামের সমাজ-জীবনের যে চিত্র ফুটে ওঠে, তার কতিপয় উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক মুমিনেরই সামনে রাখা উচিত। এ থেকে ইসলামী আন্দোলন স্বীয় অনুবর্তীদের ভেতর কিরূপ মেজাজ গড়ে তোলে, তা সহজে আন্দাজ করা যাবে।

প্রথম কথা এই যে, ইসলাম ও কুফরের মধ্যে যখন সংঘর্ষের প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন মুমিনদের জন্যে অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষার সময় এসে উপস্থিত হয়। এ সময় সামান্য মাত্র গাফলতির কারণেও সারা জীবনের পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যেতে পারে। কারণ এমনি সময়ে কোনো মুমিন যদি ইসলামের সহায়তা না করে, তাহলে তার এই ত্রুটির পেছনে কোনো বদ্-নিয়্যাত না থাকলেও এবং এ রকম ত্রুটি সারা জীবনে একবার মাত্র সংঘটিত হলেও এরূপ ত্রুটির কারণে তার সারা জীবনের পুণ্য ও ইবাদত বরবাদ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিতে পারে। বস্তুত মুমিনদের জন্যে কখনো ইসলামের বদলে কুফরের সহায়তা করা অথবা কোনো অন ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক কর্মনীতি গ্রহণ করার আদৌ অবকাশ নেই। বিশেষত যখন অন-ইসলামী আন্দোলনের মুকাবিলায় কোনো ইসলামী আন্দোলন উপস্থিত থাকে, তখন মুমিনদের যোগ্য-প্রতিভা আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার পরিবর্তে অন্য কাজে নিয়োজিত হলে অবস্থাটা আরা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ইসলামী আদর্শের পথে যখন কোনো কর্তব্য পালনের ডাক আসে, তখন মুমিনদের পক্ষে শৈথিল্য দেখানো মোটেই উচিত নয়। কারণ শৈথিল্য দেখাতে দেখাতেই কাজের সময় চলে যায়; অতঃপর এই ত্রুটির পেছনেকোনো বদ নিয়্যাত ছিলো না, এ ওজরেও কোনো ফলোদয় হয় না।

সাহাবায়ে কিরামের সমাজ-কাঠামোর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, মুনাফিকরা মনগড়া ওজর পেশ করছে এবং তারা মিথ্যা কথা বলছে, এটা সবারই জানা;তবু নবী করীম (স) শুধু তাদের মুখের কথা শুনেই তাদের সমস্ত অন্যায় মাফ করে দিলেন। কারণ, তারা কোনো পরীক্ষার সময় ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করবে, এ আশা কখনো ছিলো না। পক্ষান্তরে এদের মুকাবিলায় ঈমান ও ইখলাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কতিপয় সাচ্চা মুমিনের চরিত্র লক্ষ্যণীয়। মনগড়া ওজর তুলে পালানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এরা কেউ মিথ্যা কথা বলা পছন্দ করলেন না; বরং সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির কারণেই তাঁদরেকে রেহাই দেয়া হলো না, বরং তাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করা হলো। এটা তাঁদের ঈমান ও ইখলাস সম্পর্কে কোনো সন্দেহ সৃষ্টির কারণে নয়; বরং এজন্যে যে, মুনাফিকদের উপযোগী কাজ তারা কেন করতে গেলেন?

পরন্ত এই অপরাধের জন্যে নেতা যে শাস্তি দিলেন এবং অনুবর্তী তা যেভাবে ভোগ করলেন, সর্বোপরি গোটা সমাজ যেভাবে নেতার অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করলো, তার প্রতিটি দিকই অনুপম ও অতুলনীয়। নেতা খুব কঠোর শাস্তি দিলেন; কিন্তু ঘৃণা বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নয়, প্রগাঢ় ভালোবাসা নিয়ে। কোনো স্নেহশীল পিতা যেমন অপরাধী পুত্রকে সাজা দেন

amarboi.org

amarboi.org

এবং পুত্র সংশোধিত হলে আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরাও প্রত্যাশা করেন, এ শাস্তি ঠিক তেমনি। শাস্তির কঠোরতায় অনুবর্তী অত্যন্ত অস্থির। কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রিয় নেতার আনুগত্যের বদলে তাঁর অন্তরে না কোনো বিদ্রোহের ভাব জাগলো, না তিনি কোনো অভিযোগ করলেন আর না তাঁর কৃতিত্বের কোনো প্রতিদান চাইলেন। তারপর গোটা সমাজের মধ্যে নেতার হুকুম পালন করার ভাবধারা কতো তীব্র, তাও লক্ষ্যণীয়। যখনই আদেশ হলো যে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, তখন মনে হলো যেনো গোটা সমাজে তাঁর কোনো পরিচিত লোকেরই অস্তিত্ব নেই। আবার যখন তাঁর ক্ষমার কথা ঘোষিত হলো, তখন সবার আগে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে সমাজের প্রতিটি লোকই অস্থির হয়ে উঠলো।

বস্তুত নবীর আনুগত্যের এই নমুনাই কুরআন তার অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায়। আর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী-কর্মাধ্যক্ষ্য ও নেতার মধ্যে এমনি ভাবধারা থাকাই বাঞ্ছনীয়। সাহাবীদের মধ্যে এমনি ভাবধারা থাকার কারণেই যখন অপরাধী দেখলেন, তাঁর চেয়ে বড়ো বড়ো অপরাধীও নিছক মিথ্যা বলে বেঁচে যাচ্ছে এবং সত্য কথা বলার জন্যেই তাঁকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হচ্ছে, তখন তাঁর ভেতর এতোটুকু ক্ষোভ পর্যন্ত জাগলো না, কোনোরূপ অসন্তোষও প্রকাশ পেলো না; বরং শাস্তি পাবার পর দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তিনি তা কঠোরভাবে ভোগ করলেন না; বরং শাস্তি পাবার পর দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তিনি তা কঠোরভাবে ভোগ করলেন। তাঁর সঙ্গে যে নির্মমতা করা হয়েছে, এরূপ ধারণাও তাঁর মনে এক মুহূর্তের তরেও ঠাঁই পেলো না। তাঁর অতীতের সমস্ত কৃতিত্ব ম্লান হয়ে গেলো; তাঁর ঈমান ও ইখলাস সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। অথচ তাঁর বদ-নিয়্যাত ছিলো না, তাঁর হৃদয়ও আল্লাহ এবং রাসূলের ভালবাসা থেকে শূন্য ছিলো না। পরন্ত তিনি ইসলামী সমাজ-সংগঠনের মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র পাকালেন না, লোকদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে তুললেন না, অন্যান্য লোকদেররেকও নিজের সমর্থ বানিয়ে সমাজ-সংগঠনের মধ্যে উপদল সৃষ্টির চেষ্টা করলেন না; বরং নিতান্ত ধৈর্য ও প্রশান্তির সঙ্গে তিনি শাস্তি ভোগ করলেন এবং কবে তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে, প্রতিটি মুহূর্তে সেই আশায় অতিবাহিত করলেন। এহেন আদর্শ কর্মনীতির ফলেই আল্লাহ তাআলা নিতান্ত দরদ পূর্ণ ভাষায় শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করলেন। বস্তুত মুসলিম হিসেবে এই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। আর আল্লাহ যাকে দান করেন, কেবল সে-ই এতোবড়ো অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।

একজন লোকের ওপর ঈমান ও ইসলামের দাবি কতো খানি দায়িত্ব অর্পণ করে, এ সময় তাও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হলো। বলা হলো : প্রকৃত পক্ষে এ দাবির পর মুমিনদের নিজস্ব বলতে আর কিছুই থাকে না; কারণ পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল খারদ করে নিয়েছেন।' (সূরা তাওবা : ১১)।

বস্তুত ঈমানের এই ব্যাখ্যা যতক্ষণ লোকের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল না হবে এবং প্রতি মুহূর্ত তা সামনে না থাকবে, ততক্ষণ দ্বীনের দাবি পূরণে সে অবশ্যই শৈথিল্য দেখাবে। আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে মুমিন ও আল্লাহর মধ্যকার একটা চুক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। এ চুক্তি হচ্ছে এই যে, বান্দাহ তার আপন সত্তা ও ধন-মালকে যেনো আল্লাহর কাছে বেচে দিলো এবং তার বিনিময়ে আল্লাহ মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনে তাকে জান্নাত দান করবেন-এই প্রতিশ্রুতিকে গ্রহণ করলো।

সত্য কথা বলতে গেলে মানুষের জান, মাল সব কিছু আল্লাহরই সম্পদ। তিনিই এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই এর প্রকৃত মালিক। এমতাবস্থায় বান্দাহ আল্লাহর কাছে বেঁচতে পারে তার এমন নিজস্ব কোন জিনিসটি রয়েছে? এভাবে বেচা-কেনার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ মানুষকে একটা স্বাধীন কর্মক্ষমতা দান করেছেন এবং তাকে আপন ইচ্ছানুযায়ী কাজে লাগাবার ইখতিয়ারও দিয়েছেন। ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার এই স্বাধীনতাবলে মানুষ আল্লাহর দেয়া জান ও মালকে ইচ্ছা করলে আল্লাহরই সম্পত্তি বলে মানতে পারে- প্রকৃতপক্ষে যেরূপ হওয়া উচিত- আবার ইচ্ছা করলে সে নিজেকেই ঐ জিনিসগুলোর মালিক বলে দাবি করতে পারে- যদিও সে ঐগুলোর মালিক নয়। এই উভয় প্রকার স্বাধীনতাই তাকে দান করা হয়েছে। মানুষ ইচ্ছা করলে খোদার প্রতি বিমুখ হয়ে তার জান ও মালকে নিজের ইচ্ছা-প্রবৃত্তি কিংবা তারই মতো অন্য মানুষের ইচ্ছা-প্রবৃত্তি অনুযায়ী যদৃচ্ছ ব্যবহার করতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে প্রকৃত মালিককে মেনে নিয়ে তাঁর দেয়া জান-মালকে তাঁরই মর্জী মাফিক কাজে লাগাতে পারে এবং এভাবে তার কাছে গচ্ছিত জিনিসগুলো যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আমানত এবং এগুলোর ব্যবহারে সে স্বাধীন কিংবা অবাধ ক্ষামতার অধিকারী নয়ত এ সত্যকে সে স্বীকৃতি দিতে পারে। এই উভয়বিধ ক্ষমতাই তাকে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়টিকে অনুগ্রহবশত বেচা-কেনা বলে আখ্যা দিয়েছেন, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার এই সামান্য স্বাধীনতাই হচ্ছে তার মূল ভিত্তি। আল্লাহ তা'আলা বান্দাহকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের অধিকারী হওয়া

amarboi.org

amarboi.org

সত্ত্বেও তুমি আমার গচ্ছিত আমানতকে যদি খেয়ানতের কাজে না লাগাও বরং আমারই মর্জি মাফিক তা কাজে ব্যববহার করো, তাহলে এই স্বল্পায়ু জীবনের পরবর্তী অনন্ত জীবনে আমি তোমায় বেহেশতের সুখ-সম্পদে সম্মানিত করবো। সুতরাং যে ব্যক্তি এক্ষণে আল্লাহ তা'আলার এই দাবি ও প্রতিশ্রুতিকে মেনে নিয়ে নিজের জান ও মালকে তারই পছন্দনীয় কাজে ব্যবহার করার স্বীকৃতি দেয়, সে-ই হচ্ছে ঈমানদার এবং তার এ স্বীকৃতিকেই আল্লাহ তা'আলা বেচা-কেনা বলে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ দাবি ও প্রতিশ্রুতিকে অগ্রাহ্য করে নিজের জান- আল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সঙ্গে এই বেচা-কেনার কারবার করতেই অস্বীকৃতি জানায়। তাই আল্লাহর দৃষ্টিতে সে হচ্ছে কাফির এবং তার এই অস্বীকৃতিই হচ্ছে কুফর।

তাবুক যুদ্ধের সময় নবী করীম (স) যে সব লোককে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা সবাই ছিলো ঈমামানের দাবিদার। এরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে উপরোল্লিখিত বেচা-কেনার চুক্তি করেছিলো। কিন্তু যখন তাদের দাবি প্রমাণে সময় এলো তখন তাদের কিছু লোক পরীক্ষায় সমম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারলো না। তারা আপন জান ও মালকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করা থেকে বিরত রইলো। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলো মুনাফিক। তাদের ঈমানেনর দাবি ছিলো মিথ্যা। তারা শুধু অক্ষমতা বা চাপের ফলেই ইসলামী সংগঠনে অনুপ্রবেশ করেছিলো। কিন্তু তাদের সঙ্গে কতিপয় দুর্বর্লচেতা লোকও ছিলেন, যাঁরা শুধু গাফলতি ও শৈথিল্যর দরুণ ও এ ভুলটা করেছেন। তাই এ সময় তাঁদের খোলাখুলি সমালোচান করার পর এ কথাও সুস্পষ্টভাপবে জানিয়ে দেয়া হলো যেন কেবল খোদার অস্তিত্ব মেনে নেয়াকেই ঈমান বলা যায় না; বরং খোদাকেই আমাদের জান-মালের একমাত্র মালিক বলে স্বীকৃতি দেয়াই হচেছ প্রকৃত ঈমান। এভাবে আল্লাহ তা'আলাকে চূড়ান্ত মালিক মেনে নেবার পর কেউ যদি স্বীয় জন ও মালকে আল্লাহর পথে নিয়োজিত করতে কুণ্ঠিত হয় এবং তাকে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করে, তাহলে কার্যত তার স্বীকৃতিটা মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হবে। তাই ঈমানের প্রত্যেক দাবিদারেরই তার দাবির এই তাৎপর্য হামেশা স্মরণ করা উচিত এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার কোনো সুযোগ গ্রহণেই তার কুণ্ঠিত হওয়া অনুচিত।

জনসাধারণের দ্বীনী প্রশিক্ষণ

ইসলামের সূচনাকালে যে সব লোকের হৃদয়ে ইসলামের সত্যতা আসন পেতে নিতো এবং যারা পুরোপুরি বুঝে-শুনে ইসলাম গ্রহণ করতো, কেবল তারাই এ আন্দোলনের সহায়তা করতে এগিয়ে আসতো। কিন্তু এ পর্যায়ে ইসলামের প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দলে দলে লোকেরা ইসলামের মধ্যে দাখিল হতে লাগলো। দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে নিলো। এর ফলে খুব কম লোকই পুরোপরি বুঝে-শুনে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেলো; বরং বেশির ভাগ লোকই অল্প কিছু জেনে-শুনে ইসলামের সহায়তা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। এভাবে হাজার হাজার লোক ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে লাগলো। দৃশ্যত এই পরিস্থিতিটা ছিলো ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো জনসমষ্টি ইসলামের দাবিগুলো কে উত্তমরূপে বুঝতে না পারবে এবং এবং ইসলাম কর্তৃক অর্পিত নৈতিক দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত না হবে, ততোক্ষণ সে ইসলামী সমাজের পক্ষে দুর্বলতারই কারণ হয়ে থাকবে। তাবুক অভিযানকালে এমনি পরিস্থিতিরই কিছুটা আভাস পাওয়া গিয়েছিলো। তাই এই সুযোগে ইসলামী আন্দোলকে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা হলো। তাহলো এই যে, জনসাধারণের মধ্য থেকে কিছু লোককে ইসলামের কেন্দ্রসমূহ (যেমন মক্কা, মদীনা ইত্যাদি) আসতে হবে এবং এসব কেন্দ্র থেকে ইসলামের শিক্ষা -দীক্ষা ও তার বিস্তারিত নিয়ম-কানুন শিখে তাদেরকে সত্যিকার ইসলামী ভাবধারা আত্নস্ত করতে হবে। অতঃপর মুসলিম জন-মানসে সঠিক ইসলামী চেতনা জাগ্রত করার ও তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশাবলী সম্পর্কে অবহিত করানোর উদ্দেশ্যে এই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদেরকে আপন আপন জনপদে ফিরে গিয়ে জনগণের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সাধারণ ইসলামী শিক্ষার অর্থ কেবল লোকদেরকে কিছু লেখা-পড়া শেখানোই ছিলো না; বরং লোকদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা সৃষ্টি এবং ইসলামী ও অন ইলামী জীবন পদ্ধতির পার্থক্যবোধ জাগিয়ে তোলাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কোনো গৎবাঁধা প্রক্রিয়া ছিলো না। এটা লেখাপড়া শিখিয়েই হোক আর না শিখিয়েই হোক, কোনো প্রকারে হাসিল করতে পারলেই হলো। কেননা, মুখ্য উদ্দেশ্য হলো দ্বীন সম্পর্কে সঠিক চেতনা সৃষ্টি করা। এজন্যে লেখাপড়া একটা মাধ্যম হতে পারে, উদ্দেশ্য নয়।

amarboi.org

amarboi.org

দারুল ইসলামের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা

ইসলামী আন্দোলন একদিন না একদিন প্রচণ্ড রকমের একটা আঘাত খেয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মুনাফিকরা এদ্দিন মনে মনে আশা পোষণ করে আসছিলো। কিন্তু তাবুক অভিযানের পর তাদের সব আশা-ভরসাই ধুলিসাৎ হয়ে গেলো। এক্ষণে এই শ্রেণীর লোকদের সামনে ইসলামের চৌহদ্দীতে আশ্রয় গ্রহণ করা কিংবা তারা নিজেরা ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর রইলো না।

এ সময় সমগ্র আরব ভুমির শাসন ক্ষমতা মুসলিমদের হাতে নিবদ্ধ ছিলো। তাদের মুকাবিলা করার মতো উল্লেখযোগ্য কোনো শক্তি বর্তমান ছিলো না। তাই এবার ইসলামী হুকুমতের অভ্যন্তরীণ নীতি ঘোষণার সময় এলো। নিম্নোক্ত পন্থায় সেই নীতি ঘোষণা করা হলো :

ক. আরব উপদ্বীপ থেকে শিরককে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। পুরানো মুশরিকানা ব্যবস্থাকে খতম করে আরব ভূমিকে চিরকালের জন্যে ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে মুশরিকদের স সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে যতো চুক্তি রয়েছে, তা সব বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

এই নীতি অনুসারে নবম হিজরীর হজ্জ উপলক্ষে নবী করীম (স) হযরত আলী (সা)-এর মারফত হাজীদের সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা করেন :

১. যে ব্যক্তি দ্বীন-ইসলম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
২. এ বছরের পর কোনো মুশরিক কা'বা গৃহে হজ্জ করতে আসতে পারবে না।
৩. কাউকে নগ্ন হয়ে বায়তুল্লাহর চারদিকে তওয়াফ করার অনুমতি দেয়া হবে না।

৪. যাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুক্তি রয়েছে এবং যারা চুক্তির পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি, তাদের সঙ্গে চুক্তির শর্তানুযায়ীই ব্যবহার করা হবে এবং তার মেয়াদ পূর্ণ করা হবে। কিন্তু যারা চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বেছে, তাদের জন্যে আর মাত্র চার মাসের অবকাশ রয়েছে। এই অবকাশের ভেতর হয় মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে হবে, নচেত দেশ ছেড়ে তাদেরকে চলে যেতে হবে অথবা বুঝে-শুনে আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করে ইসলামী ব্যবস্থাপনায় শামিল হতে হবে।

খ. কা'বার তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা সম্পূর্ণত তওহীদ বাদীদের হাতে থাকবে। এতে মুশরিকদের কোনো অধিকার থাকবে না। এবার থেকে কা'বার ভেতর কোনো মুশরিকানা প্রথা পালন করা যাবে না; এমন কি কোনো মুকশরিক এই পবিত্র ঘরের নিকটে পর্যন্ত আসতে পারবে না।৫৫

amarboi.org

amarboi.org

বিদায় হজ্জ এবং ওফাত

হজ্জের জন্য রওয়ানা

দশম হিজরীতে হযরত (স) আবার হজ্জের ইরাদা করলেন। ঐ বছর জিলকদ মাসে তাঁর হজ্জে গমনের কথা ঘোষণা করে দেয়া হলো। এ সংবাদ তামাম আরব ভূমিতে ছড়িয়ে পড়লো। হযরত (স)-এর সঙ্গে হজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জনের নিমিত্ত সমগ্র আরববাসীর মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগলো। জিলকদের শেষ দিকে হযরত (স) মদীন থেকে যাত্রা করলেন এবং জিলহজ্জের চার তারিখে তিনি মক্কায় উপনীত হলেন। মক্কায় পদার্পণের পর প্রথমেই তিনি কা'বা শরীফ তওয়াফ করলেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তারপর পর্যায়ক্রমে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং সেখান থেকে কাজ সেরে আট তারিখ বৃহস্পতিবার সমস্ত সহযাত্রীকে নিয়ে মিনায় অবস্থান করলেন। পরদিন নয় জিলহজ্জ সকালে ফজরের পর তিনি মিনা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। এখানে হযরত (স) তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যাতে ইসলামে পূর্ণ দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্যের প্রকাশ ঘটেছে। এই ভাষণে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন। নিম্নে এর কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

হজ্জের ভাষণ

'জনমণ্ডলী! শুনে রাখো, জাহিলী যুগের সমস্ত প্রথা ও বিধান আমার দু পায়ের নীচে ।'
'অনারবদের ওপর আরবদের এবং আরবদের ওপর অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার ওপর কালোর কিংবা কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মৃত্তিকা থেকে। মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে শুধু তাকওয়া।'
'মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। সাবধান! আমার পরে তোমরা একজন আরেক জনকে হত্যা করার মতো কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ো না।'
'তোমাদের গোলাম! তোমাদের ভৃত্য! তোমরা নিজেরা যা খাবে, তা-ই তাদের খাওয়াবে; নিজেরা যা পরবে, তা-ই তাদের পরতে দিবে।'
'জাহিলী যুগের সমস্ত রক্তের বদলা বাতিল করে দেয়া হলো। (এখন আর কেউ কারো কাছ থেকে পুরানো রক্তের বদলা নিতে পারবে না। সর্বপ্রথম আমি নিজ খান্দানের রক্ত -রাবি'আ বিন্ হারিসের পুত্রের রক্ত বাতিল করে দিলাম।'
'জাহিলী যুগের সমস্ত সূদও বাতিল করে দেয়া হলো। (এখন আর কেউ কারো কাছে সূদ দাবি করতে পারবে না) সর্বপ্রথম আমি নিজ খান্দানের সূদ-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সূদ - বাতিল করে দিলাম।৫৬

'মেয়েদের ব্যাপারে খোদাকে ভয় করো। জেনে রাখ, তাদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে তোমাদের ওপর তাদের অধিকার । তাদের কল্যাণের বিষয়ে আমার নসিহত গ্রহণ করো।'

'আজকের এই দিন, এই মাস এই এই শহরটি যেমন সম্মানার্হ, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের ধন-দৌলত পরস্পরের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানার্হ।

'আমি তোমাদের মধ্যে একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।'

এরপর তিনি শরীয়তের অনেক মৌলিক বিধান বিবৃত করেন। অতঃপর জনতার কাছে জিজ্ঞেস করেন :

'খোদার দরবারে আমার সম্পর্কে তোমাদের কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তোমরা কি বলবেঃ'

সাহাবীগণল বলেন, 'আমরা বলবো, আপনি আমাদের কাছে পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং আপন কর্তব্য পালন করেছেন।' তিনি আসমানের দিকে শাহাদাত অঙ্গুলি তুলে তিনবার বললেন : 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।'

amarboi.org

amarboi.org

এ সময় কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলোঃ

‘আজকে আমি দ্বীন (ইসলাম)-কে তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম আর দ্বীন (জীবন পদ্ধতি) হিসবে ইসলামকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করলাম।

এই হজ্জ উপলক্ষে হযরত (স) হজ্জ সংক্রান্ত তাবত নিয়ম-নীতি নিজে পালন করে দেখান। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন : ‘আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। হয়তো বা এরপর আমার দ্বিতীয় বার হজ্জ করার সুযোগ হবে না।’

এরপর তিনি সমস্ত মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলেন : ‘উপস্থিত ব্যক্তিগণ (এসব কথা)) অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দিও।’

অসুস্থতা

এগার হিজরীর সফর মাসের ১৮ কি ১৯ তারিখে হযরত (স)-এর শরীরে অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেডলো। সে দিন ছিলো বুধবার। পরবর্তী সোমবার দিন অসুস্থতা অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠলো। যতোক্ষণ শক্তি ছিলে, ততোক্ষণ তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ালেন। তিনি সর্বশেষ যে নামায পড়ান, তা ছিলো মাগরিবের নামায। মাথায় তাঁর বেদনা ছিলো। তিনি রুমাল বেঁধে মসজিদে এলেন এবং নামাযে সূরা মুরসালাত পাঠ করলেন। এশার সময় তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাই মসজিদে আসতে না পেরে আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে নামায পড়াতে বললেন। এপর কয়েকদিন যাবত আবু বকর সিদ্দীক (রা) নামায পড়ালেন।

শেষ ভাষণ এবং নির্দেশাবলী

মাঝখানে একদিন তিনি একটু ভালো বোধ করেন। তিনি গোসল করে মসজিদে এলেন এবং ভাষণ প্রদান করলেন। এটি ছিলো তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। তিনি বললেন :

‘খোদা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার নিয়ামত কবুল করার কিংবা খোদার কাছে (আখিরাতের) যা কিছু আচে, তা গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। কিন্তু বান্দাহ আল্লাহ নিকটের জিনিসই কবুল করে নিয়েছে।’

একথা শুনে হযরত আবু বকর (সা) এর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কেঁদে উঠলেন। হযরত (স) এরা বললেনঃ

‘আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ আবু বকরের দৌলত ও তাঁর বন্ধুত্বের কাছে । যদি দুনিয়ায় আমার উম্মতের ভেতর থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারতাম তো আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু বন্ধুত্বের জন্যে ইসলামের বন্ধনই যথেষ্ট।’

‘আরো শোন, তোমাদের আগেকার জাতিসমূহ তাদের পয়গাম্বর ও সম্মানিত লোকদের কবরকেই ইবাদতগাহ বানিয়ে নিয়েছে। দেখো, তোমরা এরূপ করে না। আমি তোমাদের নিষেধ করে যাচ্ছি।’

পুনরায় বললেন : ‘হালাল ও হারামকে আমার প্রতি আরোপ করা যাবে না; কারণ খোদা যা হালাল করেছেন, তা-ই আমি হালাল করেছি আর তিনি যা হারাম করেছেন, তা-ই আমি হারাম করেছি।

এই অসুস্থ অবস্থায় একদিন তিনি আপন খান্দানের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ ‘হে পয়গাম্বরের কন্যা ফাতিমা এবং হে পয়গাম্বরের ফুফু সাফিয়া! খোদার দরবারে কাজে লাগবে, এমন কিছু করে নাও। আমি তোমাদেরকে খোদার হাত থেকে বাঁচাতে পারি না।’

একদিন রোগ-যন্ত্রণা খুব বেড়ে গেলো। তিনি কখনো মুখের ওপর চাদর টেনে দিচ্ছিলেন আবার কখনো তা সরিয়ে ফেলছিলেন। এমনি অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা) তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেলেন : ‘ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি খোদার লা’নত! তারা আপন পয়গাম্বরদের কবরকে ইবাদতগাহ বানিয়ে নিয়েছে।’

amarboi.org

amarboi.org

একবার তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে কিছু আশরাফী জমা রেখেছিলেন। এই অস্থিরতার ভিতরেই তিনি বললেন : 'আয়েশা! সেই আশরাফীগুলো কোথায়! মুহাম্মদ কি খোদার সঙ্গে খারাপ ধারণা নিয়ে মিলিত হবে! যাও, ঐগুলোকে খোদার পথে দান করে দাও।'

রোগ-যন্ত্রণা কখনো বাড়ছিলো, কখনো হ্রাস পাচ্ছিলো। ওফাতের দিন সোমবার দৃশ্যত তাঁর শরীর অনেকটা সুস্থ ছিলো। কিন্তু দিন যতো গড়াতে লাগলো, ততোই তিনি ঘন ঘন বেঁহুশ হতে লাগলেন। এই অবস্থায় প্রায়শ তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো (আল্লাহ যাদের অনুগৃহীত করেছেন, তাদের সঙ্গে) কখনো বলতেন 'হে খোদা! তুমি মহান বন্ধু'।

এই সব বলতে বলতে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগলো। এক সময় তাঁর রূহে পাক আলমে কুদসে গিয়ে পৌঁছলো।

মৃত্যুর সাল এগারো হিজরী। মাসটি ছিলো রবিউল আউয়াল এবং দিনটি সোমবার। সাধারণভাবে প্রচলিত যে, তারিখটি ছিলো ১২ রবিউল আউয়াল। কিন্তু এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। 'সীরাতুন্নবী' প্রণেতা মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর মতে তারিখটি ছিলো ১ রবিউল আউয়াল।

পরদিন জানাযা ইত্যাদি সমাধা করা হলো এবং সন্ধা নাগাদ যে ঘরে তিনি ইন্তেকাল করেন, সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হলো।

amarboi.org

amarboi.org

পরিশিষ্ট

ইসলাম প্রচারে মহিলা সাহাবীদের ভূমিকা

দুনিয়ায় যে কোন সংস্কার আন্দোলনের ন্যায় ইসলামেরও বিকাশ-বৃদ্ধিতে অসংখ্য মহিলা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এ ব্যাপারে নববী যুগে মহিলারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

খাদীজা বিনতে খওলিদঃ

এ ব্যাপারে প্রথমেই হযরত (স)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর নাম উল্লেখ করতে হয়। এই মহিয়সী নারী নবুয়্যাতের পূর্বে নিজের বিপুল সম্পদরাজি সমাজের ইয়াতীম, মিসকীন ও বিধবাদের সাহায্যের জন্যে তাঁর সমাজসেবী স্বামীর হাতে তুলে দেন। তবে এ সম্পদ শুধু ইয়াতীম, মিসকীন ও বিধবাদের সাহায্যেই ব্যয়িত হয়নি, স্বামীর জন্যে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জনেও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ইসলাম প্রচারে এ সম্মান ও শ্রদ্ধা অনেকটাই কাজে লেগেছে।

ইসলামের ঠিক সূচনা-পর্বে স্বামীকে নানাভাবে সাহস ও উৎসাহ প্রদানের কথা ইতঃপূর্বে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে । স্বামীর প্রচারিত আদর্শের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করে এবং ঘরের বাঁদী ও দাসীদের কাছে তা যথাযথ প্রচার করে তিনি ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের দিনগুলোতে স্বামীর সাথে দীর্ঘদিন শে'বে আবী তালিবে অবরুদ্ধ থেকে এবং আপন ভাতীজা হাকীম বিন্ হাজাম এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে কুরাইশদের শত্রুতা প্রশমনে সফল ভূমিকা রেখে তিনি ইতিহাসে অনন্য স্থান করে নিয়েছেন।

গুজাইয়াঃ

ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন হাবীব আল-বাগদাদী লিখেছেনঃ এই মহিলা ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশ রমনীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু সংখ্যক কুরাইশ রমনী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে কুরাইশরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। ঘটনাক্রমে এই মহিলা ছিলেন মরুচারী বেদুঈন পরিবারের সন্তান। এ কারণে কুরাইশরা তাঁকে শহর থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নিলো। অতঃপর তাঁর হাত-পা বেঁধে আপন পরিবারের কাছে পৌঁছানোর জন্যে একটি কাফেলার হাতে তুলে দেয়া হলো। কাফেলার লোকেরা তাঁকে একটি উটের পিঠে বসিয়ে রশি দিয়ে কঠোরভাবে বেধে দিলো। এর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে মহিলা নিজেই বলেনঃ 'ওরা পথি মধ্যে আমায় কোনো খাবার বা পানি পান করতে দেয়নি; বরং কোনো মঞ্জিলে যাত্রা বিরতি করলে ওরা আমার হাত-পা বাঁধা অবস্থায়ই কড়া রোদের মধ্যে ফেলে দিতো। এভাবে তিন দিন তিন রাত অতিবাহিত হলো। আমার অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে দাঁড়ালো। কোনো বিষয়ে আমার হুঁশ-জ্ঞান পর্যন্ত থাকলো না।

এক রাতে আমি এই অবস্থায়ই পড়ে ছিলাম। হঠাৎ গায়েব থেকে একটা তরল পদার্থ এসে আমার মুখ স্পর্শ করলো। আমি কিছু পানীয় পান করতেই আমার হুঁশ ফিরে এলো। আমার দুর্বলতা কেটে গেলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকেরা আমায় পরিবর্তিত ও উন্নত রূপে দেখতে পেলো। তারা ভাবলো, রাতের বেলা আমি হয়ত কোনোক্রমে হাত-পয়ের বন্ধন খুলে কাফেলার পানি চুরি করে পান করেছি। কিন্তু আমাকে বাধা রশি যেমন খোলা ছিলোনা; তেমনি পানি-ভরা মশকগুলোর মুখও ছিলো বন্ধ। তারা যখন নিশ্চিত হলো যে, পানি কেউ চুরি করেনি, বরং খোদার অনুগ্রহ এবং গায়েবী সাহায্যেই আমার অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, তখন ওরা দারুণভাবে প্রভাবিত ও অনুতপ্ত হলো এবং সকলেই একযোগে ইসলাম গ্রহণ করলো।' উল্লেখ্য, হযরত (স)-এর প্রতি মহিলার এত প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিলো যে, তাঁর সম্পর্কে কুরআনের একটি আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়।

amarboi.org

amarboi.org

উম্মে শরীক দওসিয়াঃ

দারুল মুসান্নিফীন প্রকাশিত সিয়ারুস সাহাবিয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, এই মহিলা কুরাইশ রমনীদের মধ্যে খুব গোপনে ইসলাম প্রচার করতেন। তাঁর প্রচেষ্টায়ই কুরাইশ রমনীদের মধ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। অবশ্য তাঁর জীবন কাহিনী সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

ফাতিমা বিনতে খাত্তাবঃ

এ মহিলা ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর বোন। ইনি যেভাবে হযরত উমর (রা)-কে প্রভাবিত করেন, যার পরিণতিতে তিনি ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন, সে ঘটনা সর্বজনবিদিত। জাহিল যুগে যে স্বল্প সংখ্যক কুরাইশ মহিলা লেখাপড়া জানতেন, ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

সা' দা বিনতে কুরাইজঃ

ইবনে হাজারের উদ্ধৃতি দিয়ে সিয়ারুস সাহাবিয়ায় বলা হয়েছে, সা'দা বিনতে কুরাইজের উপদেশেই হযরত উসমান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইনি সম্ভবত হযরত উসমান (রা)-এর খালা ছিলেন। এঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আর কিছু জানা যায়নি।

এছাড়া হিজরতের প্রাক্কালে সংঘটিত আকাবার তৃতীয় শপথে দুজন মহিলা অংশ গ্রহণ করেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তাদের নাম-পরিচিতি পাওয়া যায়নি।

হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হলো। মক্কার কঠোর পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা রেখে এঁরা শুধু সৎ সাহসেরই পরিচয় দেননি, অনেক দুঃখ-কষ্টেরও ঝুঁকি গ্রহণ করেন।

হিজরতের পর মদীনায়ও ইসলাম গ্রহণ ও তার প্রচারে মহিলারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মক্কার চেয়ে মদীনার মহিলারা বেশি স্বাধীনচেতা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। সে কারণে তাঁরাও অধিকতর উৎসাহের সাথে ইসলাম প্রচারে অংশ গ্রহণ করেন।

উম্মে সুলীম বিনতে মালহান : এই মহিলা খুবই দুঃসাহসী ছিলেন। ইনি এবং এঁর বোনের ইসলামের পক্ষে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা সর্বজনবিদিত। উম্মে সুলীম সম্পর্কে ইতিহাসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর মক্কী সৈন্যেরা পলায়ন করলে যুদ্ধ জয়ের পর তিনি সমস্ত পলাতক মক্কী সৈন্যের শিরচ্ছেদ করার জন্যে হযরত (স)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন। (সহীহ মুসলিম থেকে সিয়ারুস সাহাবিয়ায় উদ্ধৃত)

তাঁর স্বামী আবু তালহা মূর্তি-পূজারী ছিলেন। তিনি একটি বৃক্ষের পূজা করতেন। উম্মে সুলীন মুসলমান হবার পর স্বামীকে নানাভাবে বুঝাতে থাকেন যে, মাটির বুক চিরে যে গাছের জন্ম হয়, তা কিভাবে খোদা খোদা পহতে পারে? স্ত্রীর কথায় ধীরে ধীরে স্বামীর মন প্রভাবিত হয় এবং এক পর্যায়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইবনে সা'দ থেকে সিয়ারুস সাহাবিয়ায় উদ্ধৃত)

রাসূলে করীম (স)-এর জামানায় ইসলামের জন্যে অর্থ ব্যয়েও মহিলারা কিছুমাত্র পিছনে ছিলেন না। সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত হয়েছে, একবার হযরত বিলাল (রা) রাসূলে করীম (স)-এর আহবান ক্রমে মসজিদে নববীতে সমবেত লোকদের কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করছিলেন। মসজিদের এক পার্শ্বে সমবেত মহিলার এটা টের পেয়ে নিজেদের কানের দুল, হাতের চুড়ি এবং অন্যান্য অলঙ্কারাদি খুলে খুলে রাসূলের খেদমতে জমা করতে লাগলেন।

মোটকথা, ইসলাম প্রচারে মহিলার পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রাসূলে আকরাম (স)-এর সাথে সহযোগিতা করেন। তাঁরা নিজ নিজ স্বামী, ভৃত্য, দাসী, গোলাম, আত্নীয়-স্বজন, সাক্ষাত-প্রার্থী ও বন্ধু-বান্ধবদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ দেন। ইসলামের পথে তাঁরা নানারূপ দুঃখ-কষ্টও ভোগ করেন। তাঁরা আবিসিনিয়ায় হিজরতেও অংশ নেন। তাঁদের ঈমান কিরূপ সুদৃঢ় ছিলো দু'-একটি ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান পরিবেশে গিয়ে বিবি উম্মে হাবীবার স্বামী উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ এবং বিবি সওদার স্বামী সুকরান ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। কিন্তু এই দুই মহিলা

amarboi.org

amarboi.org

ইসলামের ওপর অবিচল থাকেন। এর বিনিময়ে উভয়ে রাসূলে আকরাম (স)-এর স্ত্রী তথা উম্মুল মুমিনীন হবার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত উমর (রা)-এর দুই দাসী জুনাইরা ও লাবীবা মক্কায় অবস্থানকালে ইসলামে দীক্ষিত হন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব হযরত উমর (রা) তাদের ওপর কঠোর নির্যাতন চালাতেন। তাদেরকে প্রহার করতে করতে নিজেই পরিশ্রান্ত হয়ে বিরতি দিতেন। তিনি বলতেন : কারো প্রতি দয়াপরবশ হয়ে নয়, নিজেই পরিশ্রান্ত হয়ে বিরতি দিচ্ছি; কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর আবার প্রহার শুরু করবো। কিন্তু এই নিষ্ঠুর প্রহারও তাঁরা মেনে নেন; তবু ইসলাম ত্যাগ করতে সম্মত হননি। জানা যায়, আবু লাহাবের বৃদ্ধা দাসী সাওবিয়াও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে মুক্তিদান করা হয়েছিলো বলে সম্ভবত আবু লাহাব এই বৃদ্ধার ওপর নির্যাতন চালাতে সাহস পায়নি।

হযরত উমর (রা)-এর আত্মীয়া শাফাআ বিনতে আব্দুল্লাহ কবে ইসলাম গ্রহণ করেন জানা যায়নি। তিনি লেখাপড়া জানতেন। হযরত (স) তাঁর স্ত্রী হাফসা (রা)-কে লেখাপড়া শিখানোর জন্যে শাফাআকে নিযুক্ত করেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তিনিও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ইবনে সা'দ -এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, বাহির থেকে অমুসলিম গোত্রগুলোর দূতেরা মদীনায় এলে মদীনার এক আনসারী মহিলা তাদের খুব মেহমানদারী করতেন। এই মেহমানদারীও ইসলাম প্রচারের জন্যে অত্যন্ত ফলপ্রসু প্রমাণিত হতো।

.....সমাপ্ত.....

amarboi.org